রূপক সাহা

জীবাণু

সেই দুপুর বেলায় স্বপ্নময় ব্যাটাচ্ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছে। এখনও ওঠার নামটি নেই। সন্ধে প্রায় সাড়ে ছ'টা। আর একটু পরেই রিঙ্কির আসার কথা। ওর সঙ্গে থাকবে কঙ্কণা। আমার হেফাজতে রিঙ্কিকে দিয়েই ও চলে যাবে নিউ আলিপুরে। কোনও এক প্রফেসরের বাড়িতে যেন ওরা দু'জনে পড়তে যায়। ঠিক আছে, কঙ্কণা গিয়ে স্যারকে বলবে, রিঙ্কির শরীর ভাল নেই। সে জন্যই আজ আসতে পারেনি।

সকালে ফোনে আমার সঙ্গে এ-সব কথা প্রথমে রিঙ্কি, তার পর কঙ্কণার সঙ্গে হয়ে গেছে। ঠিক ন'টার সময়, নিউ আলিপুর থেকে ফেরার পথে কঙ্কণা ফের আমাদের বাড়িতে আসবে। রিঙ্কিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে গল্ফ গ্রিন। আমার বাড়ি লেক গার্ডেন্সের মোড়েই। রিকশায় গল্ফ গ্রিন যেতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না। রিঙ্কির মা বুঝতেও পারবে না, মেয়ে পড়াশুনো করে এল, না অন্য কোথা থেকে। প্রায় তিন মাস রিঙ্কির সঙ্গে দেখা হয়নি। ওর গায়ের গন্ধ নিইনি। চুমুতে-চুমুতে ওর ঠোঁট লাল করে দিইনি। দেব কী করে? আমি তো কলকাতাতেই ছিলাম না। ক্রিসমাসের আগে বাড়ি ফিরে এসেছি। রিঙ্কিকে কাছে পাওয়ার জন্য সারা শরীর আর মন উন্মুখ হয়ে আছে। আর এই রকম একটা ভাইটাল দিনে উৎপাত! স্বপ্নময় শালা, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আর দিন পেল না।

রাস্তার আলো জ্বলে ওঠার পর থেকে ওকে অন্তত পাঁচবার বলেছি, "ভোম্বল, নর্থ ক্যালকাটায় যেতে তোর ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। এ-বার তুই কাট।"

আকাট ছেলে। প্রতিবারই বলল, "না রে, মিনিট চল্লিশের বেশি আমার লাগবে না। লেক গার্ডেন্সের মোড় থেকে অটো করে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে চলে যাব। ওখান থেকে পাতাল রেলে বেলগাছিয়া মাত্র তিরিশ মিনিটের রাস্তা।"

নর্থ ক্যালকাটার ছেলেরা এ রকম ক্যালাসই হয়। বরাবর দেখেছি। আমাদের ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি স্কুলে যে ক'টা ছেলে নর্থ ক্যালকাটা থেকে পড়তে আসত, তাদের সব্বাই ওই রকম। স্বপ্নময় আমার ওই স্কুলের বন্ধু। আমি, স্বপ্নময় আর জয়সওয়াল— এই তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। শুধু তাই নয়, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমরা একই সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় শখ করে আমরা তিনজন মিলে একবার সোনাগাছি পাড়ায় গেছিলাম। স্বপ্নময়ও আমাদের সঙ্গে ছিল। পরে বহুবার ভয় দেখিয়ে ওর ঘাড় ভেঙে খেয়েছি। সোনাগাছিতে বেশ্যা পাড়ায় যারা যায়, গোপনে নাকি তাদের ছবি তুলে রাখা হয়। তোর বাড়িতে সেই ছবি পাঠিয়েও দিতে পারে। ব্যাটা, বহুদিন বিশ্বাস করেছিল সে কথা।

জয়সওয়ালের সঙ্গে আমার একবার মারাত্মক ঝামেলা হয়েছিল। তার পরই কলেজ থেকে ফাদার অ্যাব্রাহাম আমাকে রাস্টিকেট করেন। জয়সওয়ালকে আমি উচিত শিক্ষা দিতাম। কিন্তু তার আগেই দাদু আমাকে বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেয়। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে আমাকে দয়ানন্দ কলেজে ভর্তি করেছিল। বায়ো টেকনোলজিতে। এখনও জয়সওয়ালের কথা মনে হলে আমার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায়। একদিন না একদিন শোধ আমি নেবই। গত দশ বছরে জয়সওয়ালের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র স্বপ্নময়ের সঙ্গেই আমার নিয়মিত সম্পর্ক আছে। যোগাযোগটা ও-ই বেশি করে রাখে।

পুরনো দিনের কথা থাক। স্বপ্নময়টাকে কাটাব কী করে

ভেবে পাচ্ছি না। রিঙ্কি এসে যদি ওকে দেখে, তা হলে বহুত রেগে যাবে। ওকে বলেছি, বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। থাকার কথাও নয়। আপন বলতে আমার একমাত্র ওই দাদুই। বাড়ির লাগোয়া সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে অবশ্য থাকে বাহাদুর। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আছে। বাড়ি পাহারা দেওয়া ছাড়াও ওর একটা বাড়তি কাজ আছে। সামনের বাগানটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা।

দাদু আজ সকালেই বহরমপুরে গেছে। দাদু মানে বাবার বাবা। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিত্র। ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আশা ফার্মাসিউটিক্যালস। শুধু এম ডি বললে ভুল বলা হবে। দাদু ওই ওষুধ কোম্পানির মালিকও। দাদুর অবর্তমানে আমিই মালিক হব। দাদুর কত বয়স, সঠিক জানি না। অবশ্যই সত্তরের উপর। তবে এখনও বেশ শক্তসমর্থ। ছোটবেলা থেকে কোনওদিন অসুস্থ হতে দেখিনি। তাই আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের মালিক হওয়ার আশু সম্ভাবনা আমার নেই। আমি অবশ্য ওই সব ঝামেলায় যেতেও চাই না। যতদিন স্ফূর্তি করে কাটানো যায়, ততদিনই মঙ্গল!

দাদু বলে গেছে, দিন তিনেক পর ফিরবে। কোম্পানির মাল নিয়ে বহরমপুরের এজেন্ট নাকি বেশ কিছুদিন ধরে টাকা দিচ্ছে না। সেই টাকা উদ্ধাব করার জন্যই দাদু গেছে। এত দিন কামাখ্যাবাবুর উপর টাকা আদায়ের ভার দেওয়া ছিল। দাদুর হঠাৎ মনে হয়েছে, কামাখ্যাবাবু ফাউল-প্লে করছে। তাই বাইরের কাউকে কিছু না বলে দাদু গাড়ি নিয়ে চলে গেছে বহরমপুর। আমাকে বলেছে, রোজ একবার বরানগরে ঢুঁ মারতে। ওখানেই গঙ্গার ধারে আমাদের কারখানা। বলেছি যাব, কিন্তু আজ যেতে ইচ্ছে করেনি। আজ রিঙ্কিকে বাড়িতে আসতে বলেছি। মনপ্রাণ উচাটন হয়ে আছে ওর জন্য। মাঝখান থেকে মনে হয়, সুন্দর সন্ধ্যাটা স্বপ্নময় বরবাদ করে দেবে।

ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে সেন্টার-টেবলে দুটো পা তুলে দিয়ে স্বপ্নময় টিভি দেখছে। পুরো গা এলিয়ে দিয়েছে। টিভিতে কী একটা সিনেমা চলছে। পুরনো দিনের বই। আড়চোখে দেখলাম, মমতাজ টাইট সালোয়ার কামিজ পরে নাচছে। গাছের আড়াল থেকে ঝট করে বেরিয়ে এসে মমতাজকে বুকে জড়িয়ে ধরল রাজেশ খন্না, সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে অন্য একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। রিঙ্কিকে পৌঁছে দিয়ে কঙ্কণা বেরিয়ে গেছে। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে রিঙ্কিকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আহ্, কতদিন কোনও মেয়েকে জড়িয়ে ধরিনি! গত তিন মাস ভুবনেশ্বরে এমন একটা হোটেলে ছিলাম, যা একদম বিজনেস সেন্টারে। একটা সেক্সি মেয়ে পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

মমতাজের নাচ দেখার ফাঁকেই হঠাৎ স্বপ্নময় বলল, "পুরনো বইগুলো, বুঝলি শুভ, এখনও বসে দেখতে ইচ্ছে করে।"

মাই গড, পুরো বইটা বসে ও দেখবে নাকি? সবে মমতাজের নাচ চলছে। ক্লাইমেক্সে যেতে বহুক্ষণ দেরি। সাতটা, সাড়ে সাতটা হয়ে যাবে। এর মধ্যে রিঙ্কি এসে পড়বেই। আর ওকে দেখলে স্বপ্নময় আরও উঠতে চাইবে না। ওকে রিঙ্কির কথা অনেক বলেছি। মানে, রিঙ্কির সঙ্গে আমার শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা। কোনও-কোনও সময় একটু বাড়িয়েও বলে ফেলেছি। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে কেতা নেওয়ার জন্য যা হয় আর কী। স্বপ্নময় কোনওদিন রিঙ্কিকে দেখেনি। আমিও চাই না, ও আর রিঙ্কি মুখোমুখি হোক। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ফেঁসে গেলাম। মনে-মনে একটু রাগও হচ্ছে স্বপ্নময়ের উপর। আমারই দোষ। বাড়ি ফিরে ওকে ফোন না করলেই ভাল হত।

পুরনো দিনের হিন্দি সিনেমা নিয়ে স্বপ্নময়ের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। কলেজ লাইফে

এ-সব নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি করেছি। এখন আর ও-সব ভাল্লাগে না। আনন্দ পাওয়ার অনেক উপাদান আমার জানা হয়ে গেছে। সব আনন্দের উৎস হল শরীরী। স্বপ্নময়টা জানেই না। পেশায় উকিল। ও বলে বটে অ্যাডভোকেট। শুনে আমার হাসি পায়। আলিপুর কোর্টে একটা টালির ছাদের নীচে ভাঙাচোরা এক টেবলের কোনায় আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে ও ওকালতি করে। বছর দেড়েক আগে কী একটা এফিডেফিট করার জন্য ওর কাছে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি।

ওর উল্টোদিকেই কালো কোট পরা দারুণ সেক্সি একটা মেয়ে বসেছিল সেদিন। স্বপ্নময়ই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার সঙ্গে। নামটা এখনও মনে আছে রঞ্জাবতী মণ্ডল। কাজ হয়ে যাওয়ার পর চা খেতে-খেতে একবার বাজিয়ে দেখেছিলাম। স্বপ্নময় তখন বলেছিল, "যাহ্, বাজে কথা বলিস না। রঞ্জাদি বিবাহিতা।" যেন বিবাহিতাদের পিছনে লাইন মারার কথা ভাবাটাই পাপ। আমি নিশ্চিত, স্বপ্নময়টা কোনও দিন মানুষ হবে না। যত দিন বাঁচবে, তত দিন ওকে নর্থ ক্যালকাটাতেই কাটাতে হবে।

কী করে স্বপ্নময়কে কাটাব, ভেবে উঠতে পারছি না। উঠে গিয়ে একবার জানলার পাশে দাঁড়ালাম। এই জানলাটা দিয়ে একেবারে লেক গার্ডেন্সের মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। রিঙ্কি আর কঙ্কণা এলে রিকশা করেই আসে। ওদের দেখতে পাওয়া মাত্রই আমি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। যাতে ওরা বুঝতে পারে, ওদের আসার জন্য কী আগ্রহ নিয়েই না আমি অপেক্ষা করছিলাম। এ সব ছোটখাটো ব্যাপার। কিন্তু দেখেছি, মেয়েরা খুব পটে যায়। অবশ্য রিঙ্কিকে পটানো আমার খুব সহজ হয়নি। যেদিন প্রথমে ওকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম, সেদিন ওর কী রাগ। সেই রাগটা কেটেছে আমার বাক্যবাণ আর হাতের গুণে। ওর শরীরের উপর এখন আমার

হাত ইচ্ছেমতো খেলা করে। বাধা তো ও দেয়ই না, উল্টে আমার সুবিধে করে দেয়।

না, জানলা দিয়ে রিঙ্কিদের আসার কোনও লক্ষণই দেখতে পেলাম না। ফের সোফায় এসে বসতে না-বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। বরানগর থেকে কামাখ্যাবাবুর ফোন। জানতে চাইছেন, দাদু বাড়ি আছে কি না। ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে কোনও ইন্সপেক্টর এসেছে ফ্যাক্টরিতে। দাদুকে সেজন্য দরকার। ইন্সপেক্টররা মাঝে-মধ্যেই আসে। এসে নিলর্জ্জের মতো হাত পাতে। দাদুকে দেখেছি, টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের বিদেয় করে দিতে। কামাখ্যাবাবুও জানেন সে-কথা। হা, হু করে জানিয়ে দিলাম, দাদু বাড়িতে নেই। শুনে ও-প্রান্তে কামাখ্যাবাবু ফোনটা রেখে দিলেন।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, স্বপ্নময় মন দিয়ে মমতাজকে দেখছে। রাজেশ খন্নার বুকে মুখ রেখে মমতাজ অঝোরে কাঁদছে। ওকে বিদেয় করার এই সুযোগ। ফোনটা ক্রেডলে না-রেখে একটু জোরেই বলে উঠলাম, "না, মাসিমা, স্বপ্নময় আমার এখানেই আছে। কী? এখুনি ওকে বাড়ি যেতে বলব? কেন, কী হয়েছে মাসিমা? মেসোমশাই অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন? স্ট্রোক নাকি? ও...আচ্ছা। না...না...আপনি চিন্তা করবেন না। এখুনি ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নিজের নামটা শুনে স্বপ্নময় সোফায় সিধে হয়ে বসেছিল। এ-বার আমাকে বলল, "কে ফোন করেছিল রে?"

গলা যতটা সম্ভব ভারী করে বললাম, "মাসিমা। তোকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে। তোর বাবা অফিসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"বাবা? অফিসে? কী বলছিস তুই? বাবা তো অনেকদিন হল রিটায়ার করে গেছেন! তুই ভুল শুনিসনি তো?"

এই রে....মেসোমশাই যে রিটায়ার্ড, সে-কথা ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম। চটজলদি যা মনে এল, বলে ফেললাম, "না

না...উনি বোধহয় এল আই সি অফিসে গেছিলেন। সেখানেই..."

"ধুর, বাবা এল আই সি অফিসে যাবে কেন? টাকা-পয়সা তো সব পেয়ে গেছে। তুই কী বলছিস শুভ, আমি বুঝতে পারছি না।"

"মেসোমশাই, টাকা-পয়সা সব কোথায় রেখেছে বল তো?"

"আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক। এই রে, বোধহয় ওই অফিসেই... হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার তো আজ ওই ব্যাঙ্কে যাওয়ার কথা ছিল। না রে চলি। বাড়ি ফিরে কী পরিস্থিতিতে পড়ব কে জানে?"

বললাম, "শিগগির যা। কী হল, একবার ফোনে সেটা আমায় জানিয়ে দিস।"

দ্রুত জুতো পরে স্বপ্নময় বেরিয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে আমি বাঁচলাম। উফ, ভাগ্যিস তখন কামাখ্যাবাবুর ফোনটা এসেছিল। তাই ওকে বোকা বানাতে পারলাম। সাধে কী আমি নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের ক্যালাস বলি? অন্য কেউ হলে আমার এখান থেকেই পাল্টা একটা ফোন করে, খবরটা সত্যি না মিথ্যে, তা যাচাই করে নিত। তা না-করে স্বপ্নময় ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল। কী বুদ্ধি নিয়ে যে ও ওকালতি করে, কে জানে? যাক, ওর কথা ভেবে আমার কোনও লাভ নেই। বাড়ি এখন ফাঁকা। রিঙ্কি আর একটু পরেই এসে পড়বে। ওর কথাই ভাবা যাক।

রিঙ্কির সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বছর দেড়েকের। ওর সঙ্গে আলাপ কঙ্কণাদের বাড়িতে। কঙ্কণার বাবা ওঙ্কারবাবু সে-সময় আমাদের... মানে দাদুর কোম্পানির চিফ কেমিস্ট। বিয়ের পঁচিশতম বছরে উনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখি, এলাহি কাণ্ড। সব রকম ব্যবস্থা আছে। দাদুর সমবয়সীরা ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে গেলেন।

pathagar.net

প্যান্ডেলের এক কোণে বসে আমি বোর হতে লাগলাম। কাউকে আমি চিনি না। আমার বয়সী ছেলেও নেই। ওই সময় তিন-চারটে মেয়ে এসে আমাকে টানাটানি করতে লাগল, 'চলুন না শুভ্র-দা, আমাদের সঙ্গে গল্প করবেন।" এদের মধ্যে ছিল ওঙ্কারবাবুর মেয়ে কঙ্কণাও।

সবাই বাইশ-তেইশ বছর বয়সী এবং সুন্দরী। স্কুল লাইফ থেকেই মেয়েদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তাই গল্পে মেতে গেলাম। বাঙ্গালোরের কলেজ থেকে বায়ো টেকনোলজির ডিগ্রি নিয়ে তখন সবে কলকাতায় ফিরেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝে গেলাম, ওদের চোখে আমি হিরো। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে বাঙ্গালোরের গল্প করছিলাম। হঠাৎই দরজার দিকে চোখ গেল। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। পরনে জামদানি শাড়ি। মাথার চুল উল্টো করে বাঁধা। দুর্দান্ত ফিগার। এ রকম সেক্সি মেয়ে তখনও পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। এখনও মনে পড়ে, আমার চোখ যেন আটকে গেছিল।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে মেয়েটা বলেছিল, "কঙ্কণা, আমি চললাম রে। আটটার মধ্যে হোস্টেলে পৌঁছতে না- পারলে আমাকে বের করে দেবে।"

কঙ্কণা তখন বলেছিল, "আটটার অনেক দেরি আছে। ভেতরে আয় রিঙ্কি, তোর সঙ্গে শুভ্রদার আলাপ করিয়ে দিই।"

"আলাপ করাতে হবে না। ওকে আমি চিনি।"

শুনে আমি একটু অবাক। মেয়েটাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। যেচেই জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে চেনো? কীভাবে?"

মুখে হাসিটা ধরে রেখেই রিঙ্কি বলল, "শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। তাই না?"

বাব্বা, দারুণ স্মার্ট মেয়ে তো! নাঃ, বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে, কঙ্কণারা সবাই ওর কথা শুনে হাসছিল। একটা জুতসই উত্তর

না দিলে, প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। তাই বললাম, "ভাবছি, কালই গোঁফ টোফ সব কামিয়ে ফেলব।"

রিঙ্কি বলেছিল, "দয়া করে ও কাজটা করবেন না। যে সব ছেলের গোঁফ নেই, তাদের আমার ছেলে বলেই মনে হয় না। মাফ করবেন, আপনাদের আড্ডায় আমার আজ বসা হবে না। চলি।"

কী মনে হল বলে ফেললাম, "এসো, আবার কোনওদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

"তাই! আমার তো মনে হয় না।" বলেই রিঙ্কি নীচের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

আমার জেদ চেপে গেছিল। সে দিনই কায়দা করে কঙ্কণার পেট থেকে রিঙ্কি সম্পর্কে অনেক কথা বের করে নিয়েছিলাম। ওর বাবা বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। রিঙ্কি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স নিয়ে পড়ে। কঙ্কণার সঙ্গে একই ক্লাসে। ও থাকে ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে। প্রায়ই আসে গল্ফ গ্রিনে কঙ্কণাদের বাড়িতে। কঙ্কণা বলেছিল, রিঙ্কি খুব নাক উঁচু টাইপের মেয়ে। কোনও ছেলেকে পাত্তা-টাত্তা দেয় না। ওর খুব ইচ্ছে, মডেল হবে। কিন্তু বাবার ভয়ে ওই লাইনে যেতে পারছে না। বাবাকে ও খুব সমীহ করে।

সেদিনই রিঙ্কিকে পটানোর লাইনটা আমি পেয়ে গেছিলাম। কঙ্কণার কাছ থেকে ওর হোস্টেলের ফোন নাম্বারটা নিয়ে রেখেছিলাম। দু'দিন চিন্তা-ভাবনা করে তার পর হঠাৎ একদিন ফোন, "শিকারি বেড়াল বলছি। একবার দেখা হতে পারে?"

তিন-চার সেকেন্ড চুপ করে থাকে তারপর ও প্রান্ত থেকে রিঙ্কি বলেছিল, "ও, আপনি! আরও আগেই আমি আপনার ফোনটা আশা করছিলাম। তা, আমার ফোন নাম্বারটা নিশ্চয়ই কঙ্কণার কাছ থেকে পেয়েছেন?"

"কলকাতায় চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায় বল তো?"

"বলুন, কী জন্য ফোনটা করলেন?"

"তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছে না। পরীক্ষা সামনে, পড়াশুনো নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত।"

"কী হবে এত পড়াশুনো করে? ইকনমিক্সের দিদিমণি হওয়ার চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি মানাবে মডেলদের র‍্যাম্পে। যদি চাও, তা হলে সে ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

ও প্রান্তে হি হি হাসি, "আমার সম্পর্কে এই ক'দিন বেশ হোম ওয়ার্ক করেছেন, তাই না?

কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে?"

"এত তাড়াতাড়ি লাভ ক্ষতির হিসাব করার দরকার আছে? পরীক্ষাটা কবে শেষ হচ্ছে তোমার?"

"দিন পনেরো পর।"

"ঠিক আছে, এই ক'টা দিন না হয় অপেক্ষা করা যাবে।"

"হঠাৎ আমার ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ? মধুমিতার কী হল শুভ্রদা?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। মধুমিতা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে দু'চারদিন ঘোরাঘুরি করেছিলাম। তাকে রিঙ্কি চিনল কী করে? অস্বীকার করে লাভ নেই। মধুমিতা সম্পর্কে ও কতটা জানে, জানি না। তাই বললাম, "ওয়েভ লেনথে মিলল না।"

"মেলা সম্ভবও না। যাক গে, ছাড়ি। আমাকে এখুনি বেরতে হবে।"

বলেই লাইনটা কেটে দিয়েছিল রিঙ্কি। আমি হতাশ হওয়ার ছেলে না। অনেক কষ্টে ওকে বাগে এনেছিলাম। একটা বছর লেগে গিয়েছিল, আমার ইচ্ছে অনুযায়ী ওকে চালাতে। সে সব দিনগুলোর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

pathagar.net

ইদানীং ও ধরেই নিয়েছে, আমাদের বিয়েটা হচ্ছে। বিয়ে হওয়ার পর একজন নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেভাবে গড়ায়, এখনই আমাদের সম্পর্কটা সে রকম। ওর আগ্রহও কম নয়। সেটা বুঝতে পারি, যখন দীর্ঘদিন বাদে আমরা কাছাকাছি আসি। যেমন আজকের দিনটা। আমি জানি, আমার শরীরের তাপ আর নির্যাস গ্রহণ করার জন্য রিঙ্কিও উন্মুখ হয়ে আছে।

রিঙ্কিকে বিয়ে করব কি না, এখনও সে সম্পর্কে কিছু ভাবিনি। ওর শরীরটাই আমাকে খুব বেশি করে টানছে। আমার লাইফ পার্টনার হওয়ার জন্য যে-সব গুণ ওর মধ্যে থাকা দরকার, এখনও সেগুলো নজরে পড়েনি। অনেক ছেলেমানুষি আছে ওর মধ্যে। প্রচুর মিথ্যে কথা বলে। এবং আমার কাছে ধরাও পড়ে যায়। সুন্দরী মেয়েরা একটু-আধটু মিথ্যে কথা বলেই। সেগুলি ওদের গুণের মধ্যেই পড়ে। রিঙ্কি যতদিন বান্ধবীর পর্যায়ে থাকবে, ততদিন ওর এই গুণটা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। কিন্তু আমার বউ হয়ে যাওয়ার পরও যদি মিথ্যেচারণ চালিয়ে যায়, তা হলেই মুশকিল। আমি কেন, কোন স্বামীই বা সেটা পছন্দ করবে?

কিন্তু রিঙ্কি এখনও আসছে না কেন? দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাতটা। না, এত দেরি করার তো কথা নয়। নিশ্চয়ই কোনও প্রবলেম হয়েছে। রিঙ্কিদের বাড়িতে ফোন করব নাকি? মাস তিনেক আগে রিঙ্কির বাবা বাঁকুড়া থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন। রিঙ্কি এখন তাই আর হোস্টেলে থাকে না। বাবা-মায়ের সঙ্গে ও থাকে গল্ফ গ্রিনের এক ফ্ল্যাটে। হোস্টেলে ফোন করার অনেক সুবিধা ছিল। বাড়িতে রোজ ফোন করা রিঙ্কি পছন্দ করে না। আসলে বাবার ভয়। আজ সকালেই একবার ওদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তখন প্রথমে রিসিভারটা তুলেছিলেন ওর বাবা। মনে হল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা উনি রিঙ্কিকে দিলেন। ভদ্রলোককে চাক্ষুষ দেখিনি। তবে রিঙ্কির মুখে যা শুনেছি,

তাতে মনে হয়েছে, আমার সঙ্গে বনবে না।

রিঙ্কির কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল। যাক, তা হলে ও এল। সোফা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলার পর দেখলাম, রিঙ্কি নয়। অপরিচিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বললেন, 'এটা কি শিবপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি?"

ড্রাগ কন্ট্রোলের কেউ নাকি? ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

"আমি থানা থেকে আসছি। আজ সকালে কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শিবপ্রসাদবাবুর। ওঁর ডেডবডি এখন কৃষ্ণনগর হসপিটালে। আপনারা এখুনি ওখানে যোগাযোগ করুন।"

'ডেডবডি' কথাটা শুনে আমার মাথা বোঁ করে ঘুরে উঠল।

দুই

জীবনে কখনও এই রকম পরিস্থিতিতে পড়ব, কল্পনাও করিনি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে যেন ঝড় বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে। কেওড়াতলায় দাদুর ডেডবডিটা পুড়িয়ে এই মাত্র বাড়ি ফিরে এসেছি। ফাঁকা বাড়িটা হা করে গিলে ফেলতে এল। বাড়িতে ঢোকা মাত্রই ভয়ে আমার বুকটা শিরশির করে উঠল। এই পৃথিবীতে আমি এখন একা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দাদুকে ছাড়া আর কাউকেই আমি আপন বলে জানি না। ছোটবেলায় আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসিমার মুখে শুনেছি, মা মারা যাওয়ার আগেই অল্পবয়সী এক মহিলার সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই মহিলা আমাদেরই ফ্যাক্টরিতে রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন। সম্পর্কের কথা জানতে পেরে দাদু সেই মহিলাকে বরখাস্ত করেন। এ নিয়ে দাদুর সঙ্গে বাবার প্রচণ্ড অশান্তি হয়।

বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

বাঙ্গালোরে পড়ার সময়, হঠাৎই একদিন দাদু ফোন করে আমাকে জানান, বাবা নেই। স্ট্রোক হয়েছিল। বাবার প্রতিবেশীরাই দাহ করার পর আমাদের বাড়িতে এসে খবরটা দেন। বাবার নাকি সে রকমই নির্দেশ ছিল। বাবার মৃত্যুর খবরটা আমাকে তখন একেবারেই বিচলিত করেনি। দাদুর মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল। মনে হচ্ছে, আমার মাথার উপর ছাদ নেই। খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনটা এতদিন যে ভাবে কাটিয়েছি, এখন আর সেভাবে কাটানো যাবে না। আমার মাথার উপর মারাত্মক দায়িত্ব।

শ্মশান থেকে আমার সঙ্গেই বাড়িতে এসেছেন কামাখ্যাবাবু এবং অফিসের আরও কয়েকজন। একজনকে চিনতে পারলাম। রবিনবাবু, কোম্পানির শুরু থেকেই নাকি আছেন। প্রায় দাদুর বয়সী। রিটায়ার করে যাওয়া সত্ত্বেও দাদু ওকে ছাড়েননি। আমাকে ভেঙে পড়তে দেখে কামাখ্যাবাবু বললেন, "নিজেকে শক্ত করো শুভ্র। ফ্যাক্টরির বত্রিশজন এমপ্লয়ি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।"

আমাদের ফ্যাক্টরিতে যে বত্রিশজন চাকরি করেন, সেটাই আমি জানতাম না। বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসার পর দাদুর নির্দেশে প্রায়ই আমি বরানগরে যেতাম। তবে বেশিক্ষণ ওখানে থাকতাম না। হাঁফ ধরে যেত। পালিয়ে চলে আসতাম পার্ক হোটেলের তন্ত্র বা তাজ বেঙ্গলের ইনসেমনিয়াতে। স্ফূর্তি করেই জীবনটা এতদিন কাটিয়েছি। ফ্যাক্টরির অর্ধেক লোককেই আমি চিনি না। দাদু যে হঠাৎ এ ভাবে চলে যাবে, আমি কোনওদিন কল্পনাতেও আনতে পারিনি।

নিজেকে সামলে কামাখ্যাবাবুকে বললাম, "দাদুর শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত আপনারা অফিসের কাজকর্ম চালিয়ে নিন। আমি তারপর বরানগরে যাব।"

কামাখ্যাবাবু বললেন, "পয়লা তারিখের মধ্যে কয়েকটা পার্টিকে পেমেন্ট করতে হবে। তুমি যদি কয়েকটা চেক সাইন করে দাও বাবা, তা হলে ভাল হয়।"

কথাটা শুনে এবার আমি কামাখ্যাবাবুর দিকে তাকালাম। দাদু গতকালই আমাকে বলে ছিল, কামাখ্যা মুখার্জি ফাউল প্লে করছে। কথাটা মনে পড়ে গেল। দাদুর মনে যখন একবার অবিশ্বাস ঢুকেছিল, তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। পকেট থেকে চেক বই বের করেছেন কামাখ্যাবাবু। চেক সই করানোর জন্য এত ব্যগ্র কেন? চেক বই তো থাকার কথা অফিসে। দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জানাজানি হওয়ার পর থেকে অফিস বন্ধ। কামাখ্যাবাবু আমার সঙ্গেই কৃষ্ণনগরে গেছিলেন। তা হলে উনি অফিস থেকে চেক বই নিয়ে আসার সময় পেলেন কোথায়? নাহ, লোকটাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। আমার বয়সটা কম বলে বোকা ভেবেছেন বোধহয় আমাকে।

বললাম, "পার্টিদের একটু ওয়েট করতে বলুন। আমি অফিসে যাই। তারপর না হয় পেমেন্ট করা যাবে।"

কথাটা বলার পরই রবিনবাবুর দিকে চোখ গেল। দেখলাম ভদ্রলোকের মুখে এক চিলতে হাসি। সামান্য ঘাড় নেড়ে উনি আমাকে তারিফও করলেন বলে মনে হল। কামাখ্যাবাবু তেতো মুখে চেক বই দুটো পকেটে ভরে বললেন, "তা হলে আমরা আসি বাবা। তোমার আত্মীয়স্বজন তো খুব বেশি কাউকে দেখছি না। বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে কি পাঠিয়ে দেব? হবিষ্যি টবিষ্যির নিয়মগুলো উনি ভাল জানেন। ক'দিনে কাজ করবে, তা নিয়ে কি কিছু ভেবেছ?"

এই কামাখ্যাবাবুটা তো মহা ধান্দাবাজ। স্ত্রীকে পাঠিয়ে আত্মীয়তা পাতাতে চাইছেন। বাবা বাছা করে ভদ্রমহিলা হয়তো আমার উপর গার্জেনগিরি শুরু করবেন। বয়স্ক মহিলা। ভদ্রতা করে আমি কিছু বলতেও পারব না। নাহ, এ

সুযোগ দেওয়া যায় না। শুরুতেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, আপনি আমার এমপ্লয়ি। সে রকমই থাকুন। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, "না, তার দরকার নেই। আমার এক পিসিমা এসেছেন। উনি এ ক'দিন এ বাড়িতে থাকবেন। পিসিমা বলছিলেন, মুখাগ্নি করেছি বলে আমার পনেরো দিনে কাজ করা উচিত।"

"হ্যাঁ সেই ভাল।" বলে উঠে পড়লেন কামাখ্যাবাবু। তারপর অন্যদের তাড়া দিলেন, "তোমরাও চলো, শুভ্রকে একা থাকতে দাও।"

অন্যদের তাড়া দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন বটে, কিন্তু কামাখ্যাবাবু নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "রামকি-র ফ্যামিলির কথা কিছু ভেবেছ নাকি বাবা?"

কৃষ্ণনগরে অ্যাক্সিডেন্টে দাদুর সঙ্গে মারা গেছে অফিসের ড্রাইভার রামকিও। মর্গে ওকে আমি চিনতেই পারিনি, এমন থেতলে গেছিল ওর বডিটা। ওর কথা আমার মনেই ছিল না। অফিস থেকে ওর ডেডবডি নিয়ে চলে গেছিল ওর প্রতিবেশীরা। চব্বিশ বছর বয়সী ইয়াং ছেলে। ড্রাইভিংয়ের হাতটা ভাল ছিল বলেই দাদু ওকে নিয়ে সব জায়গায় যেত। কপাল খারাপ। এমন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটাল, সব শেষ। কামাখ্যাবাবুকে আমি বললাম, " রামকির জন্য কী করা উচিত বলুন তো?"

"একটা মোটা কমপেনসেসন আমাদের দেওয়া উচিত। দু'তিন লাখ টাকা। বউ ছাড়া ওর আর কেউ নেইও। মাস ছয়েক আগে বিয়ে করেছিল। সে বউও থাকে দ্বারভাঙায়। খবর দিয়ে তাকে আনাতে হবে। তুমি পুরো ব্যাপারটা আমায় ছেড়ে দাও বাবা। আমি হ্যান্ডেল করছি।"

দু' তিন লাখ টাকা! টাকা কি খোলামকুচি? শুনে মনে মনে হাসলাম। না, এই লোকটাকে সবার আগে লাথি মেরে তাড়ানো দরকার। এমনভাবে লাথিটা মারব, টেরও পাবে না।

pathagar.net

আগে এম ডি-র চেয়ারে গিয়ে বসি। তারপর দেখা যাবে। তাই বললাম, "দেখুন এ নিয়ে যেন ওয়ার্কারদের মধ্যে কোনও অসন্তোষ না হয়।"

"হতে পারে বলেই তো আগে থেকে তোমাকে ব্যবস্থা নিতে বলছি।" কথাগুলো বলে কামাখ্যাবাবু আর দাঁড়ালেন না।

সারাটা দিন মারাত্মক ধকল গেছে। সোফার উপর শুয়ে পড়লাম। গতকাল ক্রিসমাস গেছে। আজ ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে। কাছা নিতে হয়েছে বলে ঠাণ্ডাটা বেশ টের পাচ্ছি। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে নিলে ভাল হত। দোতলায় আমার ঘরের আলমারিতে শাল আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে তা নিয়ে আসতে ইচ্ছেই করল না। পিসিমা বোধহয় এখন কোনও ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। দু'দিন ধরে খুবই কান্নাকাটি করেছে। পিসিমাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না। গত বছর পিসেমশাই মারা গেছেন। টাকা পয়সা খুব কিছু মনে হয় রেখে যেতে পারেননি। পিসিমার একটাই ছেলে—টুবলু। খবরের কাগজের রিপোর্টার। সামান্যই মাইনে পায়। পিসিমা যদি একবার এসে বলত, দাদু আমাদের কোম্পানিতেই ওকে ভাল একটা চাকরি দিতে পারত। কিন্তু দাদুর সঙ্গে অত ভাল সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও পিসিমা কখনও কিছু চায়নি।

চোখ বুজে আসতেই দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। দাদু আজ নেই বলেই বুঝতে পারছি, দাদু আমার জীবনে কী ছিল। এই তো মাস তিনেক আগে দাদু আমাকে ভুবনেশ্বরে পাঠাতে চাইছিল। ওখানকার মার্কেটে আমাদের ওষুধের কতটা চাহিদা, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ নিয়ে আসার জন্য। আমি আজ যাব, কাল যাব করে ক্রমাগত দিন পিছিয়ে দিচ্ছিলাম। একদিন দাদু আমাকে বলল, "দ্যাখ শুভ্র, বাঙালির ব্যবসা সম্পর্কে লোকে যা বলে, এখন মনে হচ্ছে তা সত্যি।"

বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কথাটা কী?"

"এই...যে বাঙালির ব্যবসা তিন পুরুষের বেশি টেকে না। তোর অ্যাটিচিউড দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের আশা ফার্মাসিউটিক্যালসও টিকবে না। এই কোম্পানিটা যদি কোনও গুজরাতি বা মারোয়াড়ি পরিবারের হত, তা হলে ফোর্থ জেনারেশন চার গুণ বাড়াত। তোদের সঙ্গে ওদের এতটাই তফাত।"

বললাম, "ব্যবসাতে বসাবে বলেই তো এত পয়সা খরচা করে বাঙ্গালোরে আমাকে বায়ো টেকনোলজি পড়িয়েছ।"

"তোর হাবভাব দেখে তো আমার সেটা মনে হচ্ছে না। খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিস। দ্যাখ শুভ্র, আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম। একটা সময় এই কোম্পানি চালাতে আমার কত অসুবিধে হয়েছে জানিস? বাবার হাত থেকে যখন দায়িত্ব নিলাম, তখন এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করত মাত্র পাঁচজন। একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, কোম্পানিটাকে বাড়াব, তা খানিকটা তো বাড়িয়েছি। তোর বাবা আমাকে ডুবিয়ে গেল। তুইও আমাকে ডোবাবি বলে মনে হচ্ছে।"

"তুমি কী চাও বল তো?"

"গত পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক খেটেছি। এবার একটু বিশ্রাম চাই। তুই উওম্যানাইজিং বন্ধ করে এবার পুরো দায়িত্ব কাঁধে নে। আমি থাকতে থাকতে আশপাশের স্টেটগুলোতে গিয়ে ব্যবসাটা একটু বাড়া। যে সব প্রোডাক্ট আমাদের আছে, তাতে ভ্যারাইটি আন। বাইরে থেকে এত জার্নাল আসে, তুই তো একটাও উল্টে দেখিস না। আমি যদি হঠাৎ চোখ বুজি তা হলে যে সবাই লুটেপুটে খাবে রে।"

"তুমি আমাকে এত বুদ্ধু ভেবো না দাদু।"

"আরে, ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা আলাদা। তুই এখন বুঝবি না।"

দাদুর কথামতোই আমি ভুবনেশ্বরে গেছিলাম। এই জানুয়ারি মাসে যাওয়ার কথাও ছিল অসমে। দাদু সিডিউল

pathagar.net

বানিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যে এই অঘটন। আমাকে এখন ব্যবসায়িক বুদ্ধি দেখাতে হবে। কামাখ্যাবাবুদের মতো লোকদের হ্যান্ডেল করতে হবে। প্রতি পদে পদে সাবধান থাকতে হবে। না হলে মুশকিল। আজই টের পেয়ে গেছি, কীরকম ধুরন্ধর লোকদের নিয়ে দাদু এতদিন কোম্পানি চালিয়েছে। ড্রাইভার রামকি-র ব্যাপারটা নিয়ে পরে একটু ভাবতে হবে। ইউনিয়নের ছেলেগুলোকে যাতে কেউ না ক্ষেপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায়। কোম্পানিটাকে বাড়াতেই হবে। না বাড়ালে দাদুর আত্মা শান্তি পাবে না।

এ সব ভাবার ফাঁকেই হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, পিসিমা। হাতে শরবতের গ্লাস। আমার দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা খেয়ে নে বাবা। রাতে তোর গীতামাসি ফল টল কেটে দেবে। কাল সকালে এসে আমি হবিষ্যির জোগাড় করে দেব।"

পিসিমার দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। অনেক অনেক দিন হল, মায়ের বয়সী আপন কেউ আমার দিকে খাওয়ার জিনিস এগিয়ে দেয়নি। গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললাম, "তুমি কি আজ থাকবে না পিসিমা?"

"না রে। টুবলুর বউ প্রেগনেন্ট। খুব অ্যাডভ্যান্স স্টেজ। আমি বাড়িতে না থাকলে ওরা প্রবলেমে পড়ে যাবে। আর শোন, অপঘাতে মৃত্যু কাকার। রাতে তুই কিন্তু একা থাকিস না। গীতাকে বলেছি, অশৌচের ক'টা দিন ওর ছেলেকে যেন রাতে এ বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।"

পিসিমার একমাত্র ছেলে টুবলু। আমার থেকে দু'তিন বছরের ছোট। ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায়, টুবলু তাই। প্রেম করে এরই মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে। ভাল ছেলেদের নিয়ে এই প্রবলেম। আগু-পিছু ভাবে না। বোঝেই না, প্রেম বলে কোনও পদার্থ নেই। এর মধ্যে আবার বাচ্চা নিয়ে আসছে! কী দরকার ছিল, সাত তাড়াতাড়ি সংসারে জড়িয়ে পড়ার?

শরবতে চুমুক দিয়ে বললাম, "পিসিমা, তুমি যাবে কী করে? দাঁড়াও ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসুক।"

গায়ে শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে পিসিমা বলল, "না রে দরকার নেই। বাঘাযতীন এই তো কয়েকটা স্টপেজ। যে কোনও বাসে উঠে চলে যাব। তুই সাবধানে থাকিস বাবা। বিপদ কখনও একা আসে না।"

পিসিমা একা একা এই অফিস টাইমে বাসে করে যাদবপুরে যাবে, ভাবতেই আমার ভাল লাগল না। কিন্তু আমি জানি, পিসিমা আমার কোনও সাহায্য নেবে না। পিসেমশাইয়ের শিক্ষা। শুনেছি, পিসেমশাই নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতার পর দাঙ্গায় একজন মুসলমান প্রতিবেশীকে বাঁচাতে গিয়ে উনি মুখে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। একটা চোখও নষ্ট হয়ে যায়। পিসেমশাইকে আমি খুব কমই দেখেছি। সব সময় উনি সানগ্লাস পরে থাকতেন।

পিসিমা বেরিয়ে যাওয়ার পর দোতলায় উঠে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে নিলাম। তারপর ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। সন্ধে প্রায় ছ'টা। এর মধ্যেই আকাশে তারা ফুটে বেরিয়েছে। বারান্দা থেকে লেক গার্ডেন্সের মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। নানা ধরনের দোকানপাট হয়েছে। আলোয় ঝলমল করছে জায়গাটা। মনে পড়ল গতকাল ক্রিসমাস গেছে। সেই কারণেই বোধহয় দোকানগুলো আরও বেশি সাজানো। আমাদের এই লেক গার্ডেন্সে কয়েক ঘর ক্রিশ্চান পরিবার থাকেন। সেই সব বাড়িতে রঙিন আলো লাগানো। ক্রিসমাসের আগের রাতটা টলি ক্লাবে গিয়ে কাটাব ভেবেছিলাম। পুরো দিনটাই আমার কাটল কৃষ্ণনগরের হাসপাতাল আর মর্গে।

আমার জীবনের সব থেকে বিশ্রী দিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

সেই সব কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল বেলা বারোটা নাগাদ। এন এইচ থার্টি ফোর-এ। রামকি বোধহয় ওভারটেক করতে গেছিল। বহরমপুরের দিক থেকে আসা একটা ট্র্যাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে যায় দাদুর মারুতির। কোতোয়ালি থানায় গিয়ে মারুতির অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, রামকির দেহটা থেতলে গেছিল কেন? দাদু বসেছিল রামকির বাঁপাশে। দাদুর বরাবরের অভ্যেস ড্রাইভারের পাশে বসা। সেটাই কাল হল। অ্যাক্সিডেন্টের পর সঙ্গে সঙ্গে নাকি দাদু মারা যায়নি। স্থানীয় লোকেরা গাড়ি থেকে দেহটা বের করার পর আমার নাম আর বাড়ির ঠিকানাটা বলে যেতে পেরেছিল।

মর্গে নিয়ে গিয়ে পুলিশ যখন আমাকে দাদুর ডেডবডিটা দেখাল, তখন আমি শিউরে উঠেছিলাম। নীচের দিকটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। ভালই হয়েছে, মারা গেছে। বেঁচে থাকলে দাদু পঙ্গু হয়ে থাকত। সেই ডেডবডি কলকাতায় আনতে আনতে আজ ভোর হয়ে গেল। কাল সারাটা রাত দু'চোখের পাতা আমি এক করতে পারিনি। আজও মনে হচ্ছে, ঘুম আসবে না। আশ্চর্য, দাদুর জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও আমি ফেলতে পারলাম না। চোখে জল না এলে আমি করবই বা কী?

সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছিল। নীচে বাগানে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে ঘুরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। বুঝতে পারিনি গীতামাসি কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। আমায় বলল, "বড়বাবুর ঘরে ধূপধুনো জ্বালিয়ে দিয়েছি। ঘরটা কি বন্ধ করে রাখব?"

বললাম, "না, খোলাই থাক।"

"ঘরটা খা খা করছে শুভ্র।" গলা ভিজে এল গীতামাসির।

বললাম, "প্রথম প্রথম এ রকম লাগবে।"

"তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলুম শুভ্র। আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দেবে? এখন তো তোমার হাতেই সব।"

সঙ্গে সঙ্গে কামাখ্যাবাবুর মুখটা দেখতে পেলাম গীতামাসির মুখে। একটু কড়াভাবেই বললাম, "এ সব এখন থাক। আমার মনমেজাজ ভাল নেই।"

বলেই আর দাঁড়ালাম না। পায়ে পায়ে সোজা এসে ঢুকলাম দাদুর ঘরে। গীতামাসি আমার আপন কেউ না। ছোটবেলায় আমার গভর্নেস হিসাবে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। দাদুর তখন সাহেবি কেতা। মা মারা যাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে মহিলা বলতে কেউ ছিল না। তাই দাদু আর গীতামাসিকে ছাড়েনি। মাইনে বাড়িয়ে রেখে দিয়েছিল। তখন থেকে আমাদের বাড়ির সব দায়িত্ব গীতামাসিরই উপর। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও গীতামাসি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই।

যমুনা বলে একটা মেয়ে আর বোচান বলে একটা ছেলেকে গীতামাসি রেখে দিয়েছে। যমুনার কাজ হচ্ছে বাড়িটাকে ঝকঝকে করে রাখা। রান্নাবান্নায় সাহায্য করা। আর বোচান বাজার করে এনে দেয়। বাইরের যাবতীয় ফাইফরমাশ খাটে। গীতামাসি থাকে গোবিন্দপুরের দিকে। লেক গার্ডেন্সের কাছেই। একতলা একটা বাড়িও করেছে। দাদু তখন কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিল বলে শুনছি। রোজ সকাল-বিকাল দু'বেলা আসে। কোনও কামাই নেই। শুনেছি, গীতামাসির স্বামী একটা সময় কাশীপুরের গান অ্যান্ড শেল, ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। এখন করে কি না জানি না।

দাদুর ঘরে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেরাচ্ছে। ধীর পায়ে খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাদু একবার বলেছিল, খাটটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। বার্মিজ টিক-এর তৈরি। বউবাজারের কোনও এক চিনা দোকান থেকে কেনা। পালিশ

এখনও চকচক করছে। গদির উপর টানটান করে বেডকভার পাতা। ডানলোপিলোর দু'টো বালিশ। মাথায় মশারি টাঙানো। যেন কেউ একটু পরেই শুতে আসবে। দাদুকে শোওয়া অবস্থায় কোনওদিন আমি দেখিনি। ভোর পাঁচটায় উঠে নাকি ফ্রিহ্যান্ড এক্সসারসাইজ করত। দাদু কতক্ষণ ঘুমোত, আমার কোনও আন্দাজ নেই। আশ্চর্য, এতদিন এক ছাদের তলায় থাকা সত্ত্বেও কোনও দিন আমার মনে কিন্তু প্রশ্নটা জাগেনি।

ঘরে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে হল, কৃষ্ণনগরের পুলিশ কাল দাদুর যে ব্রিফকেসটা আমায় দিয়েছিল, সেটা কোথায় রাখলাম? ব্রিফকেসটা গাড়ির পিছনের সিটে পাওয়া গেছিল। কথাটা মনে হতেই দ্রুত পায়ে আমি নীচের ঘরে নেমে এলাম। ব্রিফকেসটা নিয়ে যে বাড়িতে ঢুকেছিলাম, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ব্রিফকেসে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছু পাওয়া যাবে। অন্তত বহরমপুরের সেই এজেন্ট সম্পর্কিত কাগজপত্র বা টাকা পয়সার হিসাব। যা আনতে দাদু যাচ্ছিল বহরমপুরে। পরে ওই কাগজপত্র আমার কাজেও লাগতে পারে। একবার খুলে দেখা দরকার ওই ব্রিফকেসে কী ছিল।

আমার ঘরে ঢুকতেই দেখি, ওটা শো কেস-এর উপর রাখা আছে। পুলিশ দাদুর পকেটে পাওয়া চাবির গোছাও আমাকে দিয়েছিল। মনে পড়ল সেটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম আলমারির ভেতরে। কেননা ওই গোছায় অফিসের কয়েকটা দরকারি চাবিও ছিল। আলমারির ভেতর থেকে চাবির গোছা বের করে ব্রিফকেসটা খুলেই আমি চমকে উঠলাম। এ কী, এত টাকা? দাদু তো টাকা আনতেই বহরমপুর যাচ্ছিল। তা হলে এত টাকা সঙ্গে নিয়ে গেল কেন?

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতেই টাকার বান্ডিলগুলো গুনে ফেললাম। ঠিক এক লাখ টাকা! এর মানেটা কী? ব্রিফকেসের

খাঁজে বেশ কিছু কাগজপত্র রয়েছে। খামে ভরা বেশ কয়েকটা চিঠিও। একটা চিঠি খুলে দেখলেম, দাদু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেছিল, আমাদের কোম্পানির কিছু ওষুধ বিক্রি করার জন্য। হু-র দিল্লি প্রতিনিধি তার উত্তরে স্যাম্পল পাঠাতে বলেছে। একটা চিঠিতে বহরমপুরের এজেন্ট সুনীল ভকত লিখেছেন, কামাখ্যাবাবু বেআইনিভাবে কমিশন চাইছেন। উনি যদি এরকম চাপ দিতে থাকেন, তা হলে আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের সঙ্গে ওরা ব্যবসাই করবেন না। গেরাল্ড ইন্ডিয়া কোম্পানি অলরেডি অ্যাপ্রোচ করেছে। ভবিষ্যতে সেখান থেকেই ওঁরা মাল নেবেন।

সুনীল ভকতের চিঠিটা আমি আলাদা সরিয়ে রাখলাম। পরে কাজে দেবে। তা হলে সেদিন দাদু যা বলেছিল, তা ঠিক। এই কামাখ্যাবাবু লোকটাকে ক্ষমা করা যায় না। প্রচণ্ড রাগ হতে থাকল ওঁর উপর। এই চিঠিটা না পেলে দাদু বহরমপুরে যেত না। তা হলে ওই অ্যাক্সিডেন্টটাও হত না। দাদুর মৃত্যুর জন্য আমার মনে হতে লাগল কামাখ্যাবাবুই দায়ী।

পরে লোকটার ব্যবস্থা করা যাবে। ব্রিফকেসের খাঁজ থেকে আর একটা খাম আমি বের করে আনলাম। আমাদের কোম্পানিরই খাম। খুলে দেখি, পুলিশে করা একটা এফ আই আর-এর কপি। বরানগর থানায় দাদু একটা কমপ্লেন করেছিল। কারা যেন দাদুকে হুমকি দিয়েছে, পাঁচ লাখ টাকা না দিলে খুন করে ফেলবে।

এফ আই আর-এর কপিটা পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

pathagar.net

তিন

দাদুর শ্রাদ্ধের দিন রবিনবাবুর সঙ্গে বসে কথা বলছি, এমন সময় দেখি গীতামাসির ছেলে মনা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার রামকি-র দ্বারভাঙার বাড়িতে ওকে পাঠিয়েছিলাম দিন চারেক আগে। খবর নেওয়ার জন্য, রামকির বউ কত টাকা পেলে ঝামেলা করবে না। ভোরের ট্রেনে মনা বোধহয় ফিরেছে দ্বারভাঙা থেকে। কী হল, তা জানার জন্যই হাত নেড়ে ওকে ডাকলাম। বাড়িতে আজ অনেক লোক। ফ্যাক্টরির এমপ্লয়িরাই বেশি। লেক গার্ডেন্স সংহতি ক্লাবের দুর্গাপূজার প্রেসিডেন্ট ছিল দাদু অনেক বছর ধরে। ক্লাবের ছেলেরাও এসেছে। বহু দূর দূর থেকে এসেছেন আমাদের এজেন্টরা। আমার আত্মীয়স্বজন খুব কম। কিন্তু কেন জানি না, গত দুদিন ধরে মনে হচ্ছে, আমি একা নই। আমার বিপদের দিনে অনেকেই পাশে আছেন।

মনা কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "অনেক কথা আছে শুভ্রদা। এখানে বলা যাবে না।"

বললাম, "তা হলে আমার ঘরে চল।"

মনার ব্যাপারে গীতামাসি যখন আমাকে বলতে এসেছিল, তখন আমি রাগ করেছিলাম। কিন্তু গত কয়েকটা দিন ওকে কাছ থেকে দেখে মনে হল, বেশ কাজের ছেলে। মনা মাধ্যমিক দিয়েছিল রাজেন্দ্রনগর স্কুল থেকে। বুদ্ধি টুদ্ধি আছে। কোনও কাজ একবার বলে দিলে চট করে ধরে নেয়। প্রচণ্ড সাহসী আর বিশ্বাসীও। সব থেকে ভাল, খুব কম কথা বলে। অদরকারে নাক গলায় না। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র। দাদুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করার জন্য এ ক'দিন ওকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি। ও ঠিক বুঝতে পারে আমার কখন কী দরকার। ঠিক করেছি, আমার ফ্যাক্টরিতে ওকে একটা কাজ দেব। আমার ব্যক্তিগত দরকারে লাগে, এমন কোনও কাজ।

আমার পিছন পিছন মনা ঘরের ভেতর এসে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, ঠিকঠাক পৌঁছেছিলি?"

মনা ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ শুভ্রদা। দ্বারভাঙা স্টেশন থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে। রামকির বাড়িতে গিয়ে এক প্রবলেম। ওর দাদারা কেউ অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানেই না।"

"তার মানে? রামকি যে মারা গেছে, তা ওরা শোনেনি?"

"না।"

"আশ্চর্য। তা হলে ডেডবডিটা কারা নিয়ে দাহ করল?"

"সেদিন তো আমি ছিলাম না শুভ্রদা। জানি না।"

"তা ঠিক। তা হলে তোর মুখেই ওরা শুনল অ্যাক্সিডেন্টের কথা?"

"না, আমি কিছু বলিনি। ওরা জানে না বুঝতে পেরে আমি আর ও প্রসঙ্গ তুলিনি।"

"গুড। ওর দাদারা জানতে চায়নি, তুই গেছিস কেন?"

"দেহাতি সাদাসিধে লোক সব। রামকিকে আমি চিনি, ব্যস। আদর করে ওরা আমাকে একটা দিন আটকে রাখল।"

"ওর বউকে দেখেছিস?"

"না শুভ্রদা। রামকি বিয়েই করেনি। ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল মাস ছয়েক পর। ওদের নিয়মে নাকি কন্যাপণ দিতে হয়। সেই টাকাটা রামকি জোগাড় করতে পারেনি বলেই বিয়েটা অ্যাদ্দিন আটকে ছিল। আমাকে ওখানে পাঠিয়ে আপনি ভালই করেছিলেন শুভ্রদা। না হলে কমপেনসেশনের টাকাটা পুরো চোট হয়ে যেত।"

রামকি-র বিয়ে হয়নি শুনে আমি খাটের উপর বসে পড়লাম। ওর বউয়ের গপ্পটা তা হলে কামাখ্যাবাবুই বানিয়েছেন? বাস্টার্ড। হয়তো কোনও একজন হিন্দুস্থানি মেয়েকে আমার সামনে নিয়ে এসে ক্ষতিপূরণের পুরো টাকাটা তুলে নিতেন। তারপর নব্বুই পার্সেন্ট টাকাই নিজে

ঝেড়ে দিতেন। ভদ্রলোক প্রায় পঁচিশ বছর আমাদের কোম্পানিতে আছেন। ম্যানেজার গত দশ বছর ধরে। এভাবে তা হলে কত টাকা সরিয়েছেন, ভাবতেই মাথাটা গুলিয়ে গেল।

মনাকে বললাম, "এই কথাগুলো আর কাউকে বলবি না। আর শোন, বাইরে একটা লম্বা মতো লোককে তোকে চিনিয়ে দেব। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা। নাম কামাখ্যাবাবু। কায়দা করে ওর বাড়িতে তোকে যেতে হবে। ফিরে এসে ওর বাড়ি সম্পর্কে আমায় খবর দিবি। কিছু বুঝতে পারলি?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি। ভদ্রলোক কোন পাড়ায় থাকেন, জানেন?"

"ভবানীপুরে। জগুবাবুর বাজারের কাছে।"

"ওঃ, ল্যাংড়া তপনদার পাড়া। চিন্তা করবেন না, সব খবর আমি পেয়ে যাব।"

"কে ল্যাংড়া তপনদা?"

"আপনি চিনবেন না শুভ্রদা। আগে আমি পার্টি করতাম। তাই কলকাতার সব পাড়ার মাস্তানদেরই চিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি লোকটার সব খবর এনে দেব।" মনা আমাকে আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, প্যান্ডেলে ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসে গেছে। তদারকি করছেন কামাখ্যাবাবু। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা। যেন বরকর্তা। হাত জোড় করে সবাইকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলছেন। ভদ্রলোককে দেখে বোঝার উপায় নেই, এত নীচ। আমার দিকে চোখ পড়তেই কাছে এসে বললেন, "শুভ্র, একবার নিমন্ত্রিতদের কাছে চলো। এটা তোমার কাজ।"

কেউ জ্ঞান দিক, আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আজকে এমন একটা দিন, কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা উচিত হবে না। ভদ্রতা করার জন্যই কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে নিমন্ত্রিতদের কাছে গিয়ে আমি প্রত্যেককে খাওয়ার জন্য

অনুরোধ করতে লাগলাম। অনেককেই আমি চিনি না। কামাখ্যাবাবু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। কেউ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কেউ বোলপুর, কেউ শিলিগুড়ি থেকে এসেছেন। কোনও না কোনওভাবে আমাদের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। নিমন্ত্রিতদের লিস্ট তৈরি করেছেন কামাখ্যাবাবু। ভালই হল, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সঙ্গে আলাপ রাখা উচিত। কেননা, কোম্পানির ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে এঁদের উপর। দাদু এঁদের প্রত্যেককে নামে চিনত।

অনেকক্ষণ ধরে একটা সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে হচ্ছিল, ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্য আমি এক পাশে সরে এলাম। সিগারেটে প্রথম টানটা মারার পরই কেন জানি না, হঠাৎ স্বপ্নময়ের কথা মনে হল। এখন কাছে থাকলে বারণ করতই। "এই, তুই সারাটা দিন পেটে কিছু দিসনি। প্লিজ, খালি পেটে সিগারেট খাস না।" আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকের অনেক দোষ আছে। কিন্তু এই একটা ছেলে যার কোনও বদভ্যাস নেই। দাদু মারা যাওয়ার পরও রোজই আমাদের বাড়িতে এসেছে। ক্রিসমাসের জন্য ওর কোর্ট এখন বন্ধ। স্বপ্নময় ব্যাটাচ্ছেলে ভুলেই গেছে, বাবার অসুখ বলে একদিন ওকে বাড়ি থেকে আমি কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ ওদের বাড়ির সবাইকে আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম। কিন্তু এখনও স্বপ্নময় বা ওদের বাড়ির কেউ আসেনি। ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। ও যে গেইপের ছেলে নেমন্তন্ন না করলেও আসত। গত পরশুই আমাকে বলে গেছিল, "তুই কোনও চিন্তা করিস না। আমি আসছি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আমি নিজে সুপারভাইজ করব।" ওর বাড়িতে কি তা হলে কোনও অঘটন ঘটল? নাহ, তাই যদি হত, তা হলে স্বপ্নময় আমাকে অবশ্যই ফোন করে জানাত।

সিগারেটে দু'একটান মেরেই ফেলে দিলাম। ভেতরে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তায় চোখ যেতেই দেখি, ট্যাক্সি থেকে স্বপ্নময় নামছে। পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি। মল্লিক বাড়ির ছেলে, দারুণ লাগছে ওকে দেখতে। কী একটা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলাম। আমার দিকে চোখ পড়তেই ও বলে উঠল, "একটু দেরি হয়ে গেল মাইরি। তুই কিছু মাইন্ড করিসনি তো?

বললাম, "না। তোর বাড়ির লোকজন আসবে না?"

"এখনও আসেনি?" পাল্টা প্রশ্ন করল স্বপ্নময়।

"না। তুই ওঁদের সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?"

"আরে, তাই তো কথা ছিল। আজ সকালে জয়সওয়াল ফোন করে ওর বাড়ি যাওয়ার জন্য খুব রিকোয়েস্ট করল। তখন বাবাকে বললাম, তোমরা দশটা-এগারোটার মধ্যেই বেরিয়ে যেও। আমি জয়সওয়ালের বাড়ি ঘুরেই লেক গার্ডেন্স চলে যাব। বাবাটা কী লোক বল তো মাইরি। এখনও আসেনি!"

জয়সওয়ালের নামটা শুনে মাথার ভেতর দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, "ওই বাস্টার্ডটা তোকে ডেকেছিল কেন?"

আমার চোখ মুখে বোধহয় রাগ ফুটে উঠেছে। সেটা লক্ষ করেই স্বপ্নময় আমাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল, "এই শুভ্র... আজ কাজের দিন। ফালতু মাথা গরম করিস না। শোন, জয়সওয়াল আড্ডা মারার জন্য আমায় ডাকেনি। একটা লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য ডেকেছিল। পার্টনারশিপে একটা নতুন ভেঞ্চারে ও নেমেছে। মিনারেল ওয়াটার তৈরির কোম্পানি। বোতল জল বিক্রির ব্যবসা। তা, ওর ওখানে গিয়ে দেখি, কী বাড়ি করেছে রে! মার্ভেলাস। দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি।"

স্বপ্নময়ের এই এক দোষ। ভুলেই গেছে, জয়সওয়ালের উপর আমার কী রকম রাগ। আমার সামনেই ওর প্রশংসা শুরু

করে দিয়েছে। জয়সওয়াল আমাদের সঙ্গে যখন পড়ত, তখন থাকত বড়বাজারের দিকে কালাকার স্ট্রিটে। এক চিলতে ভাড়া বাড়িতে। এখন কোথায় থাকে সেটা জেনে রাখার জন্যই, রাগটা চেপে বললাম, "বাস্টার্ডটা এখন কোথায় থাকে রে?"

"এই তো, বালিগঞ্জ প্লেসে। তিন-চারটে ব্যবসা। সুখেই আছে মাইরি। ওর সেই বউকে দেখলাম। বিয়ের সময় গেঁয়ো গেঁয়ো টাইপের ছিল। এখন দেখলে চিনতেও পারবি না। কী সেক্সি! মিনারেল ওয়াটারের কোম্পানিরও নাম দিয়েছে দুর্গা। বউয়ের নামে এই তো... ফ্যাক্টরিটা তোদের এখানেই। গোলাম মহম্মদ শা রোডে। আগে বোধহয় ওখানে একটা রং তৈরির কারখানা ছিল। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। পুরো জায়গাটাই জয়সওয়াল কিনে নিয়েছে। ওকে দেখে আজ খুব হিংসে হচ্ছিল রে।"

"আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করল?"

"করেছিল। কিন্তু আমি কিছু বলিনি। একজনের **কথা** অন্য জনকে বলা উচিত না। কী বল, ঠিক করিনি?"

"কী জিজ্ঞেস করল আমার সম্পর্কে?"

"একবারই জানতে চাইল। তোর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় কি না। বললাম, হয়। খুব কম। তখন ও বলল, 'শুভ্র কি আমার উপর এখনও রেগে আছে?' আমি বললাম, জানি না। তোর সম্পর্কে তো কোনওদিন আলোচনা হয় না। তবে আমার মনে হয় না, শুভ্র এতদিন তোর উপর রাগ পুষে রাখবে।"

কথাটা শুনে স্বপ্নময়ের উপরই আমার রাগ হয়ে গেল। এসব কথা ওকে কে বলতে বলেছে? ব্যাটা একটা গাঁড়ল। অন্যদিন হলে রাগটা ঝেড়ে দিতাম। কিন্তু আজ ও আমার অতিথি। তাই বললাম, "তোর এই কথাটা শুনে ও কী বলল?"

"বলল, **শুভ্রর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে** পারবি?

pathagar.net

দেখা হলে ওর কাছ থেকে আমি অ্যাপোলজি চেয়ে নেব। যাক গে, ওর কথা ছাড়। চল, গিয়ে দেখি, ভেতরে কী অবস্থা।"

স্বপ্নময়ের সঙ্গে কয়েক পা এগনোর পরই হাতে ধরা মোবাইলটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে রিঙ্কি। বলল, "তোমার লাইনটা সেই কখন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। সুইচ অফ করে রেখেছিলে নাকি?"

মেজাজটা খিঁচড়ে গেছিল। রিঙ্কির গলা শুনে ভাল হয়ে গেল। বললাম, "কই, না তো।" বলেই মনে পড়ল, সত্যিই একটা সময় অনেকক্ষণ মোবাইলটা অফ করে রেখেছিলাম। নিজের দোষ ঢাকার জন্য বললাম, "আগে বলো, তুমি আসছ কখন?"

"তোমার ওখানে কি লোকজনের ভিড় কমেছে?"

"না, কমেনি। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?"

"ধুর, অত লোকের ভিড়ে তোমাকে একা পাওয়া যাবে না। এখন গিয়ে কোনও লাভ আছে?"

মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। বললাম, "ভিড় তো প্যান্ডেলে। ওপরের ঘরটা খালি আছে। তুমি এলে ঘরে ঢুকে পড়া যাবে। আমাদের কেউ ডিসটার্ব করবে না।"

"ইস, কত শখ। এই শুভ্র, তোমাকে ন্যাড়া মাথায় কেমন দেখতে লাগছে গো?"

"কঙ্কণা তো বলল, ঠিক চৈতন্যদেবের মতো সুন্দর।"

"কঙ্কণা কি তোমার ধারে কাছে আছে?"

কঙ্কণা আসেইনি। ধারে কাছে থাকবে কী করে? কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কী আর করা যাবে। বললাম, "না। পিসিমার সঙ্গে বসে কথাটথা বলছে বোধহয়।"

"তোমার পিসিমা আমার কথা জানে গো?"

আদৌ পিসিমা রিঙ্কির কথা জানে না। তবুও বললাম,

ভাল মতো জানে। ইনফ্যাক্ট একটু আগেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।"

"কী বললে?"

"বললাম, একটু বেলার দিকে লোকজন কমলে, তবে আসবে।"

"ছি ছি, এ কথা তুমি বলতে পারলে? আমার সম্পর্কে তোমার পিসিমা কী ভাবল বলো তো?"

"কী আর ভাববে? বখাটে মেয়ে।"

"আমি বখে গেছি? তার মানে?" রিঙ্কির গলায় ঈষৎ উষ্মা।

"মানে বোঝার কী আছে? বিয়ের আগেই তো তোমার সব এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। বলো তোমাকে আমি চুমু খাইনি?"

"কী হচ্ছে কী শুভ্র?"

"বলো, তোমার বুকে আমি মাথা দিইনি?"

"এবার কিন্তু ফোনটা ছেড়ে দেব, বলছি।"

"তোমার নাভিতে মুখ ঘষিনি?"

"তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, শুভ্র। ফোন কেউ ট্যাপ করবে। সব শুনে ফেলবে। তখন তোমারই প্রেস্টিজ যাবে। আমার কী?

"তা হলে আগে বলো, কখন আসছ? না হলে আমরা আরও কী করেছি, সব বলতে শুরু করব।"

"ছিঃ, তুমি এত অসভ্য হয়ে গেছ ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"কখন আসছ তা হলে?"

"বাবা বাড়ি থেকে না বেরলে যেতে পারছি না। মায়ের কাছে শুনলাম, বাবা একটু পরে মিনিস্টার কাকুর কাছে যাবে। তখন বেরিয়ে পড়ব। এখন ছাড়ছি।" বলেই রিঙ্কি লাইনটা কেটে দিল।

boiRboi.net

মোবাইলটা অফ করে হাসতে হাসতে আমি গেটের দিকে এগোলাম। রিঙ্কি প্রায়ই ওর মিনিস্টার কাকুর গল্প আমার কাছে করে। সুশান্ত ঘোষ। আগে পুরমন্ত্রী ছিলেন। এবার নির্বাচনের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছেন। রিঙ্কির আপন কাকু নন। বাবার বন্ধু। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ় বলে আমার মনে হয়। কেননা, সুসান্ত ঘোষ স্বাস্থ্য দফতর পাওয়ার পরই বাঁকুড়া থেকে রিঙ্কির বাবাকে বদলি করে আর জি কর হসপিটালে নিয়ে এসেছেন। এবং এইভাবে তিনি আমাকে বাঁশটি দিয়েছেন।

হোস্টেলে থাকতে রিঙ্কি যখন তখন বেরিয়ে আসতে পারত। এখন পারে না। ওকে কঙ্কণার সাহায্য নিতে হয়। এখন শুনছি, রোজ গলফ গ্রিন থেকে সেই উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া যেতে রিঙ্কির বাবার নাকি কষ্ট হয়। সেজন্য মিনিস্টারকাকু ওর বাবাকে অন্য কোনও দফতরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। রিঙ্কিদের সল্ট লেকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। যদি যায়, তা হলে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধই হয়ে যাবে।

"শুভ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

নামটা শুনে ঘুরে তাকালাম। পরনে সাদা হাফহাতা শার্ট, ধুতি। জেলার কোনও এজেন্ট হবেন। বললাম, "আপনি?"

"আপনাদের বহরমপুরের এজেন্ট সুনীল ভকত। জরুরি দরকার। আলাদা কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে?"

সুনীল ভকত নামটা চট করে মনে পড়ে গেল। দাদুর ব্রিফকেসে একটা চিঠিতে এই ভদ্রলোকের নাম দেখেছিলাম। কামাখ্যাবাবুর বিরুদ্ধে ইনিই তা হলে কমপ্লেনটা করেছিলেন? হয়তো কামাখ্যাবাবু সম্পর্কেই আলাদা করে উনি কিছু বলতে চান আমাকে। তাই আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, "আসুন আমার সঙ্গে। দাদু তো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই বহরমপুরে যাচ্ছিলেন, তাই না?"

সুনীল ভকত নিচু গলায় বললেন, "না, ঠিক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নয়। উনি আসলে যাচ্ছিলেন লালবাগ বলে একটা জায়গায়। সে ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অ্যাদ্দুর ছুটে এসেছি।"

তার মানে সুনীল ভকত দাদুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আসেননি। ভদ্রলোকের মুখ চোখ দেখে আমার মোটেই ভাল লাগল না। উনি আমার পিছু পিছু আসছেন। কেবলই আমার মনে হতে লাগল উনি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমার ঘরে ঢুকে তারপর বললাম, "এবার বলুন তো, কী বলার জন্য এসেছেন?"

"একটা খুব খারাপ খবর।" বলেই সুনীল ভকত আমাকে শোনাতে লাগলেন। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নামতে লাগল। পিসিমা তা হলে ঠিকই বলেছিল, বিপদ কখনও একা আসে না।

চার

বছর খানেক আগে দাদু আমাদের বরানগরের ফ্যাক্টরিতে স্যালাইন ওয়াটারের একটা ইউনিট চালু করেছিল। আমি জানি, প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে। আমাদের সেই স্যালাইন সরকারের বেশ কয়েকটা হাসপাতালে পাঠানো হত। মাস খানেক আগে বহরমপুর জেনারেল হাসপাতালে লালবাগ থেকে আসা কোনও এক পেশেন্টকে নাকি যখন সেই স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল, তখন তার রাইগার মরটিস হয়। ডাক্তারদের ধারণা, পেশেন্ট মারা যায় স্যালাইনের দোষে। তার আত্মীয়রা হাসপাতাল ভাঙচুর করলে ডাক্তাররা সে কথা ফাঁস করে দেয়। পেশেন্টের ভাই লালবাগের এক পার্টির হোমরা চোমরা। সে বহরমপুরে এসে সুনীল ভকতকে

ধরে। সাফ জানিয়ে দেয়, ক্ষতিপূরণ না দিলে মামলা করবে। দাদু লালবাগে যাচ্ছিল পেশেন্টের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে।

ব্রিফসেসে দাদু কেন এক লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, এবার সেটা বুঝতে পারলাম। মাই গড, লোকটা যদি মামলা করে, তা হলে আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের বারোটা বেজে যাবে। খবরটা কাগজে বেরুবে। টিভিতেও দেখাতে পারে। সব থেকে বড় কথা, দাদুকে তো আর পুলিশ পাবে না, আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। আমাদের দেশে একটা অদ্ভুত আইন আছে। ওষুধ তৈরি করার দায়িত্বে যারা, অর্থাৎ কিনা কেমিস্ট... আইনের চোখে তারা দোষী নন। দোষী কোম্পানির লাইসেন্স যাঁর নামে, তিনি। আমাদের তৈরি স্যালাইনেই পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে, এটা যদি প্রমাণিত হয় তা হলে তো কথাই নেই। ড্রাগ কন্ট্রোল আমাদের লাইসেন্সই বাতিল করে দেবে।

এখন যিনি ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর, সেই অরণি সাহা দাদুর বিশেষ পরিচিত। দাদু বছর তিনেক ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিল। নানা কারণে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে দাদুকে যাতায়াত করতে হত। দাদুর সঙ্গে হৃদ্যতা টের পেয়েছিলাম, ভদ্রলোককে যেদিন আমি শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে গেছিলাম। ভদ্রলোক কিন্তু এখনও আসেননি। এই না-আসাটা সন্দেহজনক। আরও একটা ব্যাপার, আমাদের মতো আর কয়েকটা কোম্পানি স্যালাইন তৈরি করে। ওরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওরা যদি খবরটা পেয়ে যায়, তা হলে আমাদের ক্ষতি করার সুযোগটা ছাড়বে না।

কয়েক মুহূর্তে মাথার মধ্যে এ সব কথা খেলে গেল। সুনীল ভকত আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভদ্রলোক যে নার্ভাস প্রকৃতির, তা বোঝাই যাচ্ছে। কেবলই হাত

কচলাচ্ছেন। বললাম, "এখন কী করা যায়, বলুন তো?"

"আপনি যদি একবার লালবাগে গিয়ে সনৎ মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলেন, তা হলে খুব ভাল হয়।"

"কে সনৎ মণ্ডল?"

"পেশেন্টের সেই ভাই। লোকটা ক্রিমিনাল টাইপের। শুনেছি স্মাগলিংয়ের সঙ্গেও নাকি যুক্ত।"

"এই ব্যাপারটা আমাদের অফিসের আর কেউ জানে?"

"আমি কাউকে বলিনি। তবে মিঃ মিত্র কাউকে বলেছেন কি না, আমার জানা নেই।"

"আমাকে বলুন তো, সত্যিই কী আমাদের স্যালাইনের দোষে পেশেন্টের রাইগার হয়ে ছিল?"

"আমার তো ধারণা তাই। মনে হয়, অগস্টের প্রথম দিকে যে প্রোডাকশনটা হয়েছে, তাতে গণ্ডগোল ছিল। ওই ব্যাচেরই একটা বটল আমি নিজে টেস্ট করিয়েছি। তাতে শুধু জল পাওয়া গেছে।"

"ওই ব্যাচের মাল আর কোথায় গেছে?"

"নর্থ বেঙ্গলের চারটে শহরে। মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিং। এই ঘটনাটা জানতে পারার পর আমি ওই চারটে শহরের এজেন্টদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। তারা সব মাল উইথড্র করে নিয়েছে।"

"অন্য কোথাও রাইগারের ঘটনা ঘটেনি?"

"শুনেছি, জলপাইগুড়িতে নাকি একজন এফেক্টেড হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের দিকের মানুষ। তাই ডাক্তাররা চেপে গেছেন।"

"আপনার সঙ্গে সনৎ মণ্ডলের শেষ কবে দেখা হয়েছে?"

"কালই আমার কাছে এসেছিল। খুব হম্বিতম্বি করে গেল। আপনি খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন শুভ্রবাবু। আমি টেনশনে আছি।"

"লোকটাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারেন?"

pathagar.net

"একবার বলে দেখতে পারি। তবে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। ওদিককার লোকজন কলকাতাকে ভয়ই করে। আপনার পক্ষে কি লালবাগ যাওয়া সম্ভব না?"

"যেতে হলে যাব। কিন্তু তিন-চার দিনের আগে না। এ দিকটা একটু সামলে না নিয়ে আমার পক্ষে বেরনো সম্ভব না। আপনি যে করেই হোক ভুলিয়ে ভালিয়ে লোকটাকে একবার আমার সামনে এনে দাঁড় করান। তার পর ব্যাপারটা আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি। আর অত নার্ভাস হওয়ার কারণ নেই সুনীলবাবু। আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। পার্টি লেবেলে আমারও কিছু জানাশোনা আছে। যান, খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিন।"

মনের মধ্যে বিরাট একটা ঝড় বইছে। তবুও সেটা প্রকাশ হতে দেওয়া ঠিক না। সুনীল ভকতের সঙ্গে এমনভাবে বাইরে বেরিয়ে এলাম, যেন কিছুই হয়নি। আমাকে শক্ত থাকতেই হবে। কেননা আমি এখন একটা বিরাট পরিবারের মাথা। খাওয়ার একটা ব্যাচ সদ্য উঠেছে। আর এক দল বসতে যাচ্ছে। আমাকে দেখে কামাখ্যাবাবু বললেন, "কোথায় ছিলে শুভ্র?"

মাথার উপর একটা খাঁড়া ঝুলছে। আধ ঘণ্টা আগে হলে এই লোকটার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করতাম। এইভাবে প্রশ্ন করাটা অবশ্যই পছন্দ করতাম না। কিন্তু কাল না হয় পরশু যদি কোনও কারণে স্যালাইন কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ পেয়ে যায়, তা হলে এই লোকটাই আমাকে আরও বিপদে ফেলতে পারে। কে বলতে পারে, আমাদের রাইভাল কোনও কোম্পানির কাছ থেকে পয়সা পেয়ে কামাখ্যাবাবুই এই দুষ্কর্মটা করেছেন কি না? তবে যতটা শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে, এটা কারও একার কাজ নয়। সাবোতাজ হলে এর পিছনে তিন-চারজন জড়িত।

ইচ্ছে করেই কামাখ্যাবাবুকে বললাম, "বহরমপুরের

সুনীলবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। কী ব্যাপার বলুন তো?"

ভেবেছিলাম, সুনীল ভকতের কথা শুনে কামাখ্যাবাবু একটু দমে যাবেন। কিন্তু আমার উত্তরটা শুনে উনি মন্তব্য করলেন, "শয়তানটা কোনও গল্প ফাঁদছিল বুঝি?" বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে ফের বললেন, "মিঃ সাহা অনেকক্ষণ এসেছেন। তোমার জন্য বসে আছেন।"

মিঃ সাহা মানে অরণি সাহা। ড্রাগ কন্ট্রোলার। তা হলে উনি এসেছেন? কোথায় যেন একটা আশার আলো। তার মানে বহরমপুরের স্যালাইন কেলেঙ্কারি এখনও ওর কানে পৌঁছয়নি। তাড়াতাড়ি বললাম, "উনি কোথায়?"

ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখেছি, তুমি গিয়ে কথা বলো ওঁর সঙ্গে।"

তাড়াতাড়ি ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি অরণিবাবুর সঙ্গে ওঁর স্ত্রীও এসেছেন। পিসিমা কথা বলছেন দু'জনের সঙ্গে। কাছে গিয়ে বললাম, "সরি মিঃ সাহা, আমি এইমাত্র শুনলাম, আপনি এসেছেন।"

অরণিবাবু বললেন, "সরি বলার কী আছে। কাজের বাড়ি। ব্যস্ত থাকতেই পারেন। এতক্ষণ আপনার পিসিমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। এই বলছিলাম, শিবপ্রসাদবাবুর মৃত্যুটা খুব শকিং। অ্যাক্সিডেন্টের দু'দিন আগেই উনি আমার কাছে এসেছিলেন। তখন খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল ওকে। কী যেন বলবেন বলছিলেন। কিন্তু সেদিন আমি মিটিংয়ে এমন ব্যস্ত, উনি অনেকক্ষণ বসে থেকে, পরে আসব, বলে উঠে গেলেন।"

pathagar.net

আন্দাজ করতে পারছি, দাদু সেদিন কী পরামর্শ নিতে গেছিলেন। পাছে পিসিমার সামনে কোনও কথা ওঠে, সেজন্য তাড়াতাড়ি আমি বললাম, "দাদুর মুখে কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন উনি। আমি সাত-আট বছর

ড্রাগ কন্ট্রোলের দায়িত্বে ছিলাম, ম্যানুফ্যাকচারার্সদের অনেককেই তো দেখলাম। শিবপ্রসাদবাবুর মতো লোক খুব কমই দেখেছি।"

'দায়িত্বে ছিলাম' এ কথা খট করে কানে এসে বাঁধল। এর মানে কী? উনি কি এখন আর দায়িত্বে নেই? প্রশ্নটা করতেই অরণিবাবু বললেন, "না ভাই। কালই বদলির অর্ডার পেয়েছি। হেলথ মিনিস্টার তাঁর পছন্দের একজনকে ড্রাগ কন্ট্রোলার পদে নিয়ে এলেন। আমাকে বাঁকুড়ায় চলে যেতে হচ্ছে।"

আর একটা খারাপ খবর। শুনেই মনটা আরও ভারী হয়ে গেল। বললাম, "নতুন যিনি আসছেন, তিনি কেমন?"

"ঠিক জানি না। শুনেছি, ডাক্তারি পড়াতেন। টেকনিক্যাল লোক না। কী করে উনি চালাবেন বুঝতে পারছি না। সরকারি অফিস তো। মিনিস্টারের ইচ্ছেই আইন। আমার অবশ্য কিছু যায় আসে না। রিটায়ারমেন্টের আর মাস তিনেক বাকি। কিন্তু আমাদের অফিসাররা মারাত্মক খেপে আছেন। বাইরে থেকে লোক এনে বসানো, এটা একটা ব্যাড একজাম্পল হয়ে রইল। ওরা তো বলছেন, কোর্টে যাবেন।"

অরণিবাবু সাদা মনে কথা বলে যাচ্ছেন। ক্ষোভ চাপা থাকছে না। সেটা লক্ষ করে ওঁর স্ত্রী বললেন, "তুমি ফের অফিসের কথা বলতে শুরু করেছ?" তার পরই প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য উনি পিসিমাকে বললেন, "চলুন, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বসি। আমার হ্যাজব্যান্ড এইরকমই। অফিস ছাড়া ওর মুখে কোনও কথা নেই।"

পিসিমার সঙ্গে অরণিবাবুর স্ত্রী উঠে যাওয়ার পর বললাম, "আপনি থাকলে আমার খুব সুবিধে হত মিঃ সাহা। অন্তত গাইডেন্সটা পেতাম।"

"তা পেতেন। একটা কথা আগে ভাগেই আপনাকে জানিয়ে রাখি শুভ্রবাবু। মিনিস্টার কেন নতুন ড্রাগ কন্ট্রোলার নিয়ে এলেন জানেন? পার্টি ফান্ডে টাকা তোলার জন্য। যেটা

pathagar.net

আমাকে দিয়ে সম্ভব হত না। টাকাটা চাইব কী মুখে বলুন তো? এমনিতেই আমাদের রাজ্যে ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার্সদের ইউনিটগুলো ছোট। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কমপিট করতে পারছে না। অনেক কোম্পানি তো উঠেই গেল। তার পর যদি পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হয়, তা হলে তো আপনাদের মতো ম্যানুফ্যাকচারার্সরাই মারা পড়বে। এখন কী হবে জানেন? যারা টাকা দেবে, তারাই সুযোগ-সুবিধা পাবে।"

"যারা দেবে না?"

"তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে। সোজা অঙ্ক। ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং ঝকমারির কাজ বুঝলেন শুভ্রবাবু। নানারকম জটিল আইন-কানুন। ইচ্ছে করলে আপনাদের অনেক খুঁত আমরা ধরতে পারি। কিন্তু চোখ বুজে থাকি। বেশি কড়াকড়ি করতে গেলে কোম্পানিগুলো উঠে যাবে। এই যেমন, আপনাদের ফ্যাক্টরির কথাই ধরুন। স্যালাইন ইউনিটে লাল টেস্ট করানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। শিবপ্রসাদবাবুকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু আজ করব, কাল করব— বলে উনি এখনও করেননি। আপনি কিন্তু ঝুলিয়ে রাখবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থাটা করবেন। আপনাদের স্যালাইনে কোনও দোষ ত্রুটি ধরা পড়লে, আপনি কিন্তু গাড্ডায় পড়ে যাবেন।"

কথাটা শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠল। নাঃ, আর হাওয়ায় ভেসে বেড়ালে চলবে না। মাথার উপর বড় একটা খাঁড়া ঝুলছে। আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। বললাম, "লাল টেস্ট করার এক্সপার্ট লোক কোথায় পাওয়া যাবে, জানেন?"

"ঠিক বলতে পারব না। আপনাদের কামাখ্যাবাবু জানেন। স্যালাইন ইউনিটের হোল ইনস্টলেশন ওরই সুপারভিশনে করা। খুব যোগ্য লোক।"

শুনে মনে মনে হাসলাম। আমি যে কী ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছি, তা যদি অরণিবাবু জানতেন! হঠাৎই একটা কথা মাথায় খেলে গেল। কামাখ্যাবাবুকে তো আর ক'দিন পর আমি তাড়িয়ে দেব। অরণিবাবুকে আমাদের কোম্পানিতে নিয়ে এলে কেমন হয়? ভদ্রলোকের প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেটা তা হলে কাজে লাগানো যাবে। বললাম, "রিটায়ার করার পর আপনি কী করবেন, মিঃ সাহা?"

"এখনও কিছু ভাবিনি। আমার একটাই মাত্র ছেলে। সে এখন আমেরিকায়। তাই আর কোনও পিছুটান আমার নেই। তবে আমি কাজ পাগল মানুষ। চিন্তা করতেই ভয় হয়, বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব কী করে?"

"আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করবেন?"

উত্তরে অরণিবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কামাখ্যাবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলেন। সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক। দু'জনেই বয়স্ক। ষাটের উপর হবেন। তাঁদের দেখিয়ে কামাখ্যাবাবু আমাকে বললেন, "শুভ্র, এসো তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই। ইন ফিউচার এঁদের সঙ্গে প্রায়ই তোমার দেখা হবে। ইনি হলেন পশুপতি চ্যাটার্জি। আমাদের ডি এম এ, মানে অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। গেরাল্ড ইন্ডিয়া-র মালিক। আর..."

কামাখ্যাবাবু কিছু বলার আগেই অন্য ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আমি মহাবীর প্রসাদ। থার্ডসন কোম্পানির। আমি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি।"

স্পষ্ট দেখলাম, দু'জনকে দেখে অরণিবাবুর মুখটা তেতো হয়ে গেল। ওষুধ কোম্পানির মালিকদের মধ্যে কাউকেই আমি চিনি না। কামাখ্যাবাবু যাঁদের নেমন্তন্ন করতে বলেছিলেন, তাঁদেরই আমি শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠিয়েছিলাম। পঁচিশ-তিরিশ জনকে তো বটেই। তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন এসেছেন। বোঝাই যায়, ওষুধ কোম্পানির মালিকদের মধ্যে

সম্পর্কটা কেমন। তবুও নমস্কার করে বললাম, "আসুন, বসুন।"

সোফায় বসে পশুপতিবাবু বললেন, "তুমি আমার ছেলের বয়সী। তোমাকে আপনি টাপনি করতে পারব না। আমার শরীর ভাল নেই। তবুও এলাম, তোমাকে কয়েকটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে।"

মহাবীরবাবু স্পষ্টতই বিরক্ত। বললেন, "আরে মশাই, ওকে আগে কনডোলেন্সের কথাটা বলুন।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, শিবপ্রসাদবাবু মারা যাওয়ার পর দিনই আমরা একটা কনডোলেন্স মিটিং করেছিলাম। সেখানে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। সেটাই তোমাকে জানাবার জন্য এসেছি।"

বললাম, "বলুন।"

"ইউনিভার্সিটির বি ফার্মা ডিপার্টমেন্টের টপারকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা গোল্ড মেডেল দেব ঠিক করেছি। এবং সেটা শিবপ্রসাদবাবুর নামে। প্রায় পঞ্চাশ বছর উনি আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলেন। ভাবা যায়?"

মহাবীরবাবু এবারও সন্তুষ্ট নন। বললেন, "প্রস্তাবটা যে আমিই দিয়েছিলাম, সেটা তো বললেন না?"

"সেটা বলার দরকার আছে?"

"আলবাত দরকার আছে। আপনার মশাই বদ দোষ, অনেক কিছু চেপে যান।"

অরণিবাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, "আপনাদের স্বভাব আর বদলাল না। একই রকম রয়ে গেলেন।"

মহাবীরবাবু বাঁকা ভাবে বললেন, "আপনার নাকি ছুটি হয়ে গেছে শুনলাম?"

"হ্যাঁ, বলতে পারেন, বাঁচলাম। আপনাদের হাত থেকে।"

"আমরাও বাঁচলাম। অনেক হেনস্থা করেছেন আমাদের।

এবার আর ভুল করছি না মশাই। চেয়ারে বসার আগেই হাত করে ফেলেছি নতুন ডিরেক্টরকে। এখন থেকে আমরাই চালাব ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস।"

মহাবীরবাবু কথা বলছেন, ঝগড়া করার ভঙ্গিতে। বোঝাই যাচ্ছে, ওঁর বা পশুপতিরবাবুর সঙ্গে অরণিবাবুর সম্পর্কটা মোটেই ভাল না। অল্প পরিচয়েই আমার মনে হল, এই দু'জন দলবাজিতে অভ্যস্ত। তার মানে আমার সঙ্গে বনবে না। লোক দুটোকে খুব বেশি পাত্তা দিয়ে লাভ নেই। অরণিবাবু অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুভ্রবাবু, আমি উঠি তা হলে। আমাকে আবার একবার মধ্যমগ্রাম যেতে হবে। আমি হয়তো সামনের সপ্তাহে বাঁকুড়ায় চলে যাব। এর মধ্যে দরকার হলে বাড়িতে যোগাযোগ করবেন।"

কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে অরণিবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পরই পশুপতিবাবু বললেন, "শোনো ভাই শুভ্র, তোমাকে আগে ভাগে সাবধান করে দিই, কানাই কুণ্ডু যদি তোমার কাছে আসে, তা হলে এন্টারটেন কোরো না।"

"কে কানাই কুণ্ডু?"

"নাম শোনোনি? পিকক ফার্মাসিউটিক্যালসের মালিক। খতরনাক লোক। তোমার দাদুর বিরুদ্ধে একবার ইলেকশন লড়েছিল। তোমার দাদু একদমই পছন্দ করতেন না কানাইকে। এই যে অরণি সাহা... কম সুবিধা দিয়েছে ওকে? কানাইয়ের গ্রুপ অ্যাসোসিয়েশনে। তোমাকেও কিন্তু এরা দলে টানার চেষ্টা করবে।"

মহাবীরবাবু বললেন, "আমাদের গ্রুপে থাকো, কোনও প্রবলেম হবে না। মিনিস্টারের সঙ্গে অলরেডি আমাদের একটা সিক্রেট মিটিং হয়ে গেছে। আমাদের গ্রুপটাকেই উনি ব্যাক করতে চান।"

আমার মাথার উপর এমন একটা বিপদ। কোনও পক্ষকে চটিয়ে আমার লাভ নেই। তাই বললাম, "আমাকে কী করতে

pathagar.net

হবে বলুন?"

"এখন কিছু করতে হবে না। টাইম টু টাইম আমরাই যোগাযোগ রেখে যাব। আমরা উঠি। সারাদিন নিশ্চয়ই ধকল গেছে। যাও ভাই, তুমি বিশ্রাম নাও।"

কথাগুলো বলেই ওরা দু'জনে উঠে পড়লেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উফ, এই সব লোকের সঙ্গে আমাকে চলাফেরা করতে হবে? সম্ভব না। আগে স্যালাইন কেলেঙ্কারি থেকে উদ্ধার পাই। তার পর এঁদের মাপা যাবে। আমি যে কত খতরনাক ছেলে, এঁদের কোনও আন্দাজ নেই। ওদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেকদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেলাম। আর দু'এক বছরের মধ্যেই অ্যাসোসিয়েশন আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তখন এই বুড়ো ভামদের লাথি মেরে হঠাতে হবে।

বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই চলে গেছেন। প্যান্ডেলের এক কোণে দেখি, মনা। আমার দিকে চোখ পড়তেই ও বলল, "শুভ্রদা, দ্বারভাঙা যাওয়ার জন্য সে দিন আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। অনেক টাকা বেঁচে গেছে। এই নিন বাকি টাকা।"

পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে মনা আমার দিকে এগিয়ে দিল। ওর সততা দেখে আমার খুব ভাল লাগল। ইচ্ছে করলে হিসেবটাও নাও দিতে পারত। গীতামাসিরই তো ছেলে। সৎ হওয়াটাই স্বাভাবিক, গীতামাসি এতদিন আমাদের সংসার চালাচ্ছে। একটা পয়সাও কোনও দিন এদিক ওদিক করেনি। বললাম, "টাকাটা এখন তোর কাছেই রেখে দে। পরে নেওয়া যাবে। তুই খেয়েছিস?"

"এইমাত্র। মা জোর করে খাইয়ে দিল। পিসিমা আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনি নাকি সারাদিন কোনও কিছু মুখে দেননি?"

খাওয়ার **ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। তবুও** বললাম,

"এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসতে পারবি?"

"কেন পারব না? আপনি বসুন, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।"

মনা ক্যাটারারদের ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর ফট করে একটা কথা আমার মনে হল। সুনীল ভকত একটা সমস্যার কথা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু সেটা কত বড় সমস্যা আগে যাচাই করা দরকার। এতক্ষণ মাথাটা কাজ করছিল না। এবার আমি আমার মতো করে সব কিছু ভাবতে লাগলাম। ভয় পেলে চলবে না। কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাও ঠিক হবে না। স্যালাইন কেলেঙ্কারি আমার অ্যাসিড টেস্ট। আগে সব কিছু জানতে হবে। এই সনৎ মণ্ডল লোকটাকে আমার চাই। লোকটাকে বাগে আনতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

শরবতের গ্লাস নিয়ে মনা ফিরে আসার পরই আমি বললাম, "এই, আজ রাতে একটা জায়গায় তুই যেতে পারবি?"

মনা এক পায়ে খাড়া। বলল, "কোথায় যেতে হবে শুভ্রদা?"

"লালবাগ। নাম শুনেছিস?"

"হ্যাঁ, লালগোলা লাইনে। আমার পিসির বাড়ি।"

"ওখানে কখনও গেছিস?"

"চার-পাঁচবার।"

"তা হলে আয় আমার সঙ্গে। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি।"

pathagar.net

পাঁচ

আজ এম ডি-র চেয়ারে বসেই টের পেলাম, দাদুকে কত দিক সামলাতে হত। সকাল থেকে তিন দফা মিটিংয়ের পর আমি হাসফাঁস করতে লাগলাম। অফিস থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ইচ্ছেটা আমি জোর করে দমালাম। দাদুর পি এ

ভদ্রমহিলার নাম মিসেস সুলোচনা ব্যানার্জি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুঝে গেলাম, উনি খুব চটপটে। পর পর সব কাজ ঠিক করে রাখেন। ঠিক সময়েই বাইরের লোককে তুলে দেন। মিসেস ব্যানার্জিকে আমার ভাল লেগে গেল।

বেলা একটার সময় মিসেস ব্যানার্জি এসে বললেন, "স্যার আপনার লাঞ্চ? এখানে করবেন, না বাইরে কোথাও সেরে আসবেন?"

সকালে টোস্ট আর ওমলেট করে দিয়েছিল গীতামাসি। তাড়াতাড়ি তাই মুখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। লাঞ্চের কথা শুনে হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল। বেলা দশটার সময় কোনও কোনওদিন দাদুকে লাঞ্চ করেই অফিসে বেরতে দেখেছি। দাদু দুপুরে খেত কি না, সে সম্পর্কে আমার কোনও আইডিয়া নেই। বললাম, "এখানে কি লাঞ্চের কোনও ব্যবস্থা আছে?"

"এখানে একটা ক্যান্টিন আছে। তবে সে খাবার আপনি খেতে পারবেন না।"

"কেন?"

"আপনাদের উপযুক্ত না। পার মিল মাত্র পনেরো টাকায়।"

"ক্যান্টিন কে চালায়, তাকে একবার ডাকুন তো।"

"কেন স্যার?"

"বলছি ডাকুন। প্রশ্ন করবেন না।"

মিসেস ব্যানার্জি একটু থতমত খেয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। গত দেড় বছর ধরে অফিসে যাতায়াত করছি, এখানে ক্যান্টিন আছে জানতামই না। এই সুযোগ, এমপ্লয়িদের মন জয় করার। প্রথম দিন আমাকে একটা কিছু করতে হবে। যাতে সবার আস্থা আসে, আমার উপর। মিল পিছু দশ টাকা করে বাড়িয়ে দিলে কোম্পানির খরচ মাসে নয় সাড়ে নয় হাজার টাকা। বাড়তি খরচ এমন কিছুই না। তা হলে এমপ্লয়িরা খাবারটা ভাল পাবে। আমি জানি, বাঙালি এই

pathagar.net

অল্পেতেই খুশি। এক টুকরো বাড়তি মাছ পাতে পেলে ধন্য ধন্য করবে।

দরজা খুলে এই সময় ভেতরে ঢুকে এলেন কামাখ্যাবাবু। হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার। টেবলের উপর রেখে বললেন, "শুভ্র, আমার মিসেস তোমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। খেয়ে নাও।"

শুনেই আমার গা পিত্তি জ্বলে গেল। আবার আত্মীয়তা পাতানোর চেষ্টা? যে লোকটা কোম্পানির ক্ষতি করছে, তাকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারব না। কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী অবশ্য কাল দাদুর শ্রাদ্ধের সময় সারাক্ষণই পিসিমার পাশে বসেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, খুবই সাধারণ ঘরের মহিলা। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর উপর বিরক্তিতে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি ভালভাবে কথাও বলিনি। কামাখ্যাবাবু প্লেটের খোঁজ করছেন দেখে বললাম, "আমি আজ অন্যদের সঙ্গে ক্যান্টিনে খাব। প্লিজ, টিফিন কেরিয়ার থেকে কিছু বের করবেন না।"

কথাটা শুনেই কামাখ্যাবাবুর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খুব বিনয়ের সঙ্গে উনি বললেন, "তোমার দাদু আর আমি রোজ একই সঙ্গে লাঞ্চ করতাম। বহু দিনের অভ্যেস তো। ঠিক আছে বাবা, তা হলে থাক।"

টিফিন কেরিয়ারটা গুছিয়ে নিয়ে উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখে একটু খারাপই লাগল। ভদ্রলোককে এ ভাবে না বললেও পারতাম। কিন্তু আমার বদভ্যাস। যাবে কোথায়? যাকে পছন্দ হয় না, সহ্যই করতে পারি না। উঠে গিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমে ভাল করে চোখ-মুখে জল দিলাম। না, মেজাজটা যখন তখন খারাপ করা উচিত হচ্ছে না। তা হলে ব্যবসা চালাতে পারব না।

বাথরুম থেকে ঘরে ঢুকে দেখি, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "স্যার, আমি দিকপতি, ক্যাটারার। ডেকেছিলেন?"

বললাম, "বসুন। আজ কী খাবার আছে?"

"ভাত, ডাল, পোনা মাছ আর সবজি।"

"আমার জন্য একটা মিল পাঠিয়ে দিতে পারেন?"

"স্যার, আপনি এ খাবার খেতে পারবেন?"

"আমার এমপ্লয়িরা যদি পারে, তা হলে আমি পারব না কেন?"

"স্যার ওদের অভ্যেস আছে।"

"শুনুন, কোম্পানি থেকে যদি মিল পিছু আপনাকে দশ টাকা ভরতুকি দিই, তা হলে ওদের আর কী দিতে পারবেন?"

"পঁচিশ টাকায় ভাল লাঞ্চ হয়ে যাবে স্যার।"

"কাল থেকে সে ব্যবস্থা করবেন। আর হ্যাঁ, লাঞ্চ নিয়ে কোনও কমপ্লেন আমার কাছে এলে, পর দিনই কিন্তু আপনাকে আমি বের করে দেব।"

"না স্যার, কোনও কমপ্লেন পাবেন না।"

"যান, একটা মিল পাঠিয়ে দিন। দেখি, আপনি কী রকম ক্যাটারার।"

দিকপতি বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে মনে হাসলাম। খবরটা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সারা ফ্যাক্টরিতে ছড়িয়ে যাবে। কী প্রতিক্রিয়া হল, সেটা জানতে পারব রবিনবাবুর মুখে। সকাল বেলায় রবিনবাবু একবার আমাকে বলেছিলেন, "ইউনিয়নের লোকদের একবার ডেকে আজই কথা বলবেন। ওদের পাণ্ডা রন্টু সেন। ওকে যদি কনফিডেন্সে নিতে পারেন তা হলে অসুবিধা হবে না।" ভেবেই রেখেছি, বিকেল চারটের সময় ছেলেটাকে একবার ডাকব। তার আগে ইচ্ছে করেই একটা চমক দিয়ে রাখলাম। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, আমি মালিক। আমার ইচ্ছেমতো আমি তোমাদের দেব। তোমাদের দাবি অনুযায়ী নয়।

সকালের দিকে এসে প্রথম মিটিংটাই আমি করেছি স্যালাইন ইউনিটের সুপারভাইজার পলাশ সরকারের সঙ্গে।

আমারই বয়সী। আমাদের এখানে আসার আগে ও চাকরি করত দাগা ল্যাবরেটরিসে। পলাশকে ডাকার আসল উদ্দেশ্য সত্যিই সালাইন ইউনিট থেকে ডিফেক্ট মাল বেরিয়েছিল কি না, তা জানা। এ কথা সে কথার পর দুম করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পলাশ, আমার কাছে একটা কমপ্লেন এসেছে, অগস্ট মাসের ব্যাচ থেকে কিছু ডিফেক্ট মাল মার্কেটে বেরিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?"

"ডিফেক্ট মাল? না, আমি তো কিছু শুনিনি। আমি জয়েন করেছি অক্টোবর মাসে। তার আগে কী হয়েছে স্যার, আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।"

"আপনার আগে কে সুপারভাইজার ছিলেন?"

"দীপ্তেশ নন্দী। এখন গেরাল্ড ইন্ডিয়ায় আছেন।"

তার মানে পশুপতিবাবুর কোম্পানিতে। শুনেই আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। "উনি আমাদের কোম্পানি ছেড়েছিলেন কেন, কিছু শুনেছেন?"

"না। কামাখ্যাবাবু বলতে পারবেন। শুনেছি এখানে স্যালাইন ইউনিট হওয়ার সময় ওকে কামাখ্যাবাবু নিয়ে এসেছিলেন ফিফথসন থেকে। কিন্তু একটা খটকা লাগছে স্যার। যদি সত্যিই আমাদের কোম্পানি থেকে ডিফেক্ট মাল বেরত, তা হলে ড্রাগ কন্ট্রোল আমাদের ছেড়ে দিত না স্যার।"

"অরণিবাবু... মানে ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর... আমাকে বলছিলেন, আমাদের স্যালাইন ইউনিটে নাকি লাল টেস্টের ব্যবস্থা নেই।"

"উনি ঠিকই বলেছেন।"

"একটা ভাল লোক দেখুন তো, যে লাল টেস্ট করতে পারে।"

"কলকাতায় এক্সপার্ট লোকেরই তো অভাব স্যার। কিন্তু একটা জিনিস বুঝছি না। আমাদের এখানে তো পাইরোজেন টেস্টের ব্যবস্থা আছে। সেটা অনেক ফুল প্রুফ।"

pathagar.net

"সেটা জানি। কিন্তু গভর্নমেন্টের ইনস্ট্রাকশন। কী করবেন বলুন।"

কয়েকদিন আগেই একটা মেডিকেল জার্নালে এ ব্যাপারে একটা লেখা পড়েছি। সে জন্যই সরকারি নোটিশটার কথা জানি। গোলমালটা পাকিয়েছেন পশুপ্রেমিকরা। সারা বিশ্ব জুড়ে। পাইরোজেন টেস্টটা করতে হয় র‍্যাবিট...মানে খরগোসের উপর। একটা সময় পশুপ্রেমিকরা প্রোটেস্ট শুরু করলেন। এ সব টেস্ট করতে গিয়ে প্রাণীহত্যা চলবে না। তখন গভর্নমেন্ট পাইরোজেন টেস্টের বিকল্প লাল টেস্ট বাধ্যতামূলক করে দিল। আমাদের মতো ছোট কোম্পানির বাঁশ।

"একটা কথা জানতে উচ্ছে করছে স্যার, আমাদের স্যালাইনের বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা ঠিক কী? স্যালাইনে ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া গেছে, নাকি স্টেরিলাইজ করা ছিল না?"

"জানি না। এখনও রিপোর্টটা হাতে পাইনি।"

"কমপ্লেনটা কে করেছে?"

"বহরমপুর হসপিটালের ডাক্তাররা।"

"তা হলে কগনিজেন্স দেওয়ার কোনও দরকার নেই। আমি সিওর স্যার, আমাদের মাল জাল করে ওখানে চালানো হচ্ছে।"

"সেটা সম্ভব?"

"বর্ডারিং এরিয়া তো। সবই ওখানে সম্ভব। আপনি পুলিশে কমপ্লেন করুন। অথবা ডিস্ট্রিক্ট ড্রাগ কন্ট্রোলে। না হলে খবরের কাগজ মারফত জানিয়ে দিন, কেউ আমাদের স্যালাইন জাল করে বাজারে চালাচ্ছে। লোকে যেন যাচাই করে কেনে।"

"এই মালটা কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টের কাছে বিক্রি করেছিলাম।"

"তাই নাকি?" পলাশ যেন একটু চিন্তিত। দু'তিন সেকেন্ড

পর ও ফের বলেছিলেন, "তবুও, আপনি পুলিশকে জানান।"

"আমাদের রাইভাল কোনও কোম্পানি ইনভলভ বলে মনে হয়? হয়তো আমাদের বেইজ্জত করার চেষ্টায় আছে।"

"আমার মনে হয়, না। তবুও, ব্যাপারটা আপনি হালকাভাবে নেবেন না স্যার। এই সব প্রোডাক্টের সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করে। একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেলে স্যার আমরা মারাত্মক ঝামেলায় পড়ে যাব।"

পলাশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে সকালে মনে হয়েছিল, ওর আশঙ্কা সত্যি হলেও হতে পারে। হয়তো আমাদের স্যালাইন কোথাও জাল হচ্ছে। কথাটা মনে হতেই মনার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাল রাতেই ও লালবাগ চলে গেছে। আমার ধারণা, আজ রাতে বা কাল সকালেই ও একটা ফোন করবে। ফোন করার কথা ওকে বারবার বলে দিয়েছি! কী খবর আনবে কে জানে? আমাদের কোম্পানির লিগাল অ্যাডভাইসার হলেন অ্যাডভোকেট বিশ্বরূপ মজুমদার। স্যালাইন কেলেংকারির ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একবার বসতে হবে আমাকে। ভদ্রলোক কয়েকদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। কিছু কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছেন। দাদুর সব আইনগত ঝামেলা উনিই এতদিন সামলেছেন। কোম্পানির সব কিছু ওঁর নখদর্পণে।

ক্যান্টিনের দিকপতি এসে আমার সামনে লাঞ্চ সাজিয়ে দিল। এত খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। ডাল-ভাত মুখে দিয়ে দেখলাম, খুব খারাপ না। কলকাতায় যখন থাকি, বাড়িতে তখন আমার ভরসা গীতা মাসি। ভাল রান্না করে। কিন্তু রোজই অনুযোগ শুনতে হয়, "তোমাদের জন্য রান্না করে কী লাভ? দাদু আর নাতি কেউই তো খেতে পারো না। রোজই আমাকে একগাদা খাবার বাড়ি নিয়ে যেতে হয়।" আমি আর দাদু কোনওদিন এক সঙ্গে খেতে বসলে আড়ালে হাসতাম। দাদু মজা করে বলত, "নিজের বাড়ির রান্নাটাও

গীতা এখানেই সেরে নেয়, বুঝলি।"

খাওয়ার ফাঁকেই ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে মিসেস ব্যানার্জি, "স্যার, কে একজন রিঙ্কি বাসু আপনাকে চাইছেন। দেব?"

রিঙ্কির নামটা শুনেই বুকের রক্ত চলকে উঠল। কাল ওর আমাদের বাড়িতে আসার কথা ছিল। আসেনি। না এসে ভালই করেছে। সুনীল ভকতের কাছ থেকে স্যালাইন সম্পর্কিত খবরটা শোনার পর খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ রিঙ্কি এখানে কেন ফোন করল? ইচ্ছে করলে তো মোবাইলেই করতে পারত। না, ল্যান্ড লাইনে রিঙ্কির সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না। মুখ দিয়ে কখন কী বেরিয়ে যাবে, কে জানে। এটা অফিস। তাই বললাম, "বলুন, এখন আমি ব্যস্ত। পরে যেন মোবাইলে ফোন করে।"

"ওকে স্যার। আর একটা কথা। রবিনবাবু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন। যেতে বলব?"

"পাঠিয়ে দিন।"

একটু পরেই রবিনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে বললেন, "কাল একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমাদের কিন্তু একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।"

কী ভুলের কথা বলছেন আবার রবিনবাবু? মুখ তুলে তাকালাম। ভদ্রলোক সেলস-এর দিকটা দেখাশুনো করেন। কোম্পানির রোজগার ওঁর হাতে। দাদুর মুখে শুনেছি, খুব বিশ্বস্ত। তাই রিটায়ার করে যাওয়ার পরেও রবিনবাবুকে দাদু ছাড়েনি। গত কয়েকটা দিন কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখছি। ধীরস্থির। ভেবে চিন্তে কথা বলেন। কামাখ্যাবাবুর মতো গায়ে পড়া নন।

"আমাদের কিন্তু অনিল মজুমদারকে নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল।"

কে অনিল মজুমদার চিনতে পারলাম না। বললাম, "কার

কথা বলছেন?"

"ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস। একটা সময় উনি আমাদের প্রচুর বিজনেস দিয়েছেন। মানে... সরকারের কাছে আমরা যত ওষুধ বিক্রি করেছি, সবই ওই ভদ্রলোকের সাহায্যে। একটু আগে উনি ফোন করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাল শ্রাদ্ধে এলেন না কেন? উনি ঠাট্টা করেই বললেন, নাকি নেমন্তন্নের কার্ডই পাননি।"

"আপনি দেখুন তো, কারণটা কী?"

"নেমন্তন্নের লিস্টটা তৈরি করেছিলেন কামাখ্যাবাবু।"

দপ করে রাগ হয়ে গেল। বললাম, "ওঁকে একবার ডাকুন তো?"

"উনি একটু আগে বাড়ি চলে গেলেন। শরীর খারাপ। যাক গে, আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। অনিল মজুমদারের সঙ্গে রোজ আমাকেই যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। আমি একটু বেরোব। আপনাকে তাই বলতে এলাম।"

"ফিরবেন কখন?"

"একবার কিড স্ট্রিটে যাব। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ল্যাবরেটরিতে। একটা নতুন ব্র্যান্ড আমরা ড্রাগ কন্ট্রোলকে দিয়েছিলাম। ওরা ওখানে পাঠিয়েছে। সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে যাব। এ সব আমিই দেখাশুনো করি। কখন ফিরতে পারব, জানি না। কেন আমাকে কোনও দরকার আছে?"

"ইউনিয়নের রন্টু আমার কাছে আসতে চায়। কথা বলার সময় আপনি থাকলে ভাল হত।"

"তা হলে এখনই ডেকে পাঠান। আমি না হয় পরেই ল্যাবরেটরিতে যাব।"

"ছেলেটাকে ডাকুন তা হলে।"

রবিনবাবু ফোনেই রন্টুকে ডেকে নিলেন। বয়স তিরিশের কোঠায়। ছেলেটাকে এর আগে ফ্যাক্টরির এদিক ওদিক

দেখেছি। বামপন্থী রাজনীতি করে বলে শুনেছি। ঘরে ঢুকে ও বলল, "ক্যান্টিনের খবরটা শুনলাম। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

বললাম, "বসুন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন কেন?"

"রামকি-র ব্যাপারে কী করলেন, অনেকেই সেটা জানতে চাইছে।"

" কী করা উচিত বলুন তো?"

"কামাখ্যাবাবুকে তো আমরা বলেই দিয়েছি। ওর স্ত্রীকে কমপেনসেশন দেওয়া উচিত। উনি আপনাকে কিছু বলেননি?"

"বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাদের কাছ থেকে আমার কিছু জানার আছে। রামকি-র ডেডবডিটা সেদিন কারা দাহ করতে নিয়ে গেছিল সে সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"যতদূর মনে পড়ছে, ও আড়িয়াদহের দিকে যেখানে থাকত, সেখানকার প্রতিবেশীরাই। হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন স্যার?"

"আপনারা কেউ তাদের চেনেন?"

"আমি চিনি না। আমাদের সিক্স সেভেন থ্রি নাইন টেম্পোর ড্রাইভার লখিয়া চেনে।"

" রামকির যে স্ত্রী আছে, সে কথাটা কে আপনাদের বলেছে?"

"আমরা লখিয়ার মুখে শুনেছি।"

"আর শুনেই আপনারা বিশ্বাস করে নিলেন!"

রন্টুর চোখ মুখে বিস্ময় ফুটে বেরচ্ছে। দেখে মনে মনে আমি হাসলাম। রন্টু বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলতে চাইছেন।"

"এখন বুঝতে পারবেন না। যান, আগে ভাল করে খোঁজ নিন। আপনাদের মুখের কথায় আমি কমপেনসেশন দিতে

pathagar.net

পারব না। লখিয়াকে ভাল করে ধরুন। মনে হয়, আপনাদের মিসলিড করেছে।"

"ঠিক আছে স্যার, খোঁজ নিচ্ছি।"

"আর কিছু বলার আছে?"

"স্যার, ফ্যাক্টরির টয়লেটগুলো খুব খারাপ অবস্থায় আছে। একটু ভাল করা যায়? আর একটা লেডিস টয়লেট স্যার। আমাদের নেই।"

শুনে আমি রবিনবাবুকে বললাম, "টয়লেটগুলো ঠিকঠাক করে দিন। আপনি দায়িত্ব নিয়ে এ কাজটা করবেন। আমি দেখতে চাই, সাত দিনের মধ্যে যেন টয়লেটগুলো ঝকঝকে তকতকে হয়ে ওঠে।"

রন্টু এতটা আশা করেনি। বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনি আমাদের দেখুন, আমরাও কোম্পানির জন্য জান দিয়ে দেব।"

এই সুযোগ। বললাম, "এই স্পিরিটটাই আমি আপনাদের মধ্যে দেখতে চাই। কয়েক দিনের মধ্যে আমার কিছু ইন্সট্রাকশন আপনারা পেয়ে যাবেন। এতদিন আমার দাদু যে ভাবে কোম্পানি চালিয়েছেন, আমি সে ভাবে চালাতে চাই না। আমি কর্পোরেট কালচার আনতে চাই। না হলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আমি কমপিট করতে পারব না। আপনার মেম্বারদের আমার এই কথাগুলো বুঝিয়ে বলবেন। আমি আপনার সাহায্য চাই।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"তা হলে এ বার আসুন। পরে ফের কথা হবে।"

রন্টু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই রবিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "রামকির ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

বিশ্বাস করে রবিনবাবুকে কথাটা বলে দেওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারলাম না। আগে আমাকে জানতে হবে, ক্ষতিপূরণের টাকাটা কে মারতে চেয়েছিল। আমার সন্দেহ কামাখ্যাবাবু। কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ চাই। তাই বললাম,

pathagar.net

"দেখুন না, ওরা কী খবর নিয়ে আসে।"

রবিনবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই মোবাইল সেটটার দিকে নজর পড়ল। এই রে, সুইচ অফ করা। সকালে পলাশের সঙ্গে মিটিং করার সময় অফ করে রেখেছিলাম। তাই বোধহয় রিঙ্কি আমাকে মোবাইলে পায়নি। ল্যান্ড লাইনে কথা বলতে চেয়েছিল। একটু আগে রন্টুর সঙ্গে কথা বলার জন্যও মোবাইলের সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম। সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে রিং হতে লাগল। ও প্রান্তে ভারিক্কি গলা, "শুভ্রশঙ্খ মিত্র বলছেন?"

"বলছি। কে বলছেন?"

"নমস্কার। আমি পার্ক স্ট্রিট থানার অফিসার ইনচার্জ বলছি। আপনি কি এখুনি একবার থানায় আসতে পারবেন?"

থানায়? অবাক হয়ে বললাম, "কেন বলুন তো?"

"রিঙ্কি বাসু বলে কাউকে আপনি চেনেন?

"হ্যাঁ। উনি আমার বান্ধবী।"

"শপলিফটিং করতে গিয়ে উনি আজ ধরা পড়ে গেছেন। ক্যামাক স্ট্রিটে একটা নামকরা দোকানে। এখন উনি থানায়। আপনার মোবাইল নাম্বারটা উনিই আমায় দিলেন। আপনি একবার থানায় আসুন।"

রিঙ্কি শপলিফটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছে? ভাবতেই পারছি না। আমি দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

pathagar.net

ছয়

রিঙ্কি যে ক্লেপটোম্যানিয়াক, ভাবতেই পারিনি। পার্ক স্ট্রিট থানায় পৌঁছে আমার খুব অস্বস্তি শুরু হল। জীবনে এর আগে মাত্র একদিনই থানায় ঢুকেছি। দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাওয়ার পর দিন। সেই কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায়।

কিন্তু সেই থানার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিট থানার অনেক তফাত। থানায় ঢোকামাত্রই অঞ্জনের সঙ্গে দেখা। কলেজে ও আমার সঙ্গে পড়ত। আমাকে দেখে বলল, "কী রে তুই এখানে?"

অঞ্জনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হয় স্বপ্নময়ের। ওকে সত্যি কথাটা বললে একদিন না একদিন তা স্বপ্নময়ের কানে পৌঁছে যাবে। রিঙ্কিকে যদি স্বপ্নময় না চিনত, তা হলে আমার কিছু আসত-যেত না। কী কুক্ষণেই যে ওকে রিঙ্কি সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে নানা কথা বলেছিলাম! অঞ্জনকে এড়ানোর জন্য বললাম, "আমার দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। সে-ব্যাপারে এসেছি। তুই?"

অঞ্জন বলল, "আর বলিস না। ক্যামাক স্ট্রিটে গাড়িটা রেখে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলাম। বেরিয়ে দেখি, গাড়ি নেই।"

"চুরি গেছে?"

"হ্যাঁ। ভর দুপুরে। ভাবতে পারিস, শালা কোন রাজত্বে বাস করছি? দূর দূর, এতদিন বাঙ্গালোরে বেশ ভাল ছিলাম।"

এর পরই অঞ্জন নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে শুরু করবে। এটা ওর বদভ্যাস। কেটে পড়া দরকার। তাই বললাম, "একদিন আমার বাড়িতে আয়। কথা বলা যাবে।" বলেই আমি ও সি-র ঘরের দিকে এগোলাম।

ভিজিটিং কার্ডটা ও সি-র ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ডেকে নিলেন। ঘরে ঢুকে দেখি, রিঙ্কি চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে রবার্ট লুডলামের উপন্যাস পড়ছে। আমাকে দেখেই হি হি করে হেসে উঠল। ওই অবস্থায় থানায় বসে কেউ হাসতে পারে, না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। হাসির কারণ প্রথমে আমি বুঝলাম না। পরে মনে হল, ও আমার নেড়া মাথা দেখে হাসছে। হাসি থামিয়ে তার পর রিঙ্কি বলল, "কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে দেখতে শুভ্র। চলো, তোমার বাড়ি যাই।"

ও সি বললেন, "আজকে মনে হয় আপনার আর বাড়ি

যাওয়া হবে না মিস বাসু। কাল কোর্ট থেকে বেল নিয়ে তার পর বাড়ি যাবেন?"

শুনেই বুকটা ধক করে উঠল। বললাম, "এগজাক্টলি কী হয়েছে, বলবেন?"

"সেটা আপনার বান্ধবীকেই না হয় জিজ্ঞেস করুন।"

আমি রিঙ্কির দিকে তাকাতেই ও বলল, "কিচ্ছু হয়নি গো শুভ্র। আমি শ্রীরাম আর্কেডের একটা কসমেটিক্সের দোকানে গিয়েছিলাম আজ। ভুল করে কয়েকটা নেলপলিশ হ্যান্ডব্যাগের ভেতর পুরে ফেলেছিলাম। সেটা নিয়েই এঁরা হইচই করছেন। নেল পলিশগুলো তো আমি ফেরত দিতে গেছিলাম।"

ও সি ধমকে উঠলেন, "একদম ন্যাকামি করবেন না। আপনি যা করছেন, সেটা চুরির চেষ্টা। বেলা বারোটা নাগাদ আপনি ওই দোকানে গেছিলেন। র‍্যাভলন নেলপলিশের একটা সেট পছন্দ করার ফাঁকে সেটা ব্যাগের ভেতর পুরে ফেলেন। এক একটার দাম হাজার টাকা। সেট-এ বারোটা ছিল। ওই সব দোকানে যে ভিডিয়ো মনিটরিং হয়, তা আপনি জানতেন না। ফলে গেট দিয়ে বেরবার সময় ধরা পড়ে যান। আমরা কমপ্লেনটা পাই বেলা একটা নাগাদ। শপ ওনার অবশ্য আপনাকে বলেছিলেন দাম মিটিয়ে দিলে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আপনি বলেন, অত টাকা আপনার কাছে নেই।"

আমি বললাম, "শপ ওনারের সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে?"

"দাঁড়ান, তা হলে ফোনে ধরার চেষ্টা করি।"

ও সি ভদ্রলোক ফোনে ডায়াল করার সময় একবার রিঙ্কির দিকে তাকালাম। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। হ্যান্ডব্যাগটা কোলের সামনে রাখা। ওর বুকের দিকে চোখ যেতেই সারা শরীর শিরশির করে উঠল। কতদিন ওই বুকে মুখ ঘষিনি। হ্যাঁ, মাস তিনেক তো হবেই। আমি

boiRboi.net

ভুবনেশ্বর যাওয়ার আগে ডায়মন্ডহারবারের এক রিসর্টে ওর সঙ্গে সারাটা দিন কাটিয়েছিলাম। রিঙ্কি ও সি-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা কী নিষ্পাপ। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে ওর সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া যায়। সুন্দরী মেয়েদের এই এক সুবিধে।

ও সি শপ ওনারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার খারাপই লাগছে। ভদ্রলোক কমপ্লেন তুলে না নিলে কেলেংকারির একশেষ হবে। রিঙ্কির বাড়িতে জানতে পারলে ওর বাবা ওকে বের করে দেবেন। ভদ্রলোককে আমি কোনওদিন দেখিনি। শুনেছি, খুব রাশভারী টাইপের। ওর বাবা যেদিন বদলি হয়ে কলকাতায় এলেন, সেদিন রিঙ্কি আমায় বলেছিল "আমার স্ফূর্তির দিন শেষ। এতদিন হোস্টেলে ছিলাম, ভাল ছিলাম।" মাকে রিঙ্কি একদম পরোয়া করে না। ওর মাও মনে হয়, বাবার দাপটে সবসময় সিঁটিয়ে থাকেন। ওর বাবাকে একবার দেখার খুব ইচ্ছে আমার। এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে আমার টক্কর দিতে ভাল লাগে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ও সি বললেন, "আপনারা একটু বসুন। শপ ওনার থানায় আসছেন।"

আমার কার্ডটা ও সি-র ডান হাতে ধরাই রয়েছে। সেদিকে চোখ রেখে ভদ্রলোক বললেন, "আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের এম ডি আপনি? আরে, এতক্ষণ আমি লক্ষই করিনি। আমার এক মেসোমশাই আপনাদের ওখানকার এক্সিকিউটিভ। বহু বছর আছেন ওখানে।"

"কে বলুন তো?"

"কামাখ্যা মুখার্জি। খুব সৎ মানুষ। ব্রড মাইন্ডেড। ওঁর স্ত্রী... মানে আমারমাসির তো তুলনা নেই।"

সারাটা দিন কামাখ্যাবাবুর উপর চটে ছিলাম। কী ধরনের সৎ লোক উনি, আমি জানি। কিন্তু ও সি-কে সেটা বলা যাবে না। ভদ্রলোকের মুখে কামাখ্যাবাবুর নামটা শুনে একটু ভরসা

pathagar.net

েলাম। পুলিশে চেনাজানা না থাকলে মুশকিল। তাই সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, সত্যিই উনি খুব সজ্জন ব্যক্তি।"

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। বয়সে আপনি আমার থেকে অনেক ছোটই হবেন শুভ্রবাবু। আপনার এই বান্ধবীকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। প্রায়ই এ ধরনের কেস আমাদের কাছে আসছে। ধনী, শিক্ষিত ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাই আজকাল বেশি শপ লিফটিং করছে। কী যে হল সমাজটার, জানি না। মিস বাসু ওঁর বাবার পরিচয় আমাদের দেননি। উনি কী করেন, জানতে পারি?"

"সরকারি অফিসার। স্বাস্থ্য দফতরে আছেন।"

"দেখুন, কী অবস্থা! যাক গে, আপনার সঙ্গে যখন একটা পরিচয় বেরিয়েই গেল, তখন আর বসিয়ে রাখব না। শপ ওনার ভদ্রলোক এলে আমি কমপ্লেন তুলে নিতে বলব।"

"উনি যদি কমপ্লেন না তোলেন?"

"তুলবেন, তুলবেন। আমাদের ভরসায় এঁরা এখানে ব্যবসা করেন। আমার কথা না শুনলে পরে খুব মুশকিলে পড়বেন। যান, নিশ্চিন্তে আপনার বান্ধবীকে নিয়ে চলে যান। মিস বাসু আজ খুব বেঁচে গেলেন। ওকে বলবেন, জীবনে যেন আর কোনওদিন এই ভুল না করেন।"

গাড়িটা পার্ক হোটেলে রেখে, পার্ক স্ট্রিট থানায় গিয়েছিলাম। বাইরে ফুটপাথে নামতেই রিঙ্কি বলল, "আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। চলো না, চাইনিজ খাই।"

রিঙ্কি আমার পাশাপাশি হাঁটছে। আমার বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরেছে। হাঁটার ছন্দে আমি ওর স্তনের স্পর্শ পাচ্ছি। বিকেল পাঁচটা বাজে। অফিস টাইম। চেনাজানা অনেকেই দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু রিঙ্কির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে ঘণ্টা তিনেক ও থানায় বসেছিল, একটা বিপদের মধ্যে পড়েছিল, সে-সম্পর্কেও ওর কোনও বিকার নেই। মুখটা গম্ভীর করে পার্ক হোটেলে ঢুকলাম। প্রায়ই তন্ত্র ডিস্কোতে

আসি। হোটেলের গেটম্যানরা অনেকেই চেনা। সেলাম ঢুকে কাচের দরজাটা খুলে দিল।

পার্ক হোটেলে রিঙ্কিকে নিয়ে কোনওদিন আসিনি। দোতলায় রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসতেই রিঙ্কি বলল, "তোমাকে তো এখানে সবাই চেনে দেখছি। গেটম্যান থেকে বেয়ারা— সবাই। তুমি কি প্রায়ই এখানে আসো?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছ না কেন গো?"

"তুমি আজ যা করেছ, তাতে তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব কি না বুঝতে পারছি না।"

"এই রাগ কোরো না প্লিজ। কাল ইউনিভার্সিটিতে জয়া এই দোকানটা থেকে কয়েকটা নেলপলিশ কিনে নিয়ে গেছিল। সেগুলো দেখে আমার খুব লোভ হল। ভাবলাম, আমিও কিনব। কিন্তু দোকানে কিনতে এসে দেখি এত দাম..."

"পুলিশ তোমার বাবাকে খবর দিলে কী হত রিঙ্কি?"

"আমাকে আর বাড়ি ঢুকতে দিত না। ভালই হত, আমি তা হলে তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠতাম। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তাড়িয়ে দিতে না।"

"সামান্য একটা জিনিস। কেন চুরি করতে গেলে? আমাকে বললেই তো পারতে। তোমাকে প্রেজেন্ট করতাম।"

"সত্যি কথা বলব? বাবার উপর রাগে। সকালে বাবার কাছে টাকা চাইলাম। দিল না। তুমি জানো না, আমার বাবার কত টাকা। কিন্তু একটা বাড়তি টাকাও আমার জন্য খরচ করবে না। তুমি আমাদের ফ্যামিলির কথা জানো না। জানলে, বলতে আমি যা করেছি, ঠিক। থানায় ও সি যখন আমাকে বাবার নাম জিজ্ঞেস করছিল, তখন একবার ভাবলাম, নামটা বলে বাবার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিই। কিন্তু মায়ের মুখটা মনে পড়তেই চুপ করে গেলাম। আমার জন্য মা তা হলে ইনসালটেড হত।"

"কাজটা তুমি আজ ভাল করোনি রিঙ্কি।"

"এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু ওই যে বললাম, বাবার উপর রাগে। বাবাটা আগে এমন ছিল না, জানো? সুশান্তকাকু মিনিস্টার হওয়ার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেল। মিনিস্টারকাকু বাবাকে কেন কলকাতায় নিয়ে এল, জানো? পার্টি ফান্ডে টাকা তোলার জন্য। আমি নিজের কানে শুনেছি। মিনিস্টারকাকু বাবাকে এমন জায়গায় পোস্টিং দেবে যেখান থেকে প্রচুর টাকা তোলা সম্ভব।"

রিঙ্কি সাজিয়ে গুজিয়ে মিথ্যে কথা বলে। ওর সব কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। তাই বললাম, "থাক, এ সব কথা আমার শোনা উচিত নয় রিঙ্কি।"

"না, আমাকে বলতে দাও। তুমি ছাড়া তো আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোমাকে আমার বলতেই হবে। আমি ঠিকই করে ফেলেছি, মডেলিং করব। একটা এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা পোর্টফোলিও করে দেবে। দেখি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না?"

"বলছ বটে, কিন্তু লাইনটা খুব টাফ।"

"চেষ্টা করে দেখি। না পারলে তুমি তো আছই। আর তুমিও যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও, তা হলে সুইসাইড করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় থাকবে না।"

রিঙ্কির দু'চোখ জলে টলটল করছে। ওর ওই চেহারাটা আমি আগে কখনও দেখিনি। এতদিন ওর উচ্ছল রূপটাই দেখেছি। হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ও চোখ মুছে তার পর বলল, "চলো, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"বাড়ি যাবে?"

"না, তোমার বাড়ি যাব।"

"চলো তা হলে।"

খাবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। উঠে যাওয়া যায় না। কিন্তু রিঙ্কির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওকে বসিয়ে

রাখা যাবে না। খাবারটা প্যাক করে নিয়ে পার্ক হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়িতে এই সময় পিসিমার থাকার কথা। আর গীতামাসির। পিসিমা অবশ্য সকালে একবার বলেছিল, বাড়ি চলে যেতে পারে। আমি মানা করেছিলাম। গত দুদিন আমাদের বাড়িতে থেকে পিসিমা হাঁফিয়ে উঠেছে। বারবার ছেলে আর ছেলের বউয়ের খবর নিয়েছে ফোনে। কাল শ্রাদ্ধের সময় টুবলু অবশ্য এসেছিল। বুড়ি ছোঁয়া করে চলে গেল। বলল, কী একটা খবরের জন্য ওকে লালগোলা যেতে হবে। কাগজের রিপোর্টার। সব সময়ই ওদের ব্যস্ততা।

পিসিমা বাড়িতে থাকলে রিঙ্কির কী পরিচয় দেব, ভাবতে লাগলাম। কী মনে করবে কে জানে? রিঙ্কিকে গীতামাসি চেনে। দু'একবার দেখেছে। ওকে নিয়ে সমস্যা নেই। বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে। কোনওদিন কোনও প্রশ্ন করেনি। লক্ষ করেছি, রিঙ্কি আর কঙ্কনা বাড়িতে এলে গীতামাসি, "একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি" বলে বেরিয়ে যায়।

গাড়িতে ওঠার পর থেকেই রিঙ্কি গম্ভীর। রাস্তার আলো মাঝে মাঝে মুখটা ছুঁয়ে যাচ্ছে। অপরাধবোধের কোনও ছাপ তাতে নেই। একটা শিক্ষিত অবস্থাপন্ন মেয়ে কী করে যে শপলিফটিং করতে পারে, আমার মাথাতেই এল না। কলেজের একটা মেয়ে নেলপলিশ কিনেছে বলে ওকেও কিনতে হবে? আর্থিক ক্ষমতা থাকুক বা না-থাকুক, এ তো একটা অদ্ভুত ধরনের রেষারেষি।

সেদিন কোথায় যেন পড়ছিলাম, সল্টলেকের এক বাড়িতে মধুচক্রে ধরা পড়ার পর কোনও এক কলেজের মেয়ে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, ভাল কসমেটিক্স আর শাড়ি কেনার টাকা জোগাড় করার জন্যই নাকি সে মধুচক্রে যেত। রিঙ্কির যা মানসিকতা, তাতে তো যে কোনওদিনই ও এ রকম বদ পাল্লায় পড়ে যেতে পারে। থানায় না এলে আমি জানতেও পারতাম না, ওর এই সব বদগুণ আছে।

pathagar.net

সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছে দেখি, পিসিমা নেই। গীতামাসি বলল, "এই একটু আগে চলে গেল। যাওয়ার আগে অফিসে তোমায় ফোন করেছিল।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবুও বললাম, "আটকে রাখতে পারলে না?"

"অত করে বললাম, শুনলই না।" আমার হাতে খাবারের প্যাকেট। গীতামাসির চোখ গেল। "ফ্রিজে এত খাবার, তুমি বাইরে থেকে আনতে গেলে কেন শুভ্র? দাও, আমাকে প্যাকেটটা দাও। কিচেনে রেখে দিই। পরে এসে গরম করে দেব।"

"না, তোমাকে আর আসতে হবে না। আমিই গরম করে নেব। আচ্ছা, মনা কি এখানে ফোনটোন কিছু করেছিল?"

"না তো।"

"আশ্চর্য! সারাটা দিন কেটে গেল, একটা ফোন করবে না?"

"করবে কোত্থেকে? আমার নন্দাইয়ের বাড়ি তো ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। ফোন করতে হলে ওকে সাইকেল ভ্যান করে স্টেশনের কাছে আসতে হবে।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

কথাটা বলেই রিঙ্কিকে নিয়ে উপরে উঠে এলাম। আগে নীচের ঘরে থাকতাম। দাদু মারা যাওয়ার পর ওপরের দক্ষিণ দিকের ঘরটায় চলে এসেছি। এই ঘরটায় আগে বাবা-মা থাকত। এর আগে কোনওদিন রিঙ্কিকে আমার বেডরুমে নিয়ে আসিনি। ঘরে ঢুকেই ও টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার পর হাই তুলে বলল, "খুব টায়ার্ড লাগছে গো। এই কয়েক দিন আগে ক্রিসমাস গেল। অথচ কী গরম, দ্যাখো।"

মাথার উপর ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে। তবুও শরীরে তাপ অনুভব করলাম রিঙ্কির শোয়ার ভঙ্গিটা দেখে। বুক থেকে

ওড়না সরে গেছে। গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা সালোয়ার কামিজ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওর কোমর আর তলপেটে কোনও মেদ নেই। পা দুটো টান টান করে দু'পাশে ছড়ানো। বুক থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একবার চোখ বোলাতেই সারা শরীর শিরশির করে উঠল। তবুও নিজেকে দমিয়ে রাখলাম। অনেক সময় আছে। তিন মাসের খিদে কয়েক মুহূর্তে মিটিয়ে ফেলা উচিত হবে না। বললাম, "তুমি রেস্ট নাও রিঙ্কি। আমি ততক্ষণে স্নান করে আসি।"

শুনে ঝট করে উঠে বসে রিঙ্কি বলল, "এই, আমারও স্নান করতে ইচ্ছে করছে গো।"

"তা হলে তুমি আগে যাও।"

"তোমার বাথরুমটা কোথায়?"

"এই তো অ্যাটাচড।" হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। তার পর বাথরুমের ভেতরে ঢুকে বললাম, "এসো, লেডিস ফার্স্ট।"

বাথরুমে ঢুকে রিঙ্কি বলে উঠল, "ওয়াও। লাভলি। এত সুন্দর বাথটব! সত্যি মনে মনে এতদিন আমি এই রকমই একটা বাথরুমের স্বপ্ন দেখতাম।" কথাটা বলেই রিঙ্কি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেল।

নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বাথরুমের দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে ওকে কাছে টেনে আনলাম। তার পর ওর ঠোঁট একবার চুষে নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "এই, একসঙ্গে স্নান করবে রিঙ্কি?"

ওই একটা চুমুতেই রিঙ্কির শরীর শিথিল হয়ে গেল। আমাকে আঁকড়ে ধরে বলল, "নট এ ব্যাড আইডিয়া। কিন্তু তোমার গীতামাসি?"

"ওকে নিয়ে ভেবো না। আমাদের ডিসটার্ব করবে না।"

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে রিঙ্কি সালোয়ারটা খুলে ফেলল। তার পর কামিজ। ওর পরনে শুধু টু পিস। দু' পা

pathagar.net

পিছনে গিয়ে মডেলদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রিঙ্কি বলল, "কেমন লাগছে গো আমাকে?"

"ওয়ান্ডারফুল।"

"বিপাশা বসুর মতো? না তার চেয়ে বেটার?"

বিপাশা বসুকে কোনওদিন এই পোশাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কী করে বলব, রিঙ্কি বেটার কি না? তবুও ওর মন রাখার জন্য বললাম, "ফার বেটার।"

পিছনে হাত দিয়ে এ বার ব্রা-টা খুলে ফেলল রিঙ্কি। ওর দুটো স্তন উন্মুক্ত। ওকে দাঁড়ানো অবস্থায় এ ভাবে কোনওদিন দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই মডেলিং করলে ওকে ফেলে দেওয়া যাবে না। ওই অবস্থায় ক্যাট ওয়াক করে রিঙ্কি আমার সামনে এল। মুখে রহস্যময় হাসি। কিছুক্ষণ আগে থানায় বসে থাকা মেয়েটার সঙ্গে এই রিঙ্কিকে আমি মেলাতে পারলাম না। অর্ধনগ্ন রিঙ্কি আরও বেশি সুন্দর। কেন যে মেয়েরা অর্থহীন সারা শরীরকে মোড়কে ঢেকে রাখে, বোঝা মুশকিল।

হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানার চেষ্টা করতেই রিঙ্কি দ্রুত পিছনে ঘুরে গেল। তার পর ওইভাবে ক্যাট ওয়াক করতে করতেই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। বাথটাবের উল্টোদিকে একটা বড় আয়না আছে। রিঙ্কির শরীরের দুদিকটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। হাঁটার সময় ওর নিতম্বটা দুলছিল। সেদিকে চোখ যেতেই আমি দ্রুত হাতে জামা আর ট্রাউজার্সটা খুলে ফেললাম। রিঙ্কির মুখে সেই হাসিটা এখনও লেগে আছে। চুম্বকের মতো আমাকে টানছে ওর দুটো ঠোঁট। উদগ্র কামনায় দু'পা এগিয়ে ওকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। তার পর চুমুতে চুমুতে ওর শরীর ভরিয়ে দিতে লাগলাম। দুজনেরই শরীরের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। ওর শীৎকার ধ্বনি আমাকে আরও উত্তেজিত করে তুলল।

দুজনের একসঙ্গে স্নান করার কথা। হাত বাড়িয়ে তাই

শাওয়ারটা আমি খুলে দিলাম। বৃষ্টির ধারার মতো জল নামতেই রিঙ্কি শিউরে উঠল। তার পর কেমন যেন গোঙানির মতো করে বলল, "আই লাভ ইউ শুভ্র।"

বললাম, "আই লাভ ইউ টু।"

আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে ওর দুটো স্তন। বুকের খাঁজে জল নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। এক টানে ওর শরীরের বাকি অংশটাকে নগ্ন করে দিলাম। তার পর ওকে আয়নার দিকে ঘুরিয়ে বললাম, "খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে রিঙ্কি।"

ওর বুকের উপর আমার হাত খেলা করছে। বাথরুমের জ্যোৎস্না রঙের আলোতে ওকে পরী বলে মনে হচ্ছে। শাওয়ারের জলে ওর সব অপরাধ যেন ধুয়ে গেল। অদ্ভুত এক পবিত্রতা এখন ওর স্নানস্নিগ্ধ মুখে। দেখলাম, আয়নায় নিজের দিকে একবার তাকিয়েই দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল রিঙ্কি। তারপর পুরো শরীর ঘুরিয়ে আমার বুকে মুখ রেখে বলল, "ইস, তোমার কাছে আমার কোনও কিছু আর লুকোনো রইল না গো।"

সাত

সাত সকালেই গীতামাসির গার্জেনগিরি শুরু হয়েছে। কিচেনে ঢুকে বকবক করছে। ড্রয়িং রুমে খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে আমি টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছি। "কাল অত করে বললাম, রাতে একবার এসে খাবার গরম করে দিই। আমার কথা শুনলই না। পুরো খাবার পিঁপড়েয় ধরেছে। বাড়িতে মেয়েছেলে না থাকলে এ রকমটাই হয়। আসুক পিসিমা। এ বার আমি বলবই।"

শুনে মনে মনে হাসলাম। গীতামাসি আমাকে কোলেপিঠে মানুষ রেছে। ছোটবেলায় দুধের গ্লাস নিয়ে আমার পিছনে

পিছনে ছুটত। এখনও সে চেষ্টা ছাড়েনি। অধ্যবসায়ের ঘাটতি নেই। ফের কাগজে খবরে মন দিলাম। আডবাণীর সঙ্গে বাজপেয়ীর ঝামেলা মিটে গেছে। বাজপেয়ীই দলের অবিসংবাদিত নেতা। এ খবরে আমার কোনও আগ্রহ নেই। চুলোয় যাক, বাজপেয়ী আর আডবাণী। কোথাও কোনও অসুখে অনেক লোক মারা গেল কি না, সেটাই আমার কাছে বড় খবর।

কথাটা আমাকে বলেছিল প্রথমে স্বপ্নময়। একদিন কাগজের প্রথম পাতায় খুন, ডাকাতি আর ধর্ষণের বড় বড় তিনটে খবর দেখে আমি বলেছিলাম, "সকালে ঘুম থেকে উঠে এ সব খবর পড়তে কার ইচ্ছে করে, বল তো?"

স্বপ্নময় বলেছিল, "আমার। আমাদের মতো অ্যাডভোকেটদের।"

"সতেরোটা শকুন মরলে তোদের মতো একটা অ্যাডভোকেট জন্মায়।"

"তুই যা ইচ্ছে বলতে পারিস আমার কিছু আসে যায় না। আরে শালা, খুন, ডাকাতি যদি ভ্যানিস হয়ে যায়, তা হলে আমাদের কী হবে ভেবেছিস? কোর্টে বসে তো আমরা তখন কলা চুষব। তাই মনে মনে চাই, যত বেশি অরাজকতা হবে, আমাদের তত বেশি মঙ্গল।"

নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের যত ক্যালাস ভাবতাম, তা হলে ততটা নয়! জাতে মাতাল, তালে ঠিক। শুধু বলেছিলাম, "চমৎকার।"

"কাগজে তোর পক্ষে সব থেকে ভাল খবর কী জানিস, শুভ্র? ভাইরাস, এপিডেমিক, ফ্লাড, পলিউশন, আর্থকোয়েক..."

"তার মানে?"

"আরে বোকা, এ সব যত হবে, তোর দাদুর ওষুধ তত বিক্রি হবে। এটা বুঝতে পারছিস না?"

pathagar.net

স্কুল লাইফ থেকে এই প্রথম সেদিন স্বপ্নময় বুদ্ধিতে আমাকে টেক্কা দিয়েছিল। ও চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম, ও যা বলল, তার সারমর্ম আছে। সত্যিই তো সবাই যদি সুস্থ থাকে, তা হলে আমাদের ওষুধ কিনবেটা কে? তার পর থেকে অজান্তেই আমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, কাগজে ওই ধরনের খবর খোঁজা। মাঝে সার্স নিয়ে মারাত্মক হইচই হয়ে গেল। তখন বেশ ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্স, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে দাঁড়াল।

কাগজটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চারের পাতার নীচের দিকে হঠাৎ একটা খবরে আমার চোখ আটকে গেল। লালগোলা সীমান্তে বাচ্চাদের একটা অদ্ভুত রোগ হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে দু'তিন ঘণ্টার জ্বরে অন্তত বাইশ জন বাচ্চা মারা গেছে। এই নতুন ধরনের ভাইরাসটা কী, তা পরীক্ষা করতে বহরমপুর থেকে একদল বিশেষজ্ঞ লালগোলা হাজির হয়েছে। খবরটা লিখেছে সত্যব্রত ঘোষ। নামটা দেখেই চমকে উঠলাম। আরে, এ তো আমাদের টুবলু। আমার পিসতুতো ভাই। ও তা হলে এই কাগজের রিপোর্টার? দাদুর শ্রাদ্ধের দিন টুবলু সাত তাড়াতাড়ি লালগোলার ট্রেন ধরতে ছুটেছিল। তার মানে... ও এখান থেকেই খবরটা পেয়েই দৌড়েছিল।

খবরটা পড়েই আমার মনে হল, ইস... এই ভাইরাসটা যদি সারা বাংলায় ছড়িয়ে যায়, তা হলে দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। লোকে ওষুধ কিনতে দৌড়বে। আমরা প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিতে পারব। কোম্পানির লাভ হবে। এক ঝলক রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই ভাবলাম, ছিঃ, এ সব আমি কী ভাবছি! বাচ্চারা দেশের ভবিষ্যৎ। ওদের মৃত্যু কামনা করা অন্যায়ই নয়, বড় অপরাধ। খবরটা আর একবার পড়ে দেখলাম, যে সব বাচ্চা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বয়স এক থেকে এগারো বছর পর্যন্ত। লালগোলার ঘরে ঘরে

কান্নার রোল পড়ে গেছে।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলাম। কিচেন থেকে গীতামাসির গলা আর শোনা যাচ্ছে না। তার মানে, যমুনা আর বোচান দু'জনেই এসে গেছে। গীতামাসি এখন ওদের উপর খবরদারি করতে ব্যস্ত। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। এই ফাঁকে স্নান সেরে নেওয়া দরকার। ব্রেকফাস্ট করে বেরোতে বেরোতে প্রায় দশটা হয়ে যাবে। গলফ গ্রিন থেকে বরানগর— কম দূরত্ব নয়। গাড়িতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। দাদু কেন যে গলফ গ্রিনে বাড়িটা করেছিল, কে জানে? ফ্যাক্টরির কাছাকাছিও তো করতে পারত। তা হলে রোজ এই যাতায়াতের হ্যাপা পোহাতে হত না।

বাথরুমে ঢুকতেই কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, রিঙ্কি আমাকে বলেছিল, 'আমার আর কোনও কিছুই তোমার কাছে গোপন রইল না' সেখানে এসে দাঁড়ালাম। আয়নায় ওর পুরো নগ্ন শরীরটা তখন দেখা যাচ্ছিল। চোখ বুজে রিঙ্কিকে ফের দেখার চেষ্টা করলাম। ওই কথাটা ওর মুখে শোনার পরই ফুল সাইজ একটা তোয়ালে দিয়ে ওর শরীরটা মুড়ে দিয়েছিলাম। তার পর পাঁজকোলা করে ওকে তুলে এনেছিলাম আমার বিছানায়। অনেকটাই সময় লেগেছিল ওকে পরিতৃপ্ত করতে। সম্ভোগের পর ক্লান্ত হয়ে যখন আমি শুয়ে পড়েছিলাম, তখন রিঙ্কি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, "আই লাভ ইউ শুভ্র।" এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার।

কথাগুলো মনে করতেই আমার ইন্দ্রিয়গুলো ফের জাগতে শুরু করল। সত্যি কথা বলতে কী, রিঙ্কি আমার জীবনে প্রথম মেয়ে নয়। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে আমার হাতে খড়ি লাভলি মারফত। গীতামাসির ভাইঝি। আমি কলেজে পড়ার সময় ও রোজই আমাদের বাড়িতে আসত। টুকটাক ফাইফরমাশ খাটত। পনেরো-ষোলো বছর বয়স। একটু আগে

pathagar.net

আগেই ওর শরীরে যৌবন এসে গেছিল। আঁটোসাটো ফ্রকে ওর ভারী দুটো স্তন আটকাতে চাইত না। ইংরাজিতে জীবন যৌবন মার্কা বইটই পড়ে, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট দেখে আমার তখন অদম্য কৌতূহল মেয়েদের শরীর নিয়ে।

লাভলি আমার টোপে পা দিয়েছিল। কখনও সখনও বাড়ি ফাঁকা পেলে ওর শরীর থেকে আমি সেই কৌতূহল মিটিয়ে নিতাম। প্রথমে আমার আগ্রহটাই ছিল বেশি। পরে লাভলিও সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। নানা ছুতোয় আমার কাছে ঘুরঘুর করত। আমি বাঙ্গালোর যাওয়ার কিছুদিন আগে হঠাৎ লাভলি আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। গীতামাসির মুখে শুনেছিলাম, ওর বিয়ের নাকি কথাবার্তা চলছে। আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়েছিল। পরে সেটাই দৃঢ় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়। সম্ভবত কোনও একদিন গীতামাসির চোখে আমরা ধরা পড়ে গেছিলাম।

আজ পর্যন্ত অনেক মেয়ের সঙ্গেই আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু রিঙ্কি তাদের সবার থেকে আলাদা। কাল রাতেই সেটা টের পেলাম। বাথরুমে স্নান করতে করতে মনে হল, এই মেয়েটাকে কি জীবন সঙ্গিনী করা যায়? এতদিন এ কথাটা ভাবিনি। একটা জেদের বশেই ওর সঙ্গে মেলামেশা করতাম। এতদিন বিশ্বাসই করতাম না, একটা মেয়ের শরীরের স্বাদ নিয়েছি বলেই আবেগবশত তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। কাল রাতে গলফ গ্রিনে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার সময়ই মনে হল, রিঙ্কি খুব অপরিণত। সারা জীবন ওকে বয়ে বেড়ানো খুব ঝুঁকির হয়ে যাবে। এখন অবশ্য মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করার সময় আমার নেই। সামনে অনেক বড় কাজ। মন প্রাণ ঢেলে কোম্পানিটাকে আরও বড় করতে হবে।

স্নান করার ফাঁকেই টের পেলাম, বাথরুমের দরজায় ধাক্কা

মেরে গীতামাসি কী যেন বলছে। শাওয়ারটা বন্ধ করে তোয়ালে জড়িয়ে, দরজাটা ফাঁক করে বললাম, "কী হল, ডাকছ কেন?"

"মনা ফোন করেছে লালবাগ থেকে।"

বললাম, "তুমি একটু কথা বলো। আমি বেরুচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি গা মুছে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনা ওখান থেকে আবার কী দুঃসংবাদ দেয় কে জানে? কর্ডলেসটা হাতে নিয়ে বললাম, "কী খবর, বল।"

"সনৎ মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলেছি। মহা তিকড়মবাজ লোক শুভ্রদা। বলে কি না, আগে তোমার মালিককে এখানে আসতে বলো।"

"লোকটাকে খুঁজে বের করলি কী করে?"

"আমার পিসতুতো ভাইরা সবাই ওকে চেনে। পার্টি করে যে।"

"সনৎ মণ্ডলের দাদা... মানে যে লোকটা মারা গেছে, তার ফ্যামিলির কেউ আছে?"

"আছে। বউ আর কুড়ি-একুশ বছরের একটা ছেলে। খুবই নিরীহ ধরনের।"

"তা হোক, ছেলেটা তো অ্যাডাল্ট। তাকে ধরে আনতে পারবি? ওর মায়ের কাছে গিয়ে বল, ছেলেকে আমাদের ফ্যাক্টরিতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। এই টোপটা দিয়ে দ্যাখ তো কী বলে।"

"ছেলেটা যদি রাজি হয়, তা হলে কি সঙ্গে নিয়ে যাব?"

"এক মুহূর্ত দেরি করবি না। আর হ্যাঁ, ওর বাবার ডেথ সার্টিফিকেটটাও যেন ও সঙ্গে নিয়ে আসে। হয়তো সনৎ মণ্ডলের কাছে সেটা থাকবে। কিন্তু ছেলেটা যেন কায়দা করে সেটা চেয়ে নেয়। আমার জানা দরকার লোকটার ডেথ সার্টিফিকেটে কী লেখা আছে। যা বললাম, তোর মাথায় সব ঢুকল?"

boiRboi.net

"হ্যাঁ শুভ্রদা। বুঝেছি।"

"তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করে কলকাতায় ফিরে আয়। সনৎ মণ্ডল যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।"

"ঠিক আছে, আমি এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে আপনাকে ফোন করে দেব।"

"গুড। ছেলেটাকে নিয়ে সোজা তোদের বাড়িতে তুলবি। ছাড়ছি রে।"

বলেই লাইনটা কেটে দিলাম। গীতামাসি তখনও দাঁড়িয়ে। আমাকে বলল, "মনা কবে আসবে কিছু বলল?"

মাথা ভাল করে মুছতে মুছতে বললাম, "না। আরও দু-একদিন লাগতে পারে। কেন গো?"

"ওর বাবার শরীরটা ভাল নেই। নৃপেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম। বলল, পেটে আলসার হয়েছে। অপারেশন করতে হবে।"

"কই, কাল রাতে আমাকে কিছু বললে না তো?"

"বলতাম। তোমার সঙ্গে রিঙ্কি ছিল। তাই ডিস্টার্ব করিনি। মনার বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলে কত টাকা লাগবে, সেটা বুঝতে পারছি না শুভ্র।"

বললাম, "চিন্তা করো না আমি তো আছি। তখন দেখা যাবে। এখন খুব তাড়াতাড়ি ব্রেক ফাস্টটা রেডি করো তো। এখুনি অফিসে বেরব।"

ড্রেস করার ফাঁকে হঠাৎই দাদুর একটা মনে পড়ে গেল। একবার কথায় কথায় দাদু বলেছিল, "বাড়ি থেকে যখন অফিসের দিকে বেরোবি, তখন থেকে অফিসের কথা ভাববি। তখন আর বাড়ির কথা ভাববি না। আবার অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরবি তখন অফিসের কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবি। মনকে এই ভাবে সুইচ অন, সুইচ অফ করতে না পারলে জীবনে কখনও শান্তি পাবি না।" দাদুর পরামর্শটা কি ঠিক? এই যে বাড়িতে মনার ফোন এল, স্যালাইন কেলেঙ্কারির কথা

pathagar.net

মাথায় ঢুকে গেল। যতক্ষণ না ছেলেটাকে নিয়ে মনা আসছে, একটা বিহিত করতে পারছি, ততক্ষণ ওই কথাগুলোই কেবল মাথায় ঘুরে বেড়াবে। শত চেষ্টা করলেও এখন আর রিঙ্কিকে নিয়ে ভাবতে পারব না।

বেঁচে থাকতে দাদু অনেক চেষ্টা করেছিল, যাতে আমরা এক সঙ্গে অফিসে বেরোই। রোজ চাইত, এক সঙ্গে আমি ব্রেক ফাস্ট করি। কিন্তু প্রায়ই কায়দা করে আমি এড়িয়ে যেতাম। আমার ইচ্ছে অনুযায়ী অফিস যেতাম। অফিস থেকে বেরিয়ে আসতাম। শেষে দাদুও কায়দা মারতে শুরু করল। আমাকে কোম্পানির কাজে বাইরে বাইরে পাঠাতে লাগল। আজ পটনা, কাল ইলাহাবাদ, পরশু ভুবনেশ্বর।

আমার মন্দ লাগত না। দশটা-পাঁচটা অফিস করতে হত না। আবার বাইরে গেলে মস্তিও মারা যেত। কিন্তু একবার আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুবোধ বাগচী আমার ট্যুর বিল আটকে দিলেন। প্রথমটায় মাথা গরম হলেও পরে বুঝলাম, বিল আটকানোর পিছনে দাদুর হাত ছিল। তখন থেকে একটু সমঝে চলা শুরু করলাম। সেই প্রথম বুঝলাম, আমার দাদু আর আমাদের কোম্পানির এম ডি— দু'জনে একই লোক হলেও আসলে এক নয়।

বেলা দশটা নাগাদ অফিসে পৌঁছতেই মিসেস ব্যানার্জি এসে বললেন, "কামাখ্যাবাবু দু'চার দিন আসতে পারবেন না স্যার! বাড়ি থেকে ওঁর স্ত্রী এই মাত্র ফোন করেছিলেন। উনি অসুস্থ।"

শুনে একটু বিরক্তই লাগল। আসলে অসুখ-বিসুখ কিছুই হয়নি। কামাখ্যাবাবু চালাক মানুষ। ঠিক বুঝতে পেরেছেন, আমি ওঁকে পছন্দ করছি না। কাল ওঁর বাড়ি থেকে আনা খাবার খেতে চাইনি। তাতে হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমিও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চাই, ওঁর মতো অসৎ লোকের আমার কোম্পানিতে কোনও স্থান নেই। বললাম, "কী হয়েছে ওঁর,

pathagar.net

জানেন?"

"না স্যার। সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই মিসেস মুখার্জি ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।"

কামাখ্যাবাবুকে যে আমি পছন্দ করছি না, সেটা মিসেস ব্যানার্জিকে জানিয়ে লাভ নেই। তাই বললাম, "আপনি একটু জেনে বলুন তো, ওঁর কী হয়েছে?"

"এখুনি জেনে নিচ্ছি স্যার।"

"তার আগে বলুন, আজকের সিডিউলে আমার কী কী আছে।"

"সাড়ে দশটায় একটা পার্টি পেমেন্ট নেওয়ার জন্য আসবে। আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়। এগারোটায় আপনার মিটিং ডেপুটি ডিরেক্টর ড্রাগ কন্ট্রোলের সঙ্গে। বেলা বারোটায় বহরমপুরের এজেন্ট মিঃ সুনীল ভকত আসবেন। উনি স্টেশন থেকে ফোন করেছিলেন। কী যে জরুরি দরকার আপনার সঙ্গে...।"

সনৎ মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা ছিল সুনীল ভকতের। হয়তো কাল রাতের ট্রেনে নিয়ে এসেছে। মনাকে পাঠিয়ে তা হলে আমার কোনও লাভ হল না। সকালে মনা বলল লোকটা মহা তিকড়মবাজ, কলকাতায় আসতে চাইছে না। মনা তো মিথ্যে কথা বলার ছেলে না? তা হলে কি সুনীল ভকতই আমার সঙ্গে ফাউল প্লে করছে? দ্রুত এ সব কথা মাথায় খেলে গেল আমার। নাহ্ লোকটাকে আজ বাজিয়ে নিতে হবে। আসুক আমার কাছে। মিসেস ব্যানার্জিকে বললাম, "ঠিক আছে। সুনীল ভকত এলেই, আমাকে একটা খবর দেবেন।"

"স্যার, সুবোধ বাগচী আপনার কাছে আসতে চান। কখন পাঠাব?"

"ওঁকেই আগে পাঠান।"

কাল সারা দিন সুবোধ বাগচী আমার ধারে কাছে

আসেননি। অথচ অফিসে ছিলেন। এই কোম্পানিতে আছেন প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। দাদুর মুখে শুনেছি, খুব সৎ প্রকৃতির লোক। তবে মেজাজি। দাদু নিজেও খুব সম্মান করতেন সুবোধ বাগচীকে। উনি এলেন মিনিট পাঁচেক পর। চোখে পুরু চশমা, পরনে সাদা হাফ হাতা শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। বয়সটা অবশ্য বোঝা যায় না। ভদ্রলোক সোজা হয়ে হাঁটেন।

চেয়ারে বসেই কাজের কথা তুললেন, "শুভ্রবাবু, ফ্যাক্টরির টয়লেটগুলোকে কি আপনি রিনোভেশন করার অর্ডার দিয়েছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"রবিনবাবু যে কনট্রাক্টরকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তিনি এস্টিমেট দিয়েছেন প্রায় তিন লাখ টাকার। অত টাকা আমাদের মেন্টেনেন্স খাতে নেই।"

বাব্বা রবিনবাবু তো খুব করিতকর্মা লোক। কাল বিকালে কথাটা হল, আর আজ সকালেই একজন কনট্রাক্টরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন? কাল খুব বড় মুখ করে রন্টুকে বলেছিলাম, সাত দিনের মধ্যে টয়লেটগুলো সারিয়ে দেব। তা করতে না পারলে আমাকে লজ্জায় পড়তে হবে। সুবোধ বাগচীকে বললাম, "কী করা যায় বলুন তো? আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি।"

"ফ্যাক্টরিতে মোট চারটে টয়লেট। তার মধ্যে ওয়ার্কার্সদের টয়লেটটা আপনি মেরামত করে দিন। তাতে খরচ কম পড়বে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজারের মধ্যে হয়ে যাবে। রবিনবাবুর কনট্রাক্টর যদি করে দিতে না পারেন তা হলে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব।"

"যা ভাল বোঝেন করুন।"

"বাই দ্য বাই, আপনি কি কোম্পানির ব্যালান্স শিটটা চোখ বোলানোর সময় পেয়েছেন শুভ্রবাবু?"

pathagar.net

তিনদিন আগে সুবোধবাবু আমার কাছে একটা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়িতে সেটা ওইভাবেই পড়ে আছে। দেখার সময় পাইনি। না বলতে লজ্জাই লাগল। একটু ঘুরিয়ে বললাম, "ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি।"

"স্বাভাবিক। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান নিয়ে নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কামাখ্যাবাবু বা রবিনবাবু আপনাকে কোনও আন্দাজ দেননি?"

"কীসের আন্দাজ? আমি তো কিছুই বুঝতে..."

আমাকে থামিয়ে দিয়েই সুবোধ বাগচী বললেন, "শুভ্রবাবু, ব্যালান্স শিটটা ভাল করে দেখলেই এই মুহূর্তে কোম্পানির অবস্থা আপনি বুঝতে পারবেন।"

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গি দেখে মনের মধ্যে কু ডাকল। সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলতে চাইছেন ভদ্রলোক, কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুবোধ বাগচী ফের বললেন, "খুবই অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। এই মুহূর্তে যদি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কস্ট কন্ট্রোল করা না যায়, তা হলে সামনের ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে আমরা মুখ থুবড়ে পড়ব। সেই সঙ্গে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট বাড়াতেই হবে। না হলে আগামি এক বছরের মধ্যে কোম্পানিতে লাল বাতি জ্বলবে। বুঝলেন অবস্থাটা?"

"কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। স্যালাইন ইউনিটটা করতে গিয়ে আপনার দাদু একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। তখন আমি বারণ করেছিলাম। উনি শোনেননি। এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়তে বাড়তে সেটা এমন অঙ্কে গিয়ে পৌঁছেছে, আমরা শোধ করতে পারব কি না, সন্দেহ। এ সব আপনার জানা উচিত।

আমি একটু অবাকই হচ্ছি, এত বড় একটা সমস্যার কথা আপনাকে কেউ এতদিন কেন বলেননি।"

সুবোধবাবুর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ব্যাঙ্ক লোন-এর কথা আমি জানতাম। দাদু টাকাটা নিয়েছিল ব্যাঙ্ক অব বরোদা থেকে। মাস ছয়েক আগে দাদু আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু কোম্পানির অবস্থা যে এতটা খারাপ, আমি আন্দাজই করতে পারিনি। বললাম, "ব্যাঙ্ক থেকে যে নোটিশগুলো এসেছে, তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?"

"সে সব ফাইল কামাখ্যাবাবুর কাছে আছে। আজ উনি আসেননি। চেস্ট পেন হয়েছে বলে। পরে আপনি দেখে নেবেন। আর একটা কথা আপনাকে বলার ছিল।"

"বলুন।"

"রবিনবাবু কুইনাক্রাইন বলে একটা ইঞ্জেকশনের এসেন্সি নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। একটা আমেরিকান কোম্পানির কাছ থেকে। আপনি সেটা আটকান। আমি চাই না, আমাদের কোম্পানির ফারদার কোনও লস হোক।"

সুবোধবাবুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক রবিনবাবুকে পছন্দ করেন না। কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোককে তো আমার সুবিবেচক বলে মনে হয়েছে। তাই বললাম, "লস-এর কথা কেন বলছেন?"

"তার কারণ আছে। ওটা একটা গর্ভনিরোধক ইঞ্জেকশন। কিন্তু সাইড এফেক্ট হচ্ছে বলে আমেরিকান গভর্নমেন্ট ওই ইঞ্জেকশন ব্যান করে দিয়েছে। যা খবর পাচ্ছি, তাতে আমাদের গভর্নমেন্টও দুম করে ওই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এবং সেটা যদি করে তা হলে পুরো স্টকটা আমাদের পড়ে থাকবে। আমরা বিক্রি করতে পারব না। রবিনবাবু একবার আপনার দাদুকে ডুবিয়েছেন। আমি চাই না, আপনাকেও ডোবান।"

কথাগুলো শুনে মনে হল, কে যেন আমাকে এম ডি-র চেয়ার থেকে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিল।

আট

কাল রাতে রিঙ্কিকে গলফ গ্রিনে পৌঁছে দেওয়ার পর থেকে ও আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সারা দিনে ওর একটা ফোন আশা করেছিলাম। করেনি। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে এসে ওকে একটা ফোন করলাম।

ও প্রান্তে রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ তুলছে না। রিঙ্কিদের বাড়িতে কি কেউ নেই তা হলে? তাই বা কী করে হয়? রিঙ্কির মা তো থাকবেন। রিং হতে হতে একটা সময় এনগেজড টোন আসতে শুরু করল। এই সময়টায় রিঙ্কির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলে ভাল হত। ফের ডায়াল করলাম। কয়েকবার রিং হওয়ার পর কেউ রিসিভারটা তুলে খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "কাকে চাই?"

পুরুষ কণ্ঠ, রিঙ্কির বাবাই হবেন। বললাম, "রিঙ্কি আছে?"

"না নেই। কে বলছেন?" রাগী রাগী গলা।

"আমি ওর বন্ধু বলছি। রিঙ্কিকে কখন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

"ও কে আর এ বাড়িতে পাবেন না।"

"কেন" বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। এ বাড়িতে আর পাওয়া যাবে না, তার মানেটা কী? বললাম, "আপনি কে বলছেন, জানতে পারি?"

"আমার পরিচয় জেনে আপনি কী করবেন? রিঙ্কির সঙ্গে এ বাড়ির আর কোনও সম্পর্ক নেই। শি লেফট দ্য হাউস দিস মর্নিং। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইট।"

বুকে আর একটা ধাক্কা এসে লাগল। গত কয়েকটা দিন কাটছে ভাল আমার! খালি খারাপ খবর। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ঠিক আছে।"

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে চুপ করে বসে রইলাম। কাল থানা থেকে ফেরার পথে ও পারিবারিক অশান্তির কথা

বলছিল। কিন্তু সেটা যে এত জট পাকিয়ে আছে, তা ভাবতে পারিনি। রিঙ্কি গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কোনও বন্ধুর বাড়ি টাড়ি হবে। কথাটা মনে হতেই কঙ্কণার বাড়িতে ফোন করলাম। রিঙ্কির জন্য মাঝে মধ্যেই আমাকে কঙ্কণার বাড়িতে ফোন করতে হয়। আমার গলা ও চেনে। উল্টো দিক থেকে কঙ্কণাই বলল, "শুভ্রদা, রিঙ্কির কী হয়েছে শুনেছেন?"

"না তো। কী হয়েছে?"

"বাড়ি থেকে ও বেরিয়ে এসেছে। কাল অনেক রাতে বোধহয় আপনি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বাঁকুড়া থেকে ওর বাবা মায়ের ফেরার কথা ছিল আজ। কিন্তু ওঁরা কাল বিকেলেই ফিরে আসেন। যা হয়, অত রাতে রিঙ্কিকে ফিরতে দেখে ওর বাবা ওকে খুব বকাবকি করেন।"

"তার পর?"

"সকালে ও আমাদের বাড়িতে চলে আসে। সব শুনে আমি আর আমার মা ওকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু ও পাত্তাই দিল না। বেলায় কাকে যেন ফোন টোন করল। বিকেলে বলল, 'আমি মুম্বই চলে যাচ্ছি।' জিজ্ঞেস করলাম, কার সঙ্গে যাচ্ছিস, কোথায় যাচ্ছিস, খোলসা করে কিছু বলল না। ফোনে যখন কথা বলছিল, তখন রাজু আগরওয়াল বলে একজনের নাম ওর মুখে শুনেছিলাম। লোকটা মনে হয়, মডেলদের কো-অর্ডিনেটর। ওর কথাবার্তা শুনে আমার ভাল লাগল না শুভ্রদা।"

"তখন আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না কঙ্কণা?"

"দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও-ই বারণ করল। জানেনই তো কী রকম জেদি টাইপের মেয়ে। বলল, শুভ্রদাকে আমি অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে চাই না। আমি জানি, শুভ্রদার ওখানে গেলে আমায় ফেলে দেবে না। কিন্তু এই অবস্থায় আমি ওর বাড়িতে উঠব না। মুম্বই থেকে একটা কিছু করে তবেই ওর কাছে আসব।"

pathagar.net

"মুম্বই যাওয়ার জন্য রিঙ্কি কখন বেরিয়েছে?"

"বিকেল পাঁচটায়। বলল, ফ্লাইট নাকি সাতটার সময়। ওখানে পৌঁছে তার পর আমাকে ও ফোন করবে বলেছে। যদি ফোন করে, তা হলে কি রিঙ্কিকে আপনার কথা কিছু বলব শুভ্রদা?"

"কী আর বলবে। ও এই রকম মূর্খামি করবে, আমি ভাবতেই পারছি না।"

"আপনি এখন কোথায়?"

"বাড়িতে। আমারই ভুল। কাল অত রাত্তির অবধি ওকে আটকে রাখা আমার উচিত হয়নি।"

"কালকের কথা ও কিন্তু আমায় সব বলেছে। সারাটা দিন শুধু আপনার কথাই বলে গেল। আপনাকে খুব ভালবাসে।"

শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেল। আমি ভাল মতো জানি, মুম্বই একটা নরকনগরী। রিঙ্কি ওখানে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। ফুলের মতো মেয়েটাকে সবাই ছিঁড়ে খাবে। কালই থানা থেকে বেরনোর পর ও মডেলিং নিয়ে কথা বলছিল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লোকজন ধরে ও মুম্বই চলে গেল? তার মানে অনেক দিন ধরেই রিঙ্কি প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে আমাকে একবার বলার প্রয়োজন মনে করল না? আশ্চর্য!

আমি জানি, মডেলিং জগৎটা একদমই ভাল না। মডেলদের অনেককেই আমি চিনি। পার্ক হোটেলের তন্ত্রতে অনেকের সঙ্গেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওরা আলাদা টাইপের। সুযোগ পাওয়ার জন্য ওরা অনেকেই যখন তখন পোশাক খুলে ফেলতে রাজি। রিঙ্কি এতটা নীচে নামতে পারবে না।

"কী ভাবছেন শুভ্রদা? কথা বলছেন না যে?"

"একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। যাক গে, মুম্বই থেকে ও যোগাযোগ করলে তুমি ওকে বোলো, আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি।"

আমার কথার মধ্যে বোধহয় কোনও কিছু ছিল, কঙ্কণা বলল, "আয়াম সরি শুভ্রদা, রিঙ্কির কথা শোনা আমার উচিত হয়নি। আপনাকে জানানো উচিত ছিল।"

ফোনটা ছেড়ে দিতেই ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতা আমাকে গ্রাস করল, সারা বাড়িতে একা আমি। আর কেউ নেই। গীতামাসি রাত্তির আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকে। আজ এসে দেখি, নেই। কাজের লোকটা বলল, কোনও খবরও দেয়নি। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে রিঙ্কির কথা ভাবতে লাগলাম। জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলবে। আমি নিশ্চিত। সবাইয়ের ভাগ্য বিপাশা বসু বা কোয়েনা মিত্রের মতো হয় না।

কাল বেশ গরম ছিল। আজ বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে। বারান্দা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতেও ইচ্ছে করল না। অফিস থেকে ফিরে পোশাক ছাড়িনি। বাড়ি ফেরার সময় ঠিক করেছিলাম, রিঙ্কিকে ডেকে নিয়ে মেনল্যান্ড চায়নায় খেতে যাব। মানুষ ভাবে এক, হয় এক। এই বিরাট একটা বাড়িতে আমি একা বসে আছি, আর রিঙ্কি এই মুহূর্তে রাজু আগরওয়াল না কে, তার সঙ্গে মুম্বইয়ের ফ্লাইটে। কাল যখন এ বাড়িতে আমরা পরস্পরের শরীর থেকে সুখ আদায় করছি, তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এমন ভাবে ছিটকে যাব?

সেই সুখের কথা মনে হতেই তীব্র একটা তৃষ্ণা অনুভব করলাম। দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে আমি এতদিন মদ্যপান করিনি। হঠাৎই ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। আমার কাছে কোনও বোতল নেই। দাদুর ঘরে থাকতে পারে। রোজ ডিনারের আগে দাদু মেপে মাত্র দু পেগ হুইস্কি খেত। বাবাও খেত, তবে অপরিমিত। দাদুর ঘরে একটা সেলার আছে। অবশ্যই সেটা তালাবন্ধ। সেটা খোলার জন্য আমার ঘরে গিয়ে দাদুর সেই চাবির গোছাটা নিয়ে এলাম।

boiRboi.net

সেলার খুলতেই ভেতরটা ঝকমক করে উঠল। নানা ধরনের বোতল সাজানো। দু'এক বছর অন্তর মাস খানেকের জন্য দাদু বিদেশে বেড়াতে যেত। তখনই স্কচ হুইস্কি নিয়ে আসত। বোতলগুলো সব সাজানোই আছে। যে লোকটা শখ করে সাজিয়েছে, সে নেই। কী হবে এত শখ শৌখিনতা করে? ভেতর থেকে বেছে স্কচের একটা বোতল বের করে আনলাম। দাদু বোধহয় অর্ধেকটা খেয়েছিল। বাকি অর্ধেকটা পড়ে আছে। বোতলটা তুলে ধরতেই আমার চোখের কোণ ভিজে উঠল।

না, এতটা আবেগপ্রবণ হওয়া বোধহয় আমার উচিত নয়। চাবির গোছাটা আমার হাতে। দাদু আর কী আমার জন্য রেখে গেল, সেটাও জানা দরকার। কথাটা মনে হতেই বোতল টেবিলের উপর রেখে আমি দাদুর আলমারি খুলে ফেললাম। দামি সব স্যুট হ্যাঙ্গারে ঝোলানো রয়েছে। একটাও আমার গায়ে ফিট করবে না। দাদু ছিল পাঁচ ফুট ছয়। আমি পাঁচ এগারো। দাদু বলত, "তুই তোর মায়ের বাড়ির হাইটটা পেয়েছিস।" মায়ের বাড়ি ছিল জলপাইগুড়ির ওদিকে। ছোটবেলায় একবার মায়ের সঙ্গে সেই বাড়িতে গেছিলাম। এখন সেখানে কে কে আছেন, জানিও না। দাদুর শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আসেননি।

চাবি দিয়ে আলমারির ড্রয়ার খুলতেই প্রচুর কাগজপত্তর দেখতে পেলাম। কয়েকটা ফাইল, ফ্লপি আর ব্যাঙ্কের পাস বইও। ফাইল আর পাস বইগুলো বের করে আলমারিটা বন্ধ করে দিলাম। একদিনে এত কাগজপত্তর দেখা সম্ভব না। বাড়িতে দাদুর কম্পিউটার ছিল না। অফিসে আছে। তার মানে দাদু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফ্লপিতে তুলে নিয়ে বাড়িতে এনে রেখে দিয়েছে। পরে সেগুলো দেখতে হবে। প্রথমেই পাস বইগুলো খুলে দেখলাম একটা লন্ডনের লয়েডস ব্যাঙ্কের। জমা আছে, এক লাখ পঁচাত্তর হাজার ইউরো। ইনটু তিয়াত্তর

টাকা। অঙ্কটা কত গিয়ে দাঁড়াল, চট করে হিসেব করতে পারলাম না। একটা পাস বই কানাড়া ব্যাঙ্কের, যোধপুর ব্রাঞ্চ। সেখানে আছে পঞ্চান্ন লাখ টাকা। আর এক পাস বই এইচ ডি এফ সি-র। সেখানে তেরো লাখ। সারাটা দিন মনে একটা দুর্ভাবনা চেপে ছিল। ব্যাঙ্কের পাস বইগুলো দেখে মনে সাহস ফিরে এল। দাদু তা হলে আমাকে নিঃস্ব করে যায়নি।

না, এই আবিষ্কার বিফলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। সেলিব্রেট করা দরকার। উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে এসে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিলাম। সব থেকে ভাল হত, এ সময় রিঙ্কি যদি আমার পাশে থাকত। স্বপ্নময় থাকলেও মন্দ হত না। শালা, নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের দেখিয়ে দিতাম কনফিডেন্স কাকে বলে। আমি এখন কাফি টাকার মালিক। শুধু চিঠি পাঠিয়ে ব্যাঙ্কারকে জানানোর অপেক্ষা, পাস বইয়ের মালিক বদলে গেছে। প্রথম চুমুকটাতেই গ্লাস অর্ধেক খালি করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে চনমনে ভাবটা ফিরে এল। স্কচ হুইস্কিতে এত তাড়াতাড়ি চনমনে হওয়া যায় না। কিন্তু শরীর আর মন ভাল করার অনেক বড় টনিক যে এখন আমার হাতে!

গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে ফাইলে চোখ বোলাতে লাগলাম। ছয় মাস আগে আমেরিকার র‍্যাডখ্লিফ কোম্পানি আমাদের আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চেয়েছিল। জীবনদায়ী কিছু ওষুধ এখানে তৈরি করে বিক্রি করবে। দাদুর সঙ্গে কয়েকটা চিঠি চালাচালিও করে। মাঝে দিল্লি থেকে ওদের একজন এসে আমাদের ফ্যাক্টরিও দেখে যান। অনেক কিছু বদলাতে বলেছিলেন। সেটা করতে প্রায় এক কোটি টাকার মতো ইনভেস্টমেন্টের দরকার হত। শেষ মুহূর্তে দাদু পিছিয়ে যায়। পর পর কয়েকটা চিঠি পড়ে মনে হল, দাদু ঠিক কারণেই নতুন ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়নি। স্যালাইন

ইউনিটটা দাদুর গলায় ফাঁসের মতো এঁটে ছিল বলে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। তখনই সুবোধ বাগচীর কথা মনে পড়ল। লোকটা আজ আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কালই অফিসে গিয়ে আমি ফ্যাক্টরির সব টয়লেট নতুন করে বানানোর অর্ডার দেব। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। না হলে রন্টুদের চোখে আমি খাটো হয়ে যাব। দাদু একবার বলেছিল, বাঙালির ব্যবসা তিন পুরুষের বেশি টেকে না। আমি দেখিয়ে দেব, টেকে। তিন পুরুষ কেন, দশ পুরুষও টেকে। শালা যত সব বুড়োর দল। সুবোধ বাগচী, কামাখ্যা মুখার্জি, রবিন গুহ। এঁরা নতুন কাজে হাত দেওয়ার আগে পনেরোবার ভাবে। ঝুঁকি না নিলে ব্যবসা চলে? এঁদের কথায় চলে দাদুর সর্বনাশ হয়েছে।

হঠাৎই স্বপ্নময়ের কথা মনে হল। ওর এক দাদা বিজনেস কনসালটেন্ট। আমেরিকায় ছিল দীর্ঘদিন। কী যেন একটা নাম বলেছিল সেদিন। হ্যাঁ, ধ্রুব মল্লিক। এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কয়েকটা প্রোজেক্ট করে দিচ্ছে। ওই ধ্রুব মল্লিকের কাছে একবার গেলে কেমন হয়? কোম্পানির পুরো ব্যালান্স শিট ওর হাতে তুলে দেব। দিয়ে বলব, আপনি পরামর্শ দিন, কীভাবে ব্যবসাটা আরও বাড়াতে পারি। সুবোধ বাগচী সকালে বলছিল, থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কস্ট কন্ট্রোল করতে না পারলে, আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট মার্জিন না বাড়ালে আমার কোম্পানি নাকি রসাতলে যাবে। শালা, ওই বুড়ো ভামটা এই পরামর্শ দেওয়ার কে? কলকাতায় অ্যাকাউন্ট্যান্টের অভাব? পয়সা দিলে দশটা সুবোধ বাগচী দৌড়ে আসবে।

হুইস্কি খেতে খেতে এ সব কথা ভাবতে আমার ভাল লাগছে। আমার শালা কী? সাত কূলে কেউ নেই। আমার পক্ষেই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব। কোম্পানির টার্নওভার চব্বিশ কোটি টাকা। পাঁচ বছরের মধ্যে সেটা আমি বাড়িয়ে নিয়ে যাব

পঞ্চাশ কোটিতে। যত নির্মম হতে হোক না কেন আমাকে। কোম্পানির উন্নতির জন্য যে আমি ধ্রুব মল্লিককে লাগাব, সেটা এখন কাউকে জানাব না। বুড়োগুলো প্যাঁচ কষতে পারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই শালারাই অনেকদিন ধরে দাদুকে চুষে খেয়েছে। আর কাউকে আমি পরোয়া করব না। আমি আমার মতো করে কোম্পানি চালাব।

স্বপ্নময়কে ফোন করলাম। ফোন হয়েই যাচ্ছে। উফ, নর্থ ক্যালকাটার লোকগুলোকে এই জন্যই আমি সহ্য করতে পারি না। একটা সময় বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিল। থাকে হয়তো দোতলায়। কিন্তু ফোন রাখবে নীচে, ওরা বলে বৈঠকখানায়। একটা প্যারালাল লাইন ওপরে নিলে কী হয়? না নেবে না। তা হলে ঘরের বউরা যদি আকচার ফোন শুরু করে? পরপুরুষের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে? ফোনের এই সিস্টেমটা আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, স্বপ্নময়দের বাড়িতে। অদ্ভুত!

অনেকক্ষণ পর ওদিকে রিসিভার তুলল স্বপ্নময়ই। বলল, "শুভ্র তুই! তোকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

"কেন?"

"আজ আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল রে।"

স্বপ্নময় এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করছে? কাকে? প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরতেই ও বলল, "গোয়াবাগানের মেয়ে। বাবা-মা ঠিক করে ফেলল।"

বলতে যাচ্ছিলাম, থুতু ফেলে ডুবে মর। কিন্তু কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলাম না। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া ছেলে। বড় মুখ করে বলছে, বাবা-মা বিয়ে ঠিক করে ফেলল! মরুক গে যাক। ওর বিয়ে নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। বললাম, "তোর সেই বিজনেস কনসালটেন্ট দাদাটা এখন কোথায় রে?"

"ও, ধ্রুবদা? ও তো এখন বাঙ্গালোরে। পরশু ফিরবে। আমার বিয়েতে মনে হয় থাকতে পারবে না রে।

pathagar.net

ফেব্রুয়ারিতেই আমেরিকা ফিরে যাচ্ছে। কী বিচ্ছিরি বল। বাবা আমার বিয়ের দিনটা ঠিক করল টেনথ মার্চ। আর এক মাস আগে করলেই ধ্রুবদা থাকতে পারত। শোন, গোয়াবাগানের ওরা আমাকে ভালই দিচ্ছে। বাবা একটা কালিস বাগিয়ে নিয়েছে আমার জন্য...”

স্বপ্নময় আরও কী সব বলে যাচ্ছে। যতবার ওর দাদার কথা জানতে চাইছি, ঘুরে ফিরে নিজের হবু শ্বশুরবাড়ির গুণকীর্তন করছে। শেষ পর্যন্ত আমার রাগই হয়ে গেল। বুঝতে পারি না, নর্থ ক্যালকাটার ছেলেরা নর্থ ক্যালকাটাতেই কেন বিয়ে করে? বাঁ হাতে রিসিভারটা ধরে ডান হাতে গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে হুইস্কিটা শেষ করে ফেললাম। রাগের মাথায় কী বলে ফেলব কে জানে? ফোনটা ছেড়ে দেওয়া দরকার। স্বপ্নময়কে প্রায় থামিয়ে দিয়েই বললাম, “এই...আমাকে টয়লেটে যেতে হবে। ফোনটা রাখছি রে। কাল পারলে সন্ধেবেলার দিকে আমার বাড়িতে আসিস, তখন সব শুনব।” বলেই রিসিভারটা রেখে দিলাম। সত্যিই আমার পেচ্ছাপ পেয়ে গেছে। টয়লেটে যাওয়া দরকার। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় মাথাটা কেমন যেন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাতলটা ধরে ফেললাম। খালি পেটে এতটা হুইস্কি পেটে দেওয়া ঠিক হয়নি। নিজেকে সামলে টয়লেটে গিয়ে তলপেট খালি করে আসার পরই মারাত্মক খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল। সেই দুপুরে আজ ক্যান্টিনের খাবার খেয়েছি। বিকেলে একবার চা। আর কিছু পেটে পড়েনি। গীতামাসি থাকলে এই সময় কিছু না কিছু করে দিত। কিছু বলতে হয় না। আজ বিকেলে আসেনি। না বলে গীতামাসি কোনওদিন ডুব মারে না। তা হলে কি মনার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল?

কিচেনে ঢুকে ফ্রিজ খুলে দেখলাম। রান্না করা আছে। স্রেফ গরম করে নিতে হবে। ঠিক আছে, একদিন না হয় করে নেওয়া যাবে। রাতে কখনও আমি ভাত খাই না। বাঙ্গালোরে

থাকার সময় থেকেই আমার এই অভ্যেসটা হয়ে গেছে। গীতামাসি চমৎকার রুটি বানিয়ে দেয় আমায়। পাতলা, ছোট। আজ কে আর রুটি করে দেবে? পাউরুটি জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে না হয় সেঁকে নেওয়া যেত। রুটির কাজটা হয়ে যেত। কী আর করা যাবে? ডিনারটা ভাত দিয়েই না হয় হোক। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গ্যাস ওভেন জ্বালাতে যাব, এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। এত রাতে কে আবার এল?

দরজা খুলতেই দেখি, গীতামাসি। পিছনে কে একজন দাঁড়িয়ে। গেটের লাইটটা জ্বালা নেই। তাই বুঝতে পারলাম না। এক গাল হেসে গীতামাসি বলল, "ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখতে গেছিলাম। শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ। তাই দেরি হয়ে গেল। খুব খিদে পেয়েছে না? চলো, তোমাকে খাবার গরম করে দিই।"

ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়ালাম। আর তখনই কানে এল, মনার মা সঙ্গীকে বলছে, "আয় রে লাভলি। ভেতরে আয়। অনেকদিন পর তুই এ বাড়িতে এলি, তাই না?"

নয়

কঙ্কণাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। রিঙ্কির খবর নেওয়ার জন্য। না, রিঙ্কি কোনও খবর দেয়নি। সকাল থেকেই মনটা তাই খুব খচখচ করছে। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেল রিঙ্কি মুম্বই গেছে। এখনও কেন কঙ্কণাকে খবর দিল না? নাকি খবর দিয়েছে, অথচ কঙ্কণা আমাকে জানাচ্ছে না। হয়তো রিঙ্কিই বারণ করে দিয়েছে।

ঘনিষ্ঠ এমন কেউ নেই, রিঙ্কির ব্যাপারে যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি। স্বপ্নময় আছে। কিন্তু একটা মেয়ের জন্য

আমার মন খারাপ করছে, এই কথাটা শুনলেই ও খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করবে। চিরটা দিন ওর কাছে বারফাট্টাই মেরেছি, প্রেম ফ্রেম সব বাজে কথা। মেয়েরা ভোগ্য বস্তু। আর কিছু নয়। স্বপ্নময় তর্ক করেছে। ভুল করছিস। মেয়েরাই পুরুষদের আসল শক্তি। মেয়েরা মায়ের জাত।

এখন যদি আমি উল্টো কথা বলি, ও তো হাসবেই। ভাবা যায়, প্রায় ঊনত্রিশ বছর বয়স হতে চলল, স্বপ্নময় কোনও মেয়েকে নিয়ে শোয়নি? একবার বাস থেকে নামার সময় কোন এক মেয়ের স্তন নাকি ওর বুক ছুঁয়ে গেছিল। সেটা নাকি এমন অভিজ্ঞতা, যার জন্য ও দু'রাত্তির ঘুমোতে পারেনি। তখন ভাবতাম, বিয়ের পর স্বপ্নময় তা হলে কী করবে? তখন তো ওর এমন সব অভিজ্ঞতা হবে, ওকে সারা জীবনই জেগে থাকতে হবে!

আজ স্বপ্নময়ের আসার কথা আছে। আমি জানি, যত কাজই থাক, ও আসবেই। এসে গোয়াবাগানের গল্প করতে চাইবে। পেটে মাল পড়লে আবার প্রচণ্ড ভদ্রলোক হয়ে যায় স্বপ্নময়। কখনও তর্ক করে না। অদ্ভুত ছেলে! জগৎ সংসার সম্পর্কে তখন আশ্চর্যরকম উদাসীন। আমি যদি তখন গোয়াবাগানের গুষ্টি উদ্ধার করি, তাও ও চটবে না। শুধু বলবে, 'তুই ঠিকই বলছিস।' ওর সঙ্গে ড্রিঙ্কস নিয়ে শেষবার বসেছিলাম, পার্ক স্ট্রিটে মোকাম্বোতে। আমাকে ও পয়সা দিতে দেয়নি। তার আগেরবার নাকি আমি ওকে খাইয়েছিলাম। সেটা মাস ছয়েক আগে, অষ্টমী পুজোর রাতে। শালা, ঠিক সব মনে রাখে।

pathagar.net

আজ ভোর থেকেই বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রবিবার। বেলা দশটা সাড়ে দশটা বাজে। স্নান করে অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। সকালে গীতামাসি আসেনি। নিজেই চা আর টোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছি। স্বপ্নময়ের আসার কথা এগারোটায়। পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নিলাম। স্বপ্নময় আসা

মাত্রই স্কচের বোতল খুলে বসতে হবে। দু'পেগ খাওয়ার পর, রিঙ্কির ব্যাপারটা খুলে ওকে বলতে হবে।

রিঙ্কির কথা স্বপ্নময়কে আগে বলেছি। তবে ওকে চুমু টুমু খাওয়ার কথা। আমি জানি, এখন যদি মন খারাপের কথা বলি, তা হলে স্বপ্নময় বলবে, "এটা নতুন কথা নয়। মন খারাপ তো তোর হবেই।" ও ব্যাখ্যাও দেবে, "অনেক আগেই তুই ওর প্রেমে পড়েছিস। সেটা বুঝতে পারিসনি।" এ সব শুনে এক এক সময় ভাবি, বেলগাছিয়ায় নয়, স্বপ্নময়ের থাকা উচিত বদ্রীনাথের কোনও আশ্রমে।

সোফায় বসতে যাব, এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল। যাক, স্বপ্নময় এসে গেছে। দুপুরটা ভালই কাটবে। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই দেখি, পাড়ার পুজো কমিটির লোকজন। অনেকেরই মুখ চেনা। দাদুর শ্রাদ্ধের দিন কয়েকজন এসেওছিল। তবে কারও নাম মনে নেই। লম্বা একটা ছেলে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "শুভ্রদা, আমি সাগ্নিক। সরি, এই সময়ে ডিসটার্ব করলাম।"

মনে মনে বিরক্ত হলেও বললাম, "এসো, ভেতরে এসো।" সবে জানুয়ারি মাস। পুজো এখন অনেক দেরি। এখন এরা কী জন্য, মাথায় ঢুকল না।

ভেতরে এসে তিন-চারজন সোফায় বসল। সাগ্নিক ছেলেটা বলল, "আপমি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা লেক গার্ডেন্স সংহতির দুর্গা পুজোটা করি। আপনার দাদু পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।"

"হ্যাঁ, জানি। কিন্তু

"শিবপ্রসাদবাবুর জন্য আমরা একটা শোকসভা করেছিলাম। আপনার বাড়িতে চিঠি দিয়ে গেছিলাম। আপনি যেতে পারেননি।"

হবে হয়তো। গত পনেরো-কুড়িটা দিন অন্য কোনও দিকে মন দেওয়ার উপায় ছিল না আমার। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে

pathagar.net

রইলাম। এদের উদ্দেশ্যটা কী জানা দরকার। আমরা লেক গার্ডেন্সের অনেক পুরনো বাসিন্দা। দাদু যখন আমাদের এই বাড়িটা করে, তখন নাকি আশপাশে কোনও বাড়ি ছিল না। গোবিন্দপুর অবধি দেখা যেত। কিন্তু এখন লেক গার্ডেন্স এমন একটা জায়গা হয়ে গেছে, কেউ কাউকে চেনে না পর্যন্ত। আমার এত বড় বিপদ গেল, পাড়ার কাউকে পাশে পাইনি।

আমাকে কোনও কথা না বলতে দেখে সাগ্নিক ছেলেটা বলল, "শোকসভার পর আমরা সবাই মিলে একবার বসেছিলাম। আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি। আপনার দাদুর পদটা আপনি নিন।"

ওহ, তা হলে এই ব্যাপার! হেসে বললাম, "কিন্তু পুজোর তো এখন অনেক দেরি। প্রায় আট মাস। এখনই এ সব কেন?"

"এবার আমাদের রজত জয়ন্তী। ইচ্ছে আছে, পুজোটা ভাল করার। যাতে এশিয়ান পেন্টসের ফার্স্ট প্রাইজটা পেতে পারি। আপনার সাহায্য চাই।"

মুখের উপর সরাসরি না বলে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আবার পুজো টুজোর ঝামেলায়ও আমি থাকতে চাই না। দাদু এদের কতটা সাহায্য করত, কোনও দিন জানতে চাইনি। নিশ্চয়ই ভাল টাকা দিত। আর এরা সেই টাকা স্ফূর্তি করে উড়িয়ে দিত। একটু বাজিয়ে দেখি। তারপর কায়দা করে না বলে দেওয়া যাবে। সেজন্য জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কি স্পেশাল কিছু করার কথা ভাবছ?"

"প্যান্ডেল শুভ্রদা। যোধপুর পার্ক গত বছর রাজস্থানের একটা মন্দির বানিয়েছিল। এ বার আমরা কেরলের একটা মন্দির বানাব। ছ'সাত লাখ টাকা এতেই চলে যাবে। পুজোর পর আমরা তিনজন ওদিকে বেড়াতে গেছিলাম। ছবি তুলে এনেছি। দেখবেন নাকি?"

"না, না। তোমাদের বাজেট কত?"

pathagar.net

"এবার দশের কাছাকাছি চলে যাবে। সে জন্য আগে ভাগে আপনার কাছে এসেছি।"

"এত টাকা তোমরা তুলবে কী করে?"

"উঠে যাবে। পাড়ায় কিছু মাল্টি স্টোরিড বাড়ি হয়েছে। ভাল ভাল লোক এসেছেন সেখানে। তাঁদের আমরা অ্যাপ্রোচ করব। তা ছাড়া আপনারা যাঁরা পুরনো, তাঁরা তো আছেনই।"

"তুমি কী করো, সাগ্নিক?"

"আমি মাইক্রো বায়োলজিস্ট শুভ্রদা। ট্রপিকালে আছি।"

ছেলেটা বায়োলজিস্ট শুনে সোজা হয়ে বসলাম। শিক্ষিত ছেলে। না, এদের আন্ডার এস্টিমেট করা ঠিক হবে না। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমরা?"

"আমি দীপ। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আর এ হচ্ছে সংকর্ষণ, আগে ছিল উইপ্রোতে। ইদানীং জয়েন করেছে রিলায়েন্সে। রিজিওনাল ম্যানেজার।"

"মাই গড, তোমরা এত ব্যস্ত। অথচ পুজোর জন্য সময় দাও কী করে?"

"আর কিছুতে নিজেদের ইনভলভ করি না। পাড়ার এই একটা অনুষ্ঠানেই থাকি শুভ্রদা। পুজোটা যাতে ভাল মতো হয়।"

নাহ্, একটু আগে এদের সম্পর্কে ভুল ভাবছিলাম। উচিত হয়নি। সাগ্নিক ছেলেটাকে আমার কাজে লেগে যেতে পারে। মাইক্রো বায়োলজিস্ট। এরা আগে ভাগে অনেক কিছু জানতে পারে। এই দু'তিন দিন ধরে খবরের কাগজে পড়ছি মুর্শিদাবাদে অজানা রোগে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে। নতুন কোনও এক ভাইরাস আক্রমণে। সাগ্নিক নিশ্চয়ই বলতে পাববে, ভাইরাসটা কী?

প্রশ্নটা করতেই ও বলল, "ঠিক বলতে পারব না শুভ্রদা। আমাদের এখানে আঠারো মাসে বছর। ভাইরাসের কথা শোনা মাত্রই ট্রপিকাল থেকে লোক পাঠিয়ে দেওয়া উচিত

ছিল ওখানে। কিন্তু আমাদের কেউ কিছু বলেনি। দেখবেন হয়তো পুনে থেকে ভাইরোলজিস্টরা এসে অলরেডি ওখানে চলে গেছেন। রোগের কারণ খুঁজে বের করার জন্য।"

"তোমাদের এক্সপার্টরা কী বলছেন?"

"কারও সঙ্গে কথা হয়নি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি। সেটা হল, যত ভাইরাস আক্রমণ দেখবেন, সব বর্ডারিং এরিয়া থেকে। আপনার মনে আছে, গুজরাতে কয়েক বছর আগে প্লেগ ফিরে এল। সেটাও শুরু হয়েছিল বর্ডার থেকে।"

"তোমার কি মনে হয়, কেউ ইচ্ছে করে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে?"

"হতে পারে। বিজ্ঞান যা এগিয়েছে, তাতে সবই সম্ভব। এই তো আজই কাগজে ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকরের একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে। তাতে যা পড়লাম, অবাক কাণ্ড। অত বড় একজন বিজ্ঞানীর কথা ফেলাও যায় না।"

আজকের কাগজটা ভাল করে পড়া হয়নি। ডঃ নারলিকর কী লিখেছেন, জানি না। তাই বললাম, "কী বলেছেন উনি?"

"এই যে কয়েক মাস আগে আমরা সার্স ভাইরাসের কথা জানলাম, এটা নাকি এসেছে অন্য কোনও গ্রহ থেকে।"

"কী বলছ তুমি? তা হলে চিনে প্রথম সার্স রোগ হল কী করে? প্রথম হওয়ার কথা তো আমেরিকায়। যতদূর জানি, ওরাই অন্য গ্রহে স্পেসশিপ পাঠিয়েছে।"

"এই কেনটার উত্তর দিতে পারব না শুভ্রদা। তবে এটুকু বলতে পারি, সার্স ভাইরাসের হাত থেকে আমরা জোর বাঁচা বেঁচে গেছি। সেই সময় কলকাতায় মারাত্মক গরম পড়ায়। ওই ভাইরাস গরম সহ্য করতে পারে না। যাক গে, আপনার অনেক সময় নিয়ে নিলাম শুভ্রদা। পরে একদিন এসে না হয় ভাইরাসের গল্প করা যাবে। ভাইরাস ছড়ালে তো আপনাদের মতো মানুষেরই লাভ বেশি।"

pathagar.net

সাগ্নিক উঠে পড়ায় অন্য দু'জনও উঠে দাঁড়াল। দীপ বলে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আপনার ডিসিশনটা তো জানালেন না?"

"একটু ভাবার সময় দাও আমায়। সাগ্নিক, তোমার কনটাক্ট নাম্বারটা আমার কাছে রেখে যাও। পরে যোগাযোগ করব।"

পার্স থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে সাগ্নিক দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। এই ছেলেটাকে আমার দরকার। মনের মধ্যে একটা প্ল্যান খেলে গেছে। পরে তা কাজে লাগাতে হবে। দরজাটা বন্ধ করে দোতলায় যাব ভাবছি, এমন সময় ফের ডোর বেলটা বেজে উঠল। এবার নিশ্চয়ই স্বপ্নময়। দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। না, লাভলি। পরনে নীল রঙের শাড়ি। গায়ে লাল রঙের শাল। চোখাচোখি হতেই শালটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল লাভলি। তারপর হেসে আমায় বলল, "পিসি আজ আসতে পারবে না শুভ্রদা। আমায় পাঠিয়ে দিল।"

কাল রাতে লাভলি আমার সামনে একবারও আসেনি। সারাক্ষণ কিচেনেই ছিল। গীতামাসিকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল। প্রায় ছয় বছর পর ওকে এই প্রথম সামনাসামনি দেখলাম। ওর কপালের ঠিক মাঝখানে বড় একটা লাল টিপ। জ্বলজ্বল করছে। সেদিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। শুনেছিলাম, লাভলির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুরের ছোঁয়া দেখতে পেলাম না।

গীতামাসি জানে, বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। লাভলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও, কেন ওকে একা পাঠাল বুঝতে পারলাম না। না, লাভলিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। ও বিবাহিতা। আমি চাই না, ফের কোনও ছেলেমানুষি করে ফেলি। তাই গম্ভীর হয়ে বললাম, "গীতামাসি এল না কেন রে?"

"নৃপেন ডাক্তারের চেম্বারে গেছে। পিসেমশাইকে নিয়ে।"

"তোর পিসেমশাইয়ের হয়েছেটা কী?"

"জানি না। পিসি তো বলল, কাল বাঙ্গুর হসপিটালে পিসেমশাইকে ভর্তি করতে হবে। আমাকে বলল, তুই কয়েকটা দিন আমার কাজটা করে দিস মা। মনা না আসা পর্যন্ত আমাকে তো হাসপাতালেই পড়ে থাকতে হবে।"

"তোকে পাঠানোর কী দরকার ছিল? ক'দিন না হয় আমি বাইরের খাবার এনে চালিয়ে নিতাম।"

ভাবলাম, কথাটা শুনে লাভলি একটু মুষড়ে পড়বে। কিন্তু ও হেসে বলল, "আমার হাতের রান্না একবার খেয়েই দেখুন না শুভ্রদা। ক্লাসিক তন্দুর-এর থেকে কোনও অংশে খারাপ হবে না।"

লেক গার্ডেন্সের মোড়ে ক্লাসিক তন্দুর বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে। লাভলি ভাল রকম জানে, ওখানকার খাবার আমার খুব পছন্দ। আগে প্রায়ই ওখান থেকে বোচান আমার খাবার এনে দিত। সে কথাটা তা হলে এখনও ওর মনে আছে। নাকি পুরনো কথা ও আমাকে মনে করে দিতে চাইছে। না, এ সব পাত্তা দেওয়া ঠিক নয়। আজ এসেছে, থাক। কিন্তু স্বপ্নময়ের সামনে যেন না বেরোয়। রাতে যাওয়ার সময় ওকে বলে দিতে হবে, একা আসার কোনও দরকার নেই। বললাম, "এখুনি আমার এক বন্ধু আসবে, বুঝলি। ও এলে তুই উপরে চলে যাস। ওর সামনে আসিস না যেন। আমরা এখন ড্রিঙ্কস নিয়ে বসব। ও চলে গেলে তোকে আমি ডেকে নেব।"

লাভলি ঘাড় নেড়ে কিচেনে ঢুকে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে এখন প্রায় এগারোটা। তা হলে কি স্বপ্নময় আজ আসবে না? এত বেলা তো হওয়ার কথা নয়। ওর মোবাইল ফোন নেই। ও এখন কোথায়, আদৌ ও আসবে কি না, তা জানার উপায় নেই। এখন একটা ইলেকট্রিক মিস্তিরির হাতেও মোবাইল থাকে। আমাদের বাড়িতে যে ছেলেটা লাইন ফাইন সারাতে আসে, তার হাতেও আমি মোবাইল ফোন দেখেছি। আর

Pathagar.net

স্বপ্নময় একজন অ্যাডভোকেট হওয়া সত্ত্বেও একটা মোবাইল নিতে পারল না। হয়তো হবু শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিয়েতে যৌতুক পাবে। নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের বিশ্বাস নেই।

"শুভ্রদা, কী খাবেন?"

স্বপ্নময়ের কথাই ভাবছি, হঠাৎ ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে এসে লাভলি প্রশ্নটা করল। গায়ে আলোয়ানটা নেই। শাড়ির আঁচল কোমরে টাইট করে বাঁধা। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলাম না। এখন অনেক ছিপছিপে হয়েছে। সেদিন টিভিতে নতুন একটা কথা শুনেছিলাম। দর্শকাম। মানে চোখ দিয়ে কাম অনুভব করা। লাভলিকে দেখার সময় মনে হল, শব্দটার সত্যিই মানে আছে।

বললাম, "কী খাব মানে?"

"যা খেতে চাইবেন। চাইনিজ, মোগলাই, সাউথ ইন্ডিয়ান।"

"তুই সব পারিস নাকি? এত সব শিখলি কোথায়, লাভলি?"

"এক বছরের একটা কোর্স করেছি। সল্ট লেকের একটা স্কুল থেকে। ফ্রিজে চিকেন আছে। কিছু করে দেব?"

"তোর যা ইচ্ছে কর। কিন্তু তাড়াতাড়ি।"

"ঠিক আছে।"

"এই শোন, আমি ঘরে আছি। ফ্রিজ থেকে পরফের টুকরো আর দু'টো গ্লাস এনে দিয়ে যা।"

"এখনই দিচ্ছি।" বলেই লাভলি ভেতরে চলে গেল।

আমি উপরে উঠে এলাম। কাল স্কচের বোতলে অনেকটাই বেঁচে গেছে। আমার হয়ে যাবে। স্বপ্নময় এলে নতুন বোতল খুলতে হবে। মনে মনে ওকে গাল দিয়ে আমি ফের নীচে নেমে এলাম। একা একা ড্রিঙ্ক করতে আমার ভাল লাগে না। তবুও কাল করেছি। আজও করতে হচ্ছে। কী আর করা

pathagar.net

যাবে। লাভলিকে তো আমি বলতে পারি না, এই তুই আমাকে একটু সঙ্গ দে।

ঘরে ঢুকেই টিভিটা চালিয়ে দিলাম। সময় কাটানোর সব থেকে বড় হাতিয়ার। টিভিতে বাংলা হচ্ছে। এক ঘণ্টা অন্তরই খবর। মেদিনীপুরে পঞ্চায়েত ভোটের এতদিন পরও দুই পার্টির মধ্যে হানাহানি চলছে। নদিয়ার পার্টির এক নেতা পার্টি অফিসেই কোনও এক মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এর পর মুর্শিদাবাদের খবর। লালগোলায় অজানা জ্বরে মোট পাঁচশো শিশুর মৃত্যু। হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা বাচ্চাদের ছবি দেখানো হচ্ছে। সবাই গরিব পরিবারের। এক একটা বেডে দু'তিনটে করে বাচ্চা। তাদের ঘিরে আছে মায়েরা। এই একটু আগেই এদের নিয়ে সাগ্নিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

নিউজ রিডার বলছে, "পুণে থেকে আগত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজির দুই প্রতিনিধি আজ লালগোলার হাসপাতালে যান। তারা শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখে খুবই অসন্তুষ্ট। তাঁরা জানান, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম করণীয়— কিছুই করা হয়নি। সাংবাদিকদের কাছে মুখ না খুললেও, প্রাথমিক পরীক্ষার পর অজানা জ্বরে শিশু মৃত্যুর জন্য তাঁরা উর্ধ্বশ্বাসনালির সংক্রমণ ঘটানো কোনও অপরিচিত ভাইরাস অর্থাৎ আপার রেসপিরেটরি ভাইরাসকেই দায়ী করেন। দুই ভাইরোলজিস্ট আক্রান্ত শিশুদের রক্ত, সিরাম আর লালা সংগ্রহ করেন। এই দেহনমুনা পরীক্ষার পরই অজানা রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।"

সাগ্নিক তা হলে ঠিক কথাই বলে গেল। আমাদের অনেক আগে পুণের ভাইরোলজিস্টরা ওখানে পৌঁছে যাবে! টিভির পর্দায় ছবি দেখানো হচ্ছে। পুণের দুই ভাইরোলজিস্টকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সাংবাদিকরা। আর ওঁরা হাঁটতে হাঁটতেই বলছেন, "উই কান্ট সে এনিথিং রাইট নাউ।"

এরপর বাচ্চাদের মায়েদের ইন্টারভিউ দেখানো হচ্ছে। একজন মা বলছে, "সেই বেলা দশটার সময় হাসপাতালে বাচ্চাকে নিয়ে এসেছি। আখুনও ডাগদারবাবু আসেনি। বলচে বাচ্চাকে ডাগদারবাবুর চেম্বারে নে যাও। হাসপাতালে কিচু হবে না। দিদিমণিরা বলচে, কেন বাচ্চাকে হামের টিকা দাওনি। আমরা কোথা যাব?" পর্দায় মায়ের নাম দেখানো হচ্ছে— পরভিনা বিবি। বোঝাই যাচ্ছে, খুব গরিব পরিবারের। বাচ্চাটাও শীর্ণ, অপুষ্ট। ভাইরাস তো এদের কাবু করবেই।

টিভির পর্দায় চোখ ছিল বলে টের পাইনি, কখন লাভলি এসে বরফের টুকরো গ্লাস আর সোডার বোতল রেখে গেছে। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিলাম। তারপর বরফের টুকরো ফেলে একটা লম্বা চুমুক দিলাম। গ্রামের দিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার কী অবস্থা! ডাক্তাররা হাসপাতালেই আসে না। খবরে বলল, পুণের ভাইরোলজিস্টরা খোঁজ করার পর পড়ি মড়ি করে ডাক্তাররা তাঁদের চেম্বার থেকে ছুটে আসেন। যে সব বাচ্চা মারা গেছে, তাদের নাকি পোস্ট মর্টেমই করা হয়নি। চিকিৎসার সময় প্রত্যেকের এক্স-রে করা উচিত ছিল। হাসপাতালে এক্স-রে-র ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নাকি কারও এক্স-রে প্লেট পাওয়া যায়নি।

মরুক গে যাক। আমার কী? আমার ওষুধ বিক্রি হলেই হল। কথাটা ভাবা মাত্রই হুইস্কিতে চুমুক দিলাম। ইউরোপের কোনও দেশে এই ধরনের শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে শালা ডাক্তারদের পাছায় তিনটে করে লাথি মেরে লাইসেন্স কেড়ে নিত। জীবনে আর ডাক্তারি করতে দিত না। আমাদের অশিক্ষিতদের দেশ। এরকম ভাবেই চলবে। কেউ কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবে না। নিজের ফয়দার কথা ভাববে। আমিই বা শিশু মৃত্যু নিয়ে ভাবতে যাব কেন? আমিও আমার ফয়দার কথা ভাবি। মুর্শিদাবাদে আমার কোম্পানির ওষুধ বেশি বিক্রি

pathagar.net

হল কি না, কাল অফিসে গিয়েই খোঁজ নিতে হবে।

আজ অফিসে কথা হচ্ছিল বহরমপুরের এজেন্ট সুনীল ভকতের সঙ্গে। লোকটাকে আমার সুবিধের মনে হল না। সনৎ মণ্ডল বলে যে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সুনীল ভকত তার দিকে টেনেই কথা বলছিল। আমি যখন বললাম, আপনার দাদা কী কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন কোনও উত্তরই দিতে পারল না। ওকে ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখাতে বললাম। বলল, সেটা সঙ্গে আনেনি। আমাদের স্যালাইনের জন্য লোকটা মারা গেছে কি না, তা হলে তার প্রমাণ কী? জিজ্ঞেস করায় তখন সনৎ মণ্ডল লোকটা মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। লোকটা প্রথমে দু'লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছিল। আমি পঞ্চাশ হাজারে নামিয়ে আনলাম। তাতেই রাজি হয়ে গেল। পরে আমার আফসোস হল, কেন আমি আরও কম বললাম না?

আজই আমাদের চিফ কেমিস্ট অসীম বর্ধনের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি, স্যালাইনের ওই কেসটা নিয়ে। এই প্রথম আমি অফিসের কারও সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম। অসীমবাবু বললেন, "পেসেন্টের ডেথ সার্টিফিকেটে যদি লেখা থাকে কার্ডিও রেসপিরেটরি ফেলিওর ডিউ টু ইন্ট্রা ভেনাস ফ্লুইড, তা হলে আমাদের কপালে দুঃখ আছে। আপনি দেখুন, যে লোকটা মারা গেছে, তার পোস্ট মর্টেম হয়েছিল কি না। জেলার হাসপাতাল তো। ডাক্তাররা এ সব ঝামেলার মধ্যে যাবে না।"

অসীমবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের আই ভি এফ নিয়ে ডাক্তারদের কোনও সন্দেহ হলে, ফ্লুইডটা ওরা ড্রাগ কন্ট্রোলে পাঠাবে। সেখান থেকে কলকাতার সরকারি ল্যাবরেটরিতে আসবে। এখান থেকে রিপোর্ট যাবে। চার পাঁচ দিনের ধাক্কা। অত দিন ডেডবডি কেউ মর্গে ফেলে রাখতে চায় না। পেসেন্ট হিন্দু হলে তো কথাই নেই। মরা বাসি হলে

pathagar.net

গ্রামের দিকে কেউ পোড়াতেও নিয়ে যাবে না। আমারও কেবল মনে হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে ভাল করে খোঁজ নেওয়া দরকার। কোম্পানির এই অবস্থায় ওই কটা টাকাও আমার কাছে মূল্যবান।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অসীমবাবুর কথাই ভাবছি। হঠাৎই মেজাজটা খুব শরিফ হয়ে গেল। আরে, বাড়িতে বসে ছুটির দিন আয়েস করে মাল খাওয়ার সময় আমি অফিসের কথা ভাবব কেন? আমি মালিক। পয়সা দিয়ে লোক রেখেছি তা হলে কী জন্য? ওরা ভাবুক। মুকেশ আম্বানি ভাবেন? বা নাসলি ওয়াদিয়া? এই যে কয়েকদিন আগে কলকাতার রাস্তায় রিলায়েন্স কোম্পানির পাতা কেবল তারে একটা ছেলে মারা গেল, রিলায়েন্সের মালিক মুকেশ আম্বানি কি তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন? বিন্দুমাত্র না। তার জন্য মাইনে করা লোকজন আছে। তা হলে আমিই বা চিন্তা করতে যাব কেন? আমিও তো একটা কোম্পানির মালিক!

কথাটা মনে হতেই গ্লাসে এক পেগ হুইস্কি ঢাললাম। শালা, কালই অফিসে গিয়ে রবিনবাবুকে বলব, স্যালাইন কেলেংকারির যত ঝামেলা আপনি মেটান। না হলে আসুন। আপনাকে আমার দরকার নেই। কিন্তু রবিনবাবু কি পারবেন? মনে হয় পারবেন না। তা হলে কাকে এই দায়িত্বটা দেওয়া যায়? আমার কোম্পানিতে এমন কেউ নেই, যে এ সব কাজ করতে পারে। একটা অল্প বয়সী চটপটে ছেলেকে নিতে হবে। যার কাজ হবে পাবলিক রিলেশন করা। নাঃ, কালই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব কথা ভাবছি। এমন সময় মোবাইলে ফোন, "শুভ্রবাবু আছেন?"

অল্পবয়সী মেয়ের গলা। চিনতে পারলাম না। "কে বলছেন?"

"আমি ঊর্মি বলছি। কামাখ্যা মুখার্জির বাড়ি থেকে।"

"বাবাকে আজ সকালে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। মা আপনাকে জানিয়ে দিতে বললেন। তাই জানালাম।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মেয়েটা লাইন কেটে দিল।

দশ

সকালে অফিসে ঢোকামাত্রই রবিনবাবু এসে বললেন, "একটা লিগ্যাল নোটিস এসেছে আমাদের নামে।"

আর একটা দুঃসংবাদ। একটা ফাইলে চোখ বোলাচ্ছিলাম। সরিয়ে রেখে বললাম, "কেন?"

"আমাদের যারা র মেটেরিয়াল সাপ্লাই করেন, তাদের একজন পাঠিয়েছেন। আমাদের পেমেন্ট করার কথা ছিল একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে। আমরা করিনি।"

মেজাজটা গরম হয়ে গেল। বললাম, "কেন করা হয়নি দেখুন তো? কে রেসপন্সিবল? জেনে আমাকে এখুনি জানান।"

"শুভ্রবাবু, পেমেন্টের ব্যাপারটা দেখতেন কামাখ্যাবাবু। তা, তিনি তো আসছেন না গত কয়েকদিন।"

ভ্রুঁ কুঁচকে গেল। বললাম, "লিগ্যাল নোটিসে কী লেখা আছে? নোটিসটাই বা কোথায়? আমার কাছে নিয়ে আসুন।"

"এনেছি। এই দেখুন।" বলেই রবিনবাবু আমাকে একটা এনভেলপ এগিয়ে দিলেন। চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোম্পানির তরফ থেকে নোটিসটা পাঠিয়েছেন ওদের অ্যাডভোকেট। পড়ে বুঝলাম, ঠিক সময়ে পেমেন্ট না করায় আমাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ধরনের শর্ত আরোপ করা যায় কি না, তা জানতাম না। কিন্তু শর্তটা যখন

মেনেই আমরা মাল নিয়েছি, তখন পেমেন্ট করা উচিত ছিল। আমাদের দিনপিছু এক হাজার টাকা বাড়তি দিতে হবে।

হঠাৎই মনে পড়ল, শ্মশানে দাদুর দেহ দাহ করে বাড়ি ফেরার পর কামাখ্যাবাবু আমাকে দিয়ে কয়েকটা চেক সই করাতে চেয়েছিলেন। তখন আমি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলাম। সেই সময় রবিনবাবুর দিকে চোখ পড়ায় ঘাড় নেড়ে উনি আমায় সমর্থন করেছিলেন। দোষটা তো ওঁরই। এখন দোষটা উনি কামাখ্যাবাবুর উপর চালানোর চেষ্টা করছেন? আশ্চর্য! একটু কড়া গলাতেই বললাম, "আপনি এই কমপেনসেশনের ক্লজের কথা জানতেন?"

"না, জানতাম না।"

স্পষ্ট বুঝলাম, ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলছেন। কামাখ্যাবাবুর তো তা হলে কোনও দোষ নেই। রবিনবাবুর মতো লোকেরাই মনে হয় দাদুর কান ভারী করেছিলেন কামাখ্যাবাবু সম্পর্কে। একটু বিরক্তির সঙ্গে বললাম, "যান, সুবোধবাবুকে গিয়ে বলুন, পার্টির সঙ্গে কথা বলে একটা সেটেলমেন্টে আসতে।"

"আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।" বলে চেয়ার ছেড়ে ওঠার নাম করলেন না রবিনবাবু। বললেন, "লালবাগে আমাদের আই ভি এফ নিয়ে শুনলাম, একটা প্রবলেম হয়েছে?"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"কী করে জানলাম? অসীমবাবু যেন কাকে তখন বলছিলেন।"

pathagar.net

কথাটা শুনে বিশ্বাস হল না। কেমিস্ট অসীমবাবু এসব কথা কারও সঙ্গে আলোচনা করার মানুষ না। উনি কাজপাগল। নিজের কাজ নিয়েই মশগুল থাকেন। বললাম, "না, কোনও প্রবলেম হয়নি। আপনাকে যেটা করতে বললাম, সেটা করুন।"

ফের ফাইলে মন দিলাম। দিনে কত প্রোডাকশন হয়, তা জানার জন্য একটা রিপোর্ট চেয়েছিলাম অসীমবাবুর কাছে। সেটা উনি দিয়ে গেছেন। তাতেই চোখ বোলাতে শুরু করলাম। ট্যাবলেট ইউনিট দিনে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করে। ক্যাপসুল তৈরি হয় দিনে কুড়ি হাজার। ইন্ট্রা ভেনাস ফ্লুইড মাত্র চার হাজার। এর মধ্যে স্যালাইন ছাড়াও ডেক্সটোজ আছে। অয়েন্টমেন্ট তৈরি হয় মাত্র তিন হাজার করে। পাউডার আরও কম। মাত্র আড়াই হাজার ইউনিট। এটা দু'হাজার এক থেকে দু'হাজার দুইয়ের হিসেব। তার আগের বছর প্রতিটা ইউনিটে অনেক বেশি প্রোডাকশন হয়েছে। বুঝতে পারলাম না, গত বছর কমে গেল কেন?

অসীমবাবুকে ফোনে ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকলেন সুবোধ বাগচী। বললেন, "বাঙ্গালোরের জি কে সেলস ইন্টারন্যাশনালস কোম্পানির লিগ্যাল নোটিসটা কি আপনি দেখেছেন? প্লিজ, রবিনবাবুকে নাক গলাতে মানা করুন। যা করার আমি করছি।"

ভদ্রলোক সোজাসাপটা কথা বলেন। বললাম, "আপনি বসুন।"

সুবোধবাবু চেয়ারে বসেই বললেন, "শুনলাম, আপনি দায়িত্বটা রবিনবাবুর উপর দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত কোনও দায়িত্বই উনি ভালভাবে পালন করতে পারেননি। সেটা আপনাকে জানানো উচিত।"

"আপনি এত উত্তেজিত হয়ে গেলেন কেন?"

"হব না? উনি আমার সঙ্গে ইনসাল্টিং টোনে কথা বললেন কেন? আসলে আমার উপর চটেছেন, টয়লেট রিনোভেশনের জন্য ওঁর আনা কনট্রাক্টরকে আমি বাতিল করে দিয়েছি বলে। আমি সব বুঝি।"

"একটা কথা বলুন তো। আগের বছরের তুলনায় গত বছর আমাদের প্রোডাকশন এত কমে গেল কেন?"

"সিম্পল। কেনার লোক নেই বলে। হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর অনিল মজুমদারের বিরুদ্ধে দলবাজি করতে গেছিলেন রবিনবাবু। ব্যাপারটা জানতে পেরে উনি আমাদের কোম্পানির মেডিসিন কেনা প্রায় বন্ধই করে দেন। একটা হিউজ কোয়ান্টিটি গোডাউনে পড়ে থাকে। শিবপ্রসাদবাবু আতান্তরে পড়ে যান। এই ডিরেক্টর ভদ্রলোক যতদিন চেয়ারে থাকবেন, ততদিন আমাদের মাল গভর্নমেন্টের ড্রাগ স্টোরে ঢোকার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

"আমাকে তো রবিনবাবু এ সব কথা বলেননি?"

"বলবেন কী করে? দোষটা তো ওঁরই। উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে তখন শিবপ্রসাদবাবুর মাথাটা গরম করে দিলেন। অনর্থক জেদাজেদি।"

"কী করা যায় বলুন তো?"

"আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজে গিয়ে কথা বলুন। কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল অনিল মজুমদারের। আপনি যদি যান, তা হলে কামাখ্যাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

"কামাখ্যাবাবু হাসপাতালে। শুনেছেন?"

"তাই নাকি? আমাকে তো কেউ বলেননি?"

"পি জি-তে। আমাদের কি কিছু করা উচিত?"

"অবশ্যই। এই কোম্পানির জন্য উনি কী করেছেন, তা অন্য কেউ জানুক না জানুক, আমি জানি। ওঁকে এখুনি কোনও ভাল নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া উচিত। কোম্পানির খরচে।"

"তা হলে সে ব্যবস্থাটা করুন।"

"করছি। উঠি তা হলে। আপনি রবিনবাবুকে ডেকে মানা করে দিন, যাতে লিগ্যাল নোটিস নিয়ে উনি মাথা না ঘামান।"

সুবোধ বাগচী বেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট ফাইলেই মন বসাতে পারলাম না। নাহ, অনেক কিছু শেখার আছে। কর্মীদের কারও কথা পুরো বিশ্বাস করা উচিত না।

pathagar.net

একজন আর একজনকে পছন্দ করেন না। আমার কার্ন ভারী করছেন নিজের ফায়দা তোলার জন্য। এতে কোম্পানিরই ক্ষতি হচ্ছে। নিজেই অসীমবাবুর রিপোর্টটা সরিয়ে রেখে অন্য একটা ফাইল টেনে নিলাম।

আমেরিকার হাডসন কোম্পানির সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসার কথা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ওরা আমাদের একটা প্রোপোজাল দিয়েছিল। ওদের একটা খুব চালু ওষুধ আমাদের তৈরি করতে দেবে। সব টেকনিক্যাল নো হাউ ওদের। তার বদলে আমাদের একটা ওষুধ ওরা নেবে। ওরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে, আমাদের এই ওষুধটা হাঁপানি সারাতে অব্যর্থ কাজ দেয়। আমরা যদি রাজি হই, তা হলে ওদের লোক এখানে এসে কথাবার্তা বলতেও রাজি। এই চিঠিটার তারিখ দেখলাম, প্রায় ছয় মাস আগের। দাদু কী উত্তর দিয়েছিল, তার কোনও কপি ফাইলে রাখেনি। এমনও হতে পারে, দাদু কোনও উত্তরই দেয়নি।

আমাদের এই ওষুধটার নাম ব্রঙ্কল। ভেষজ ফর্মুলা দিয়ে তৈরি করেছিলেন দাদুর বাবা। দাদুর মুখে শুনেছি, উনি ডাক্তার ছিলেন। স্বাধীনতার ঠিক পরেই কলকাতায় একবার দাঙ্গা হয়েছিল। তখন বেলেঘাটায় এসেছিলেন মহাত্মা গাঁধী। দাদুর বাবা গাঁধীজিকে দেখে গাড়ি চালিয়ে বেলগাছিয়ার বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। রাজাবাজারের পাশ দিয়ে আসার সময় কে যেন গাড়ি লক্ষ করে সোডার বোতল ছোড়ে। দাদুর বাবার চোখে কাচের টুকরো ঢুকে যায়। পরে চোখ নিয়ে ওঁকে অনেকদিন ভুগতে হয়েছিল। সেই সময় বাড়িতে বসে উনি এই ব্রঙ্কল ওষুধটা তৈরি করেন। দাদুকে উনি বলেছিলেন, যদি আর কোনওদিন চেম্বারে বসতে পারেন, তা হলে এই ওষুধ বিক্রি করেই নাকি সংসার চালাবেন।

দাদুর বাবার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে ডাক্তারি করা উনি ছেড়ে দেন। একটু আধ্যাত্মিক প্রকৃতির

হয়ে গেছিলেন। তাই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে খুব যাতায়াত শুরু করেন। বরানগরে এই ফ্যাক্টরিতে তখন আমাদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। দাদুর বাবা বেলগাছিয়ার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে পুরো পরিবার নিয়ে বরানগরে চলে আসেন। হাঁপানির এই ওষুধ তৈরি করে খুব অল্প দামে বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। ওষুধটা এত কাজ দেয়, হাঁপানির রোগীরা এসে লাইন দিয়ে ব্রঙ্কল কিনে নিয়ে যেতে থাকেন। এসব কথা আমি দাদুর মুখে শুনেছি। এখনও ব্রঙ্কলের ভাল চাহিদা। ভাল প্যাকেজিং করে স্বচ্ছন্দে বিদেশের বাজারে রফতানি করা যেতে পারে। হাডসন কোম্পানি কি আর এমনি এমনি আমাদের ওষুধটা চেয়েছে? ভাল করে খোঁজখবর নিয়েই দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

দাদু বেঁচে থাকতে যখন এই অফিসে এসে ফাঁকিবাজি মারতাম, তখন মাঝে মধ্যে সময় কাটানোর জন্য মেডিকেল জার্নালগুলো উল্টেপাল্টে দেখতাম। সেই সময় একটা খবরে দেখেছিলাম, সারা বিশ্বের লোক মূলত চারটে রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এক নম্বরে মানসিক রোগ। তারপরই ডায়েবেটিস, হাইপার টেনশন। এবং অ্যাজমা অর্থাৎ হাঁপানি। ওষুধের কোম্পানিগুলো এই ধরনের রোগের প্রতিষেধক বের করেই বেশি রোজগার করে। ওদের সামর্থ্য আছে, তাই নতুন নতুন ওষুধ বের করার জন্য রিসার্চে প্রচুর টাকা ঢালতে পারে। আমাদের মতো কোম্পানির সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমার হাতে যখন একটা ভাল ওষুধ আছে, সেটাকেই আমি মার্কেটিং করব না কেন?

ফাইলে চোখ বোলাতে বোলাতেই কথাগুলো মনে হতে লাগল। হঠাৎ দরজা খুলে উঁকি মারলেন মিসেস ব্যানার্জি। "স্যার, একবার আসব?"

"আসুন।"

"আপনার সঙ্গে মনা বলে একটি ছেলে দেখা করতে

এসেছে। ওর সঙ্গে আরও দু'জন আছে। বলছে, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার।"

ওহ, মনা তা হলে ফিরে এসেছে? তাড়াতাড়ি বললাম, "এখুনি পাঠিয়ে দিন। আর হ্যাঁ শুনুন, ওরা যতক্ষণ আমার ঘরে থাকবে, ততক্ষণ অন্য কাউকে ঢুকতে দেবেন না। যত আর্জেন্ট কাজ নিয়েই আসুক।"

"ওকে স্যার।" বলেই দরজাটা পুরো খুলে দিলেন মিসেস ব্যানার্জি। ঘরের ভেতর ঢুকে এল মনা। ওর পিছনে আঠারো উনিশ বছরের একটা ছেলে। এবং মাঝবয়সী একটা লোক। ছেলেটা কে, বুঝলাম। কিন্তু লোকটা? পরনে ময়লা ধুতি। কিন্তু হাফ হাতা শার্ট বেশ পরিষ্কার। এক নজরেই বোঝা যায়, গ্রাম থেকে আসা। লোকটা দু'হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে নমস্কার করল। এদের নিয়ে সোজা ওর বাড়িতে চলে যেতে বলেছিলাম। তবুও মনা কেন যে এখানে নিয়ে এল, বুঝলাম না। বললাম, "বোস। কী হল বল।"

"শুভ্রদা এই ছেলেটা অনাদি মণ্ডলের ছেলে। এর বাবাই ..."

"আমাদের কথায় রাজি?"

"হ্যাঁ। একেবারে জামাকাপড় নিয়ে চলে এসেছে। সকালে ট্রেন থেকে নেমেই এদের নিয়ে গেছিলাম আমাদের বাড়ি। তা বাড়িতে এখন কী হুলুস্থুলু কাণ্ড বুঝতেই পারছেন। তাই সোজা এখানে নিয়ে এলাম। সে যাক, এই ভদ্রলোকই সনৎ মণ্ডল। শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এসেছি।"

এই লোকটাই সনৎ মণ্ডল? মনা বলছে কী? তা হলে কাল সুনীল ভকত যাকে নিয়ে এলেন, সেই লোকটা কে? মনা, না হয় সুনীল ভকত, কেউ একজন আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। সেটা বুঝতে দেওয়া ঠিক হবে না। বললাম, "ডেথ সার্টিফিকেট সঙ্গে আনতে বলেছিলাম। সেটা এনেছিস?"

মনা বলল, "সেটা আমি আগেই ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। এই নিন।" খামের ভেতর থেকে ডেথ সার্টিফিকেটটা খুলে পড়তে লাগলাম। না, কোথাও লেখা নেই, আমাদের স্যালাইনের দোষে পেশেন্ট মারা গেছে। বুক থেকে একটা প্রচণ্ড ভার নেমে গেল। উফ্, এ ক'টা দিন যে কীভাবে কেটেছে আমার! সার্টিফিকেটটা ফের একবার পড়ে ফেললাম। হঠাৎ মনে হল, সার্টিফিকেটটা যদি জাল হয়? ওপরে অবশ্য লেখা আছে, বহরমপুর জেনারেল হসপিটাল। তলায় ডাক্তারের সইটাও স্পষ্ট পড়ে ফেললাম। ডাঃ অবনী চৌধুরী। এরা চাষাভুষো লোক, ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেটের কথা এদের মাথায় আসবে? মনে হয় না।

তার মানে সুনীল ভকত লোকটাই দু'নম্বরি। ফালতু একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। যাতে ক্ষতিপূরণের টাকার কিছুটা ঝেড়ে দেওয়া যায়। তাই কাল দুপুরে অত পীড়াপীড়ি করছিল, "স্যার, যা করার আজকেই করে নিন। টাকাটা দিয়ে দিন, যাতে এদের মুখ আর দেখতে না হয়। বহরমপুরে আমার খুব বদনাম হয়ে গেছে স্যার।" দাঁড়াও, টাকা দেওয়াচ্ছি। ভুয়ো লোকটাকে নিয়ে সুনীল ভকতের আসার কথা আজ বিকেল পাঁচটার সময়। তখন লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে। আর সুনীল ভকত লোকটাকেও আমি ছাড়ব না। ওর এজেন্সি বাতিল করে দেব। আমি চাই না, এ রকম লোকের সঙ্গে আমার কোম্পানির কোনও সম্পর্ক থাক।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মনাকে বললাম, "তুই এক কাজ কর। আমাদের এখানে ক্যান্টিন আছে। সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নে। তারপর এদের নিয়ে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে যা। বাড়িতে বোধহয় তোর লাভলিদি আছে। ওকে আমার নাম করে বলবি, ছেলেটা আমি পাঠিয়েছি। একে বাহাদুরের ঘরে থাকতে দিবি। পরে আমি দেখছি, ফ্যাক্টরিতে কোথায় একে ফিট করা যায়।"

"ক্যান্টিনটা কোথায় শুভ্রদা?"

"তোদের দেখিয়ে দেবে। বাইরে যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন, তাকে গিয়ে বল। উনিই তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর শোন, রাতের দিকে একবার এসে খবর দিয়ে যাস, তোর বাবা কেমন আছে?"

তিনজন বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হল, ব্যবসার দুনিয়াটাই কি এরকম? প্রতি পদে পদে লোককে সন্দেহ, অবিশ্বাস করে আমাকে চলতে হবে এখন থেকে? বহুদিন আগে স্বপ্নময় আমাকে একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। "জীবনে কোনও লোককে প্রথমেই বিশ্বাস করে ফেলবি না। তা হলে ঠকবি। প্রথমে বিশ্বাস করে ঘা খাওয়ার পর থেকে, প্রথমে অবিশ্বাস করে তারপর ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করা অনেক ভাল।" ব্যাটাচ্ছেলে মাঝে মধ্যে কিন্তু ভাল ভাল কথা বলে। না, জীবনে আর কখনও কারও মুখ দেখে, তাকে বিশ্বাস করে বসব না। যা করে বসেছিলাম, রবিনবাবু অথবা সুনীল ভকতকে দেখে।

ফাইলে চোখ দিতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। নাহ, বারবার বাধা পড়ছে। সুইচ অন করতেই ও প্রান্তে পিসিমার গলা শুনতে পেলাম, "শুভ্র, একটা সুখবর আছে রে। তুই আজ জেঠু হয়ে গেলি রে।"

তার মানে টুবলুর ছেলে হয়েছে। পিসিমা খুব চিন্তায় ছিল গত কয়েকটা দিন। ইস, আমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল মাঝে। বললাম, "কোত্থেকে বলছ?"

"পি জি থেকে। এই তো বারোটা কুড়ি মিনিটে ডেলিভারি হল। না, পেট কাটতে হয়নি। নর্মাল ডেলিভারি। ছেলে আর ছেলের মা দু'জনেই ভাল আছে। টুবলু তো এখানে নেই। মুর্শিদাবাদ থেকে এখনও ফেরেনি। তোকেই খবরটা প্রথম দিলাম রে।"

বললাম, "বাহ, ভাল খবর।"

বোধহয় পাবলিক বুথ থেকে ফোনটা করেছে পিসিমা। খবরটা শুনে আমার মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। টুবলুও বাবা হয়ে গেল? রিঙ্কির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে, কে বলতে পারে এতদিনে আমিও বাবা হয়ে যেতাম না? রিঙ্কিকে আমি নিশ্চয়ই হাসপাতালে পাঠাতাম না। আমাদের বাচ্চা জন্ম নিত হয় উডল্যান্ডস, না হয় কোনও বড় নার্সিং হোমে। আমি নিশ্চিত, এই পিসিমাই হয়তো সারাদিন তখন নার্সিং হোমে পড়ে থাকত।

ওপ্রান্ত থেকে পিসিমা বলল, "একবার আসবি শুভ্র? আয় না ভাইপোকে দেখতে। তুই এলে বৌমার বাড়ির লোকজন খুব খুশি হবে। তোর কথা এত বড় মুখ করে ওদের কাছে বলি। এই সময়টায় তুই একবার ঘুরে গেলে ওরা মনে করবে সত্যিই তোদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।" কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা ভারী হয়ে এল পিসিমার।

বললাম, "যাব পিসিমা। বাড়ি ফেরার পথে যাব।"

"আসিস বাবা। তা হলে আমার মুখরক্ষা হবে। জানিস, বাচ্চাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, তোর দাদু ফের ফিরে এল। কাকার ঘাড়ের কাছে একটা কালো রঙের জরুল ছিল। আমার নাতির ঘাড়েও জরুল আছে। দেখে চমকে উঠেছিলাম। তখনই বুঝলাম, কাকা পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারেনি। তুই এলেই দেখতে পাবি।"

শুনেই শরীরের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। এমনটা হয়? মানুষ মরে গেলে আবার জন্মাতে পারে? নাহ, বাচ্চাটাকে আজ দেখতে যেতেই হবে।

BanglaBook.org

বাড়িতে বসে ফাইলপত্র ওল্টাচ্ছি, এমন সময় লাভলি এসে বলল, "শুভ্রদা, আপনার সেই বন্ধুটা এসেছে।"

আজ তো কারও আসার কথা ছিল না! কে এল? জিজ্ঞেস করলাম, "কোন বন্ধুটা রে?"

"লম্বা মতোন। তোমার স্কুলের বন্ধু। ছোটবেলায় খুব আসত। তোমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলত গো। ওঁর সঙ্গে আরও একজন আছেন।"

লম্বা মতো কথাটা বলতেই বুঝতে পারলাম, স্বপ্নময়। কিন্তু ওর সঙ্গী লোকটা কে? স্বপ্নময়কে লাভলি চেনে। হয়তো নামটা ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রায় ছ'বছর পর ও এই বাড়িতে ফের এল। এর মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে। লাভলি প্রথম দু'তিন দিন আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলেছে। কথাবার্তায় একটু আড়ষ্টও ছিল। কাল থেকে দেখছি, তুমি করে বলছে। আগে অবশ্য তুমি করেই কথা বলত। ওকে এ বাড়িতে রেখে গীতামাসি সেই যে গেছে, তার আর কোনও পাত্তা নেই। মনার মুখে শুনলাম, ওর মা খালি বাড়ি আর হাসপাতাল ছোটাছুটি করছে। ওর বাবার পেটে এখনও অপারেশন হয়নি। কবে হবে, ডাক্তাররা কেউ কিচ্ছু বলেনি।

গীতামাসি কবে থেকে আসতে পারবে, সেটা অনিশ্চিত। না আসায় আমার অবশ্য কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। লাভলির হাতের রান্না খেয়ে বেশ আছি। মাঝে এক দিন কী দিয়ে যেন পাবদা মাছ রেঁধেছিল। এমন চমৎকার রান্না আমি জীবনে কখনও খাইনি। কাল থেকে লাভলি টিফিন কেরিয়ারে করে আমার জন্য লাঞ্চও পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাড়ি থেকে তা নিয়ে যাচ্ছে মনা। আমি তো ভাবছি, গীতামাসি ফিরে এলেও লাভলিকে আমি ছাড়ব না। অন্তত রান্না করার

জন্যও ওকে রেখে দেব।

লাভলি আমার উত্তরের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পিঙ্ক কালারের সালোয়ার- কামিজ। বেশ ভাল লাগছে ওকে দেখতে। ও এতদিন কোথায় ছিল, জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, গীতামাসি কেন ওকে নিয়ে এল? সত্যিই ওর কি বিয়ে হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তা হলে কেন ও গোবিন্দপুরে ফিরে এল? মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, আজ রাতে যখন লাভলি খেতে দেবে, তখন কায়দা করে ওর কাছে জেনে নিতে হবে, স্বামীকে ছেড়ে ও কেন চলে এল?

কোনও কথা বলছি না দেখে লাভলি জিজ্ঞেস করল, "আপনার বন্ধুগুলোকে কি ওপরের ঘরে নিয়ে আসব শুভ্রদা?"

"নিয়ে আয়। আর শোন, আমরা ড্রিঙ্কস নিয়ে বসব। মনা কি নীচে আছে" তা হলে ওকে পাঠিয়ে দে। ক্লাসিক তন্দুর থেকে কিছু কিনে আনুক।"

"মনা নেই শুভ্রদা। গোবিন্দপুরে আমাদের পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। সেখানে গেছে। আমাকে বলে গেল, শুভ্রদা যদি ডাকে তা হলে বলিস, বাড়ি চলে গেছি। আমি কি কিছু করে দেব? ফ্রিজে বোনলেস চিকেন আছে।"

"করে দে তা হলে।"

একটু পরেই দোতলায় উঠে এল স্বপ্নময়। সঙ্গী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, "শুভ্র, এ হচ্ছে আমার সেই দাদা। ধ্রুব মল্লিক। যে আমেরিকায় থাকে। তুই সেদিন ধ্রুবদার খোঁজ করেছিলি। তাই নিয়ে এলাম।"

বললাম, "ভাল করেছিস। আয় বোস। স্কচ আছে। বের করছি। অনেকদিন তোর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারা হয়নি।"

স্বপ্নময় ডিভানের উপর উঠে বসল। ধ্রুব মল্লিক উল্টো দিকের সোফায় বসলেন। তার পর বললেন, "আমাকে খোঁজ করছিলেন কেন শুভ্রবাবু?"

pathagar.net

"বলছি, এত তাড়া কীসের?"

ঠিক এই সময় একটা ট্রে-তে করে লাভলি তিনটে গ্লাস, সোডার বোতল আর আইস বক্স নিয়ে এল। টেবলের উপর রেখে বলল, "একটা কথা বলতে ভুলে গেছি শুভ্রদা। তুমি বাড়িতে ঢোকার ঠিক আগে পি জি হাসপাতাল থেকে একটা ফোন এসেছিল। ফোনটা করেছিলেন সুবোধ বাগচী।"

বিকালে সুবোধবাবুর সঙ্গে আমার হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। কামাখ্যাবাবুকে দেখতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কী একটা কাজে আটকে যাওয়ায় এক সঙ্গে বেরোতে পারিনি। টুবলুর ছেলেকে দেখার জন্য যখন পি জি-তে গেলাম তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা। ওখানে কথা বলতে বলতে সাতটা বেজে গেল। তাই কার্ডিয়াক ওয়ার্ডে যেতেই পারলাম না। ঠিক বুঝতে পারলাম না, হাসপাতাল থেকে ফিরে সুবোধবাবু কেন হঠাৎ ফোন করলেন? রাতে একবার ফোন করতে হবে ভদ্রলোককে। তাই লাভলিকে বললাম, "ঠিক আছে, তুই যা।"

স্বপ্নময় হাঁ করে লাভলির যাওয়া দেখছে। তার পর চোখ ফিরিয়ে আমায় বলল, "শুভ্র, এই সেই মেয়েটা না? আগে তোদের বাড়িতে ফ্রক পরে ঘুরত? ব্রেস্ট দু'টো বড় বড় লাগত। কী নাম যেন রে? এখন তো দেখে ভদ্রঘরের বলে মনে হচ্ছে।"

কথাটা শুনে ধ্রুব মল্লিক বললেন, "মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ভোম্বল। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভদ্রঘরের মেয়ে? মেড বলে কি মেয়েটা ভদ্রঘরের না?"

স্বপ্নময়ের ডাক নাম যে ভোম্বল, তা ভুলেই গেছিলাম। নর্থ ক্যালকাটার বাপ মায়েরা কি ভাল কোনও নাম খুঁজে পায় না? লাভলিকে নিয়ে দুই তুতো ভাইয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। আমি গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে শুরু করলাম। স্বপ্নময়কে বড় পেগ দেওয়া যাবে না। তা হলে প্রথম পেগেই ও

অতিরিক্ত ভাল ছেলে হয়ে যাবে। ধ্রুব মল্লিক বিদেশে থাকে। তাঁকে একটা লার্জ দেওয়া যায়।

"ধ্রুবদা, আ মেড ইজ আ মেড, অলওয়েজ আ মেড। তাকে আমাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিও না।"

ধ্রুব মল্লিক বললেন, "এ দেশে বসে কথাটা বলছিস, তাই পার পেয়ে গেলি। পড়তিস আমেরিকার মতো দেশের পাল্লায়। এই কথাটা বলার জন্য তোর পানিশমেন্ট হয়ে যেত। জানিস, আমার বাড়িতে যে মেক্সিকান মেয়েটা কাজ করে, সে গাড়ি চালিয়ে আসে? সেই গাড়ি তুই জীবনেও চড়তে পারবি না। কাজের পর যখন সে ডিক্সোথেক-এ যায়, তখন তাকে চিনতেই পারবি না। শোন, আমেরিকা দেশটা এত বড় হয়েছে কেন জানিস? ওখানে কোনও কাজই কেউ নিচু বলে মনে করে না।"

"ছাড়ো তো আমেরিকার কথা..."

স্বপ্নময় কী যেন যুক্তি দেখাতে যাচ্ছিল, আমি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতেই থেমে গেল। তিন জনের হাতে গ্লাস। 'চিয়ার্স' বলে চুমুক দিলাম। প্রথম চুমুকের পরই স্বপ্নময় লাভলির কথা ভুলে গিয়ে বলল, "তোর মনে আছে শুভ্র, কলেজে পড়ার সময় প্রায়ই তোর ঘরে বসে লুকিয়ে আমরা মাল খেতাম? তুই দরজা বন্ধ করে দিতি। একদিন তোর দাদু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এসেছিল। উপায় না দেখে তখন আমরা বাথরুমে ঢুকে পড়ি?"

মনে আছে। সব মনে আছে। বললাম, "সে দিন গীতামাসি কায়দা করে আমাদের না বাঁচালে আমরা কিন্তু দাদুর কাছে ধরা পড়ে যেতাম।"

"তোদের সেই বয়স্ক কাজের মহিলাটি এখন নেই?"

ধ্রুব মল্লিক এ বারও কড়া চোখে তাকালেন স্বপ্নময়ের দিকে। পাছে ' কাজের মহিলা' কথাটা নিয়ে দুই ভাইয়ে ফের তর্কাতর্কি শুরু হয়, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,

"আছে। কয়েকদিন ছুটি নিয়েছে। যাক গে, কাজের কথা বলি। ধ্রুববাবু, আপনি তো শুনেছি, বিজনেস কনসালট্যান্ট। আমার একটা ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে। দাদু মারা যাওয়ার পর সবে আমি সেই কোম্পানির হাল ধরেছি। কোম্পানিটা আরও বড় করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

ধ্রুব মল্লিক বললেন, "কেন পারব না? এটাই তো আমার কাজ। কিন্তু এখানে ওয়ার্ক কালচারের যা নমুনা দেখলাম, তাতে কিছু করা মুশকিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আমাকে কিছু কাজ দিয়েছিল। সেটা করতে গিয়ে আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখানে বিজনেস এনভায়রনমেন্টটাই নেই।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"এই তো কয়েকদিনের জন্য হায়দরাবাদ আর বাঙ্গালোর গেছিলাম। কলকাতার সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত। কী ফাস্ট গ্রো করছে ওরা। যাক গে, আক্ষেপ করে লাভ নেই। আপনি কী ধরনের সাহায্য চান, বলুন। আমাকে কিন্তু প্রচুর ডাটা সাপ্লাই করতে হবে আপনাকে।"

"সে তো করবই। আপনি কবে আমার ফ্যাক্টরিতে আসবেন, বলুন?"

"আপনি বললে কালই যেতে পারি। আমেরিকায় যাওয়ার আগেই আমি আপনার কাজটা করে দিতে চাই।"

"আমেরিকার দু'-একটা কোম্পানি আমাদের সঙ্গে কোলাবরেশনে বিজনেস করতে চাইছে। আসলে দাদুর সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করেছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ওদের সঙ্গে বিজনেস করব কি না?"

" কী কোম্পনি বলুন তো?"

"একটা হাডসন, অন্যটা র‍্যাডক্লিফ।"

"বুঝেছি, ডিট্রয়েটের কোম্পানি। ওষুধ তৈরি করে। কিন্তু

ওদের খুব একটা সুনাম নেই। কিনিয়ায় একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল হাডসন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন পর্যন্ত গড়িয়েছিল কেসটা। হিউম্যান রাইটস কমিশনও চটেছিল ওদের উপর।"

"কেসটা কী বলুন তো?"

"অনেক ওষুধ আছে, যা আমাদের ওখানে ব্যানড। সেগুলোই ওরা থার্ড ওয়ার্ল্ডে চালানোর চেষ্টা করে। যেমন কিনিয়ায় করেছিল। তবে আপনাদের সঙ্গে হাডসনের কী ধরনের করেসপন্ডেন্স হয়েছে, সেটা না দেখে কোনও মন্তব্য করা আমার উচিত হবে না।"

এবার স্বপ্নময় বলল, "ঠিক বলেছিস দাদা, এটা ঠিক হবে না।"

কথাটা শুনে স্বপ্নময়ের গ্লাসের দিকে তাকালাম। প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার থেকে ও কী কী বলবে, আমি জানি। সব ব্যাপারেই আমাদের সঙ্গে এক মত হবে। মনে মনে হেসে ওর গ্লাসে আরও এক পেগ ঢেলে দিলাম। আমি জানি, দ্বিতীয় পেগ গলাধঃকরণ করার পর ও গুম হয়ে যাবে। তখন ওর বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলব। নর্থ ক্যালকাটার ছেলেরা প্রেম করার সময় চুটিয়ে প্রেম করবে। কিন্তু বিয়ের সময় শালা বাবা-মায়ের বাধ্য ছেলে। স্বপ্নময়টাকে আজ ছাড়ব না। তিন নম্বর পেগটা খাইয়ে মনে যা আসে বলে দেব। আপাতত ধ্রুববাবুকে বললাম, "ওষুধের দুনিয়ায় ঢুকে এখন মনে হচ্ছে, সর্বত্র যেন ভাইরাস ছড়িয়ে রয়েছে।"

pathagar.net

একটা লম্বা চুমুকে গ্লাস খালি করে দিয়ে ধ্রুব মল্লিক বললেন, "কথাটা মন্দ বলেননি ভাই। ব্যবসা করতে নেমেছেন তো, প্রতি পদে পদে বুঝবেন। যাক গে, ছাড়ুন ও সব কথা। ভাই বলছিল, আপনার নাকি প্রচুর গার্লফ্রেন্ড?"

স্বপ্নময়টা তো আচ্ছা খচ্চর ছেলে! আমার নামে ধ্রুব মল্লিককে এ সব কথা বলেছে? দেব নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙে?

ও যে আমাদের সঙ্গে একবার সোনাগাছিতে গেছিল, বলে দেব? কড়া চোখে স্বপ্নময়ের দিকে তাকালাম। মিটিমিটি হাসছে। এখন আমি যদি ওকে বলি, তুই একটা উল্লুক, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিয়ে বলবে, "তুই ঠিকই বলেছিস রে শুভ্র। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি একটা উল্লুক।" নাহ, সে সুযোগ ওকে দেব না। ধ্রুব মল্লিক আমেরিকায় থাকেন। ওখানে যে ছেলের গার্লফ্রেন্ড থাকে না, লোকে ভাবে তার অন্য কোনও দোষ আছে। একটু চালিয়াতি মেরেই বললাম, "আছে। বেশ কিছু আছে।"

শুনে ধ্রুব মল্লিক বললেন, "তা হলে এখানে বসে আমরা করছিটা কী? কল সাম অব দেম। লেট আস গো সামহোয়ার অ্যান্ড হ্যাভ সাম ফান। এই ভর সন্ধেবেলায় বাড়িতে বসে ড্রিঙ্ক করার কথা আমরা ওখানে ভাবতেও পারি না।"

দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই সন্ধেবেলায় অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি। ক্লাব বা হোটেলে যেতে ইচ্ছেই করেনি। ধ্রুব মল্লিকের কথা শুনে রক্তটা চনমন করে উঠল। তন্ত্র বা ইনসোমনিয়ায় ভদ্রলোককে নিয়ে গেলে হয়? বললাম, "আই ডোন্ট মাইন্ড।"

কিন্তু বাগড়া দিল স্বপ্নময়। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "দাদা, এই শুভ্রর একটা গার্লফ্রেন্ড আছে, রিঙ্কি। কিউট। অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি ভেরি সেক্সি।"

ধ্রুব মল্লিক বললেন, "তা হলে তাকে ডাকা। দেখে চক্ষু সার্থক করি।"

রিঙ্কির কথা তোলায় আমি স্বপ্নময়ের দিকে কটমট করে তাকালাম। পেটে একছত্র মাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে কথা ফুটেছে। শালা রিঙ্কিকে ডাকতে বলছে। আহ্লাদ। উঠে গিয়ে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করল। কিন্তু রাগটা সংবরণ করলাম। ওর দাদার সামনে মেজাজ দেখানো ঠিক হবে না। বিশেষ করে আমার বাড়িতে বসে। বললাম, "রিঙ্কি এখন মুম্বইয়ে।

pathagar.net

ওর পক্ষে আসা সম্ভব না। তবে বাইরে যদি যেতে চান, তা হলে পার্ক হোটেলের তন্ত্রতে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে আমার একটা ঠেক আছে।"

"আমি ভাই কোথাও নড়ছি না।" স্বপ্নময় বলল, "তুই একটা কাজ করতে পারবি ভাই? তোদের মেড মেয়েটাকে একবার এখানে আসতে বল। আমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।"

আর ঠিক তখনই লাভলি একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রে-র উপর তিনটে বড় বড় প্লেট। চিকেনের কোনও প্রিপারেশন করেছে বোধহয়। ধোঁয়া উঠছে। কালও আমাকে করে দিয়েছিল। দারুণ। প্লেটের দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, "ধ্রুববাবু, একবার খেয়ে দেখুন। স্বাদ জিভে লেগে থাকবে।"

"তাই নাকি। তা হলে দেখি।" বলেই চামচে করে বোনলেস চিকেনের একটা টুকরো মুখে দিয়েই ধ্রুব মল্লিক বলে উঠলেন, "সুপার্ব।"

স্বপ্নময়ও প্লেট থেকে একটা টুকরো তুলে মুখে চালান করে দিয়ে বলল, "তুই ঠিক বলেছিস রে দাদা।"

ওদের দু'জনের কথা শুনে লাভলির মুখে এক টুকরো হাসি। দেখে আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। হাসির মধ্যেও কি যৌনতার ছোঁয়া থাকে? থাকে বোধহয়। আগে কখনও লক্ষ করিনি। মনে হল, স্বপ্নময়রা চলে যাওয়ার পরও যদি লাভলি এ বাড়িতে থাকে তা হলে ওর কপালে দুঃখ আছে। নাহ্, এ দু'জনের চোখের সামনে ওকে বেশিক্ষণ রাখা ঠিক না। মালের ঘোরে কখন কী বলে বলবে, কে জানে? চোখের ইশারায় তাই লাভলিকে চলে যেতে বললাম।

ফের লাভলির চলে যাওয়া ঘোর চোখে দেখতে লাগল স্বপ্নময়। ধ্রুব মল্লিকের মধ্যে কোনও বিকার নেই। আমাকে বললেন, "এই মেয়েটার যা রান্নার স্কিল দেখলাম, একে যদি

আমেরিকায় নিয়ে যাই ভাই, তা হলে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। শী উইল আর্ন আ লট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ট্রু।"

বললাম, "ভিসা পাবে?"

"কারও বউ ফউ বলে কায়দা করে নিয়ে যেতে হবে। বোস্টনে আমার এক নেবার আছে, ডাঃ নিখিল পাল। বউয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় কলকাতা থেকে একজন মেড-কে নিয়ে গেছিল। মাস ছয়েকও নিজের কাছে রাখতে পারল না। মেয়েটা এখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। একজন মাল্টিমিলিয়নার বাংলাদেশির বাড়িতে কিচেন সামলায়। রোজগার কত জানেন? পার মান্থ তিন হাজার ডলার। এখানকার টাকায় দেড় লাখেরও বেশি।"

"আপনার বাড়িতে কে কে আছেন মিঃ মল্লিক?"

"কল মি ধ্রুব। অত ফর্মালিটি করার কোনও দরকার নেই। আমি এখন একলাই থাকি। একটা বিয়ে করেছিলাম। আমেরিকান মেয়ে। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার এখন স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে। পানামা-র মেয়ে। কখনও কখনও লিভ টুগেদার করি। এবারই আমার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় আসতে চেয়েছিল। আমি আনিনি। রাগ করে ও চলে গেল ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডসে। অন্য একজনের সঙ্গে।"

"ওকে আনলেন না কেন?"

"মাথা খারাপ? ভোম্বলের জ্যাঠা.... মানে আমার বাবা তা হলে বাড়িতেই ঢুকতে দিত না। এখানে এত ছুতমার্গ। আমি তো মশাই হাঁফিয়ে উঠেছি। সারাদিন কাজকর্মের পর যদি একটু নারীসঙ্গই না পেলাম, তা হলে জীবনের মজাটাই তো শেষ।

স্বপ্নময় এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে দিয়ে এ বার বলে উঠল, "তুই ঠিক বলেছিস দাদা। এখানকার বাবা-জ্যাঠাগুলো খুব কনজারভেটিভ।"

ধ্রুব মল্লিক এবার ধমকে উঠলেন, "তুই থাম। আর বীরপুরুষি দেখাসনি। তোকে এত করে বললাম, চল আমেরিকায় চল। লাইফ কাকে বলে দেখবি। শুনলিই না। এখন বিয়ে করছিস গোয়াবাগানের মুটকি একটা মেয়েকে। সেক্স কী, ভুলে যাবি। ওই রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করতে তুই রাজি হলি কেন, সেটাই আশ্চর্যের।"

স্বপ্নময় মিনমিন করে বলল, "আমি কী করব বল। বাবা চাপ দিল যে।"

"বুঝবি। পরে বুঝবি। বউ যখন ঘাড় থেকে নামতে চাইবে না, তখন এই ধ্রুব মল্লিকের কথা মনে বাড়বে।"

দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনছি। আর খুব হাসি পাচ্ছে। ধ্রুব মল্লিককে আমার বেশ ভাল লাগছে। স্বপ্নময় এবার পরামর্শ চাইছে, "তুই একটা পরামর্শ দে দাদা। তুই ঠিক বলেছিস। মেয়েটা মুটকিই। একবার হ্যাঁ বলে দিয়েছি। এখন না বললে বাবা খুব চটে যাবে।"

"দূর হারামজাদা। বিয়েটা কি তোর বাবা করবে? বাবাকে গিয়ে বল, মেয়েটাকে ওজন কমাতে বলুন। না হলে বিয়ে করা সম্ভব না।"

কথাটা শুনে গুম হয়ে গেল স্বপ্নময়। আমি জানি, ওর পক্ষে এ সব কথা বলা সম্ভবই না। বলতে গেলে ওর বাবা ওকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। বিয়ে করার পর স্বপ্নময় যদি কোনও কেপ্ট রাখে, তা হলে ওর বাবা খুশি হবে। কিন্তু কিছুতেই এই বিয়ে ভেঙে দিতে রাজি হবে না। নর্থ ক্যালকাটার এই সব বুড়োদের আমি ভালমতো চিনি। যাক গে, এটা স্বপ্নময়ের সমস্যা। আমার না। আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন এ সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে?

ধ্রুব মল্লিক গল্প জুড়েছেন আমেরিকার। নারীসঙ্গের রোমাঞ্চকর গল্প। শুনতে শুনতে মনে হল, কেউ কম যায় না। লোকটা অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে কখন কোথায় কী করে

এসেছে। প্রায় আমারই মতো অভিজ্ঞতা। আমি কিন্তু সে সব গল্প কাউকে করতে পারব না। কাউকে বলতে পারব না, একটু আগে যে মেয়েটাকে দেখে দুই ভাই উত্তেজিত হল, আজ থেকে ছ'বছর আগে এক দুপুর বেলায় প্রায় নির্জন বাড়িতে খানিকটা জোর করে তাকে ভোগ করেছিলাম। ওর শরীর নিয়ে খেলা করার সে-ই প্রথম দিন। মেয়েটা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু আমাকে বাধা দেয়নি, কোনও কথাও বলেনি। চুপচাপ সহ্য করে গেছিল আমার অত্যাচার।

আমার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা নির্যাস যখন ওর উরুর উপর টপটপ করে পড়ছিল, তখন ভয়ে, আতঙ্কে একদৃষ্টিতে ও সেদিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎই ওর সেই মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছাদে চিলোকোঠার ঘরে সেদিন লাভলি আধশোয়া। কয়েক সেকেন্ড পর এক বার ওয়াক করে উঠেছিল। হয়তো ওর গা গুলিয়ে উঠেছিল ঘন তরল সেই পদার্থের স্পর্শে। আমি তখন পায়জামায় দড়ি লাগানোয় ব্যস্ত। পাছে ও বমি করে ফেলে এবং সেই শব্দে নীচ থেকে কেউ উঠে আসে, সেই আশঙ্কায় মেঝেয় লুটিয়ে থাকা ফ্রকটা আমি লাভলির মুখে চেপে ধরেছিলাম।

এ সব কথা কোনও দিনই আমার মুখ থেকে বেরবে না। ওই ঘটনার পর লাভলি বেশ কিছুদিন আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। কিন্তু আমি তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ। সুযোগ বুঝে ফের একদিন ড্রয়িংরুমের সোফাতেই জোর করে ওকে শোয়ালাম। দুপুর বেলায় ও পিসির খোঁজে এসেছিল। জানত না, গীতামাসি খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি চলে গেছে। আর কলেজ ছুটি থাকার দরুন আমি সেদিন বাড়িতে। আশ্চর্য, সেদিন পরে আমাকে একটুও জোর খাটাতে হয়নি। ফ্রকের বোতাম ও নিজেই একটা একটা করে খুলে দিয়েছিল। ওর ফরসা দু'টো স্তনে আমি যখন মুখ ঘসছিলাম, তখন লাভলির মুখে শীৎকার ধ্বনি শুনেছিলাম।

pathagar.net

ওই দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই এক চুমুকে আমি গ্লাসটা শেষ করে ফেললাম। শরীরটা খুব গরম হয়ে যাচ্ছে। উল্টো দিকের সোফায় বসে ধ্রুব মল্লিক কী যেন বলে হাসছেন। শুনতে ইচ্ছেই করল না। হঠাৎ মনে হল, লোকটা হামবাগ। যে সব গল্প বলছে সবটাই বানানো। এখুনি যদি লাভলিকে উলঙ্গ করে ওর সামনে এনে দাঁড় করাই, ব্যাটা পালাতে পথ পাবে না। ক্যাসানোভা-রা কখনও বারফাট্টাই করে না। যেমন আমি। হ্যাঁ আমি। আজ পর্যন্ত যে সব মেয়েকে আমি বিছানায় শুইয়েছি, তারা কেউই অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যায়নি। উল্টে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু রিঙ্কি। ও যে কেন মুম্বই চলে গেল, জানি না।

আমার মুখে আগ্রহের অভাব দেখেই বোধহয় স্বপ্নময়রা উঠল প্রায় ন'টা নাগাদ। নীচে নেমে ওদের বিদেয় করে আসার সময় সামনে এসে দাঁড়াল লাভলি। ও যে এতক্ষণ বাড়িতে ছিল, আমার খেয়ালই হয়নি। হয়তো ধ্রুব মল্লিকের যৌনজীবনের সব গল্পই ওর কানে গেছে। শিট। কথাটা মনে হতেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। নাহ, ওকে অনেক আগেই আমার বাড়ি চলে যেতে বলা উচিত ছিল। ড্রিঙ্ক করার সময় পুরুষদের মধ্যে এ সব আলোচনা হতেই পারে। ও-ই বা তা শুনবে কেন?

"শুভ্রদা, কী খাবেন?"

"তোকে" বলতে গিয়েও আটকে গেলাম। দু'হাত মাথার পিছনে তুলে লম্বা চুলের গোছা সামলাচ্ছে লাভলি। খোপা তৈরি করছে। ওর সুডৌল দুটো স্তন আমার হাতের নাগালে, পেটে হুইস্কি, শরীরে চনমনে ভাব। ওকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ চুমু দেওয়ার একটা প্রবল তাগিদ অনুভব করলাম। লাভলির দিকে হাত বাড়ানোর আগেই হঠাৎ ড্রয়িংরুমে ফোনটা বেজে উঠল। এই সময়ে কে আবার ফোন করল? কারও ফোন করার তো কথা নয়। ওপরে প্যারালাল লাইন। ওপরে গিয়ে

pathagar.net

ফোনটা ধরতে পারতাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফোনের কাছে এসে রিসিভারটা তুলে ধরলাম।

"শুভ্র বলছি।"

"আমি সুবোধ বাগচী। একটা খারাপ খবর আছে।"

"কী খবর?"

"ঘন্টা তিনেক আগে আপনাকে একবার ফোন করেছিলাম। এক ভদ্রমহিলা ফোনটা ধরেছিলেন। আপনাকে কিছু বলেননি?"

ভদ্রমহিলা মানে লাভলি। মনে পড়ল, হ্যাঁ, লাভলি তখন সুবোধ বাগচীর ফোনের কথা বলেছিল বটে! মাল খাওয়ার ঝোঁকে সে কথা ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু খারাপ খবরটা কী? অফিস সংক্রান্ত কিছু? শরীরের চনমনানি মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। বললাম, "না, শুনিনি। আমি এইমাত্র বাড়ি ফিরলাম। খবরটা কী বলুন।"

"কামাখ্যাবাবু এক্সপায়ার করেছেন।"

বারো

সকাল থেকেই মনটা খুব খিঁচড়ে আছে। কামাখ্যাবাবুর ডেডবডি ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসার কথা আমাকে বলেছিল ইউনিয়নের রন্টুরা। সেজন্য সকাল ন'টা নাগাদই বরানগরে চলে এসেছিলাম। কিন্তু দশটা সাড়ে দশটার সময় রন্টু ফোন করে বলল, কামাখ্যাবাবুর মেয়ে নাকি আপত্তি জানিয়েছে। তাই ডেডবডি নিয়ে ওরা সোজা চলে যাচ্ছে কেওড়াতলায়। কথাটা শুনে প্রথমে রাগ হয়েছিল রন্টুর উপর। তা হলে কেন ওরা সাতসকালে আমাকে ফ্যাক্টরিতে আসতে বলল? পরে রাগটা সরে গেল কামাখ্যাবাবুর মেয়ের উপর। মেয়েটা একটু পাকা। কয়েকদিন আগে কামাখ্যাবাবুর অসুস্থ হওয়ার খবরটা

দেওয়ার পরই ঠক করে ফোনটা ও রেখে দিয়েছিল।

সকালে মনটা অবশ্য প্রথমে খারাপ করে দিয়েছিল গীতামাসি। তাড়াহুড়ো করে অফিসে বেরোনোর সময় হঠাৎ এসে হাজির। মনার বাবার অপারেশন। ওষুধ কেনার জন্য টাকা চাই। হাজার পাঁচেক টাকা। একগাদা প্রেসক্রিপশন আমার সামনে ফেলে দিয়ে গীতামাসি বলেছিল, "শুভ্র, তুমি না দেখলে মনার বাবাকে আমি বাঁচাতে পারব না।" আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল গীতামাসি। ওকে কোনও দিন কাঁদতে দেখিনি। বাধ্য হয়ে বের করে দিয়েছিলাম টাকাটা। প্রথমে দাদু, তার পর কামাখ্যাবাবুর হঠাৎ মৃত্যু—মনটাই খিঁড়চে গেছিল।

অত তাড়াতাড়ি অফিসে এসেও কোনও লাভ হল না। বাড়ি ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করেনি। বেলা বারোটার সময় মিটিং ছিল হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর অনিল মজুমদারের সঙ্গে। পৌনে বারোটা থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে বসে আছি। ভদ্রলোকের ঘরে অনবরত লোক ঢুকছে আর বেরচ্ছে। বেলা দু'টো বেজে গেছে। তবুও উনি আমাকে ডাকছেনই না। পি এ ছেলেটি বারবারই বলছে, "একটু ওয়েট করুন। ঘর ফাঁকা হলে উনি ডেকে নেবেন।"

প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি, উনি ইচ্ছে করেই আমাকে বসিয়ে রেখেছেন। দাদুর সঙ্গে সম্পর্কটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছিল। সুবোধবাবু আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বুঝতে পেরে আমি চুপ করে বসে আছি। ব্যবসা করতে নেমেছি। এখন মাথা গরম করা মানে, আমার ক্ষতি। ব্যক্তিগত মান-অপমান আমাকে হজম করে যেতে হবে। এই শিক্ষাটা আজই আমার হয়ে গেল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ এসে হাজির হলেন পশুপতি চ্যাটার্জি। ওকে দেখে পি এ ছেলেটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পশুপতিবাবু হাসিমুখে বললেন, "সাহেব কোথাও

বেরোননি তো?"

"না স্যার, আছেন। যান, ভেতরে চলে যান।"

ভেতরে ঢোকার সময় হঠাৎ আমার দিকে চোখ গেল পশুপতিবাবুর। "আরে শুভ্র, তুমি এখানে বসে? তোমাকে আজ ফোন করেছিলাম। শোনো, কাল আমাদের সেই ফাংশান। তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিসের ফাংশান। বললাম, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আরে, সেদিনই তো তোমায় বললাম। তোমার দাদুর শ্রাদ্ধে গিয়ে। ফাংশান আমাদের ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের। এ বার রবীন্দ্র সদন আর পাওয়া গেল না বুঝলে। তাই মধুসূদন মঞ্চেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করলাম। তোমার তো সুবিধাই হবে। বাড়ির খুব কাছে। কালই তোমার দাদুর নামে সেই গোল্ড মেডেলটা আমরা দিচ্ছি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বি ফার্মা ডিপার্টমেন্টের বেস্ট স্টুডেন্টকে।"

হ্যাঁ, এ রকম একটা কথা সেদিন পশুপতিবাবু বলেছিলেন বটে। কিন্তু আমার দাদুর নামে মেডেল দেওয়া হচ্ছে, আমাকে জানাচ্ছেন মাত্র একদিন আগে? বললাম, "মেডেল-এর খরচটা কে দিচ্ছেন?"

"তুমি দেবে। মাত্র দশ-বারো হাজার টাকার তো ব্যাপার। চমৎকার বানিয়েছে কিন্তু মেডেলটা। তুমি তো অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে আসারই টাইম পেলে না এখনও। এলে দেখতে পেতে। কাল চলে এসো। এখন যাই, সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আসি। কাল ওঁর হাত দিয়েই প্রাইজটা আমরা দেব ভাবছি।"

বলেই দরজা খুলে পশুপতিবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। মিনিট দশেক পর যখন বেরোলেন, তখন যেন আমাকে আর দেখতেই পেলেন না। আর তার পরই আমার ডাক পড়ল। অনিল মজুমদারকে এই প্রথম আমি দেখলাম। ভদ্রলোকের

বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। পরনে স্যুট-টাই। দেখেই মনে হল, পাক্কা সাহেব মানুষ। আমাকে উনি বসতেও বললেন না।

ফাইল দেখতে দেখতে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের এম ডি এখন আপনি?"

বললাম, "হ্যাঁ স্যার।"

"আপনাদের বিরুদ্ধে একটা সিরিয়াস কমপ্লেন আছে।"

সিরিয়াস কমপ্লেন? চুপ করে রইলাম। দেখি ভদ্রলোক কী বলেন। প্রথমেই আক্রমণ শুরু করলেন। ভয়টয় পেলে চলবে না। কালই প্রথম ভদ্রলোকের সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়েছে। দেখা করার জন্য আমি সময় চেয়েছিলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রেখে উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবেন না।

"লালবাগে আপনাদের তৈরি স্যালাইন নিয়ে তো হইচই হয়ে গেছে।"

তা হলে খবরটা পৌঁছেই গেছে। বললাম, "আমার কাছেও কমপ্লেনটা এসেছে স্যার। পুলিশের কাছে আমিও পাল্টা কমপ্লেন করেছি।"

এ বার মুখ তুলে অনিল মজুমদার বললেন, "তার মানে?"

"ওখানে আমাদের স্যালাইন জাল হয়েছে স্যার।"

"বুলশিট। আই ডোন্ট বিলিভ ইট।"

অন্য কোথাও কেউ এ কথা বললে উচিত জবাব দিতাম। কিন্তু এখানে মাথা গরম করলে চলবে না। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "জানতে পারি, আপনাদের কাছে কমপ্লেনটা কে করেছে?"

"কমপ্লেনটা এসেছে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সার্ভিস থেকে। আমি তো ইনকোয়ারি করতে বলে দিয়েছি।"

"আমি তো স্যার কোনও চিঠি পাইনি।"

"ইনকোয়ারির রিপোর্ট আসুক। তার পর পাবেন। বাই দ্য বাই, ড্রাগ কন্ট্রোল থেকেও আপনার কোম্পানির নামে একটা

pathagar.net

কমপ্লেন এসেছে। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। যদি হাতে হাতে নিয়ে যেতে চান, তো নিতে পারেন।"

অনিল মজুমদার তা হলে আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছেন। ড্রাগ কন্ট্রোলের ব্যাপারটা কী, তা আগে জেনে নেওয়া দরকার। তাই বললাম, "এই কমপ্লেনটা কী স্যার?"

"চিঠিটা নিলেই তা জানতে পারবেন। আপনারা নাকি এখনও স্যালাইন প্রোডিউস করছেন পাইরোজেন মেথডে। চার চারটে বছর কেটে গেল। এখনও আপনারা চেঞ্জ করলেন না। ড্রাগ কন্ট্রোল তো আমাদের ইন্সট্রাকশন দিয়েছে, যতক্ষণ না আপনারা লাল টেস্টের ব্যবস্থা করবেন, ততক্ষণ আমরা যেন আপনাদের কোম্পানির মাল না কিনি।"

এই কমপ্লেনের কোনও জবাব আমার কাছে নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনিল মজুমদার ফের ফাইল দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক মিনিট...দু'মিনিট... তিন মিনিট কেটে গেল, উনি কোনও কথাই বলছেন না। বুঝতে পারছি, উনি আমাকে ইচ্ছে করে অপমান করছেন। নিশ্চয়ই দাদুর সঙ্গে লেনদেন নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়েছিল। আমার দুর্ভাগ্য, আমি সেটা জানি না। অস্বস্তি কাটানোর জন্য বললাম, "আমি একটা কথা বলব স্যার?"

"কোনও কথা নয়। আপনি এখন আসতে পারেন। আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা অন্তত কোনও মাল কিনব না।"

কথাটা অনিল মজুমদার এমন বিশ্রীভাবে বললেন, মনে হল কেউ যেন আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। কোনও কথা না বলে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। না, যে উদ্দেশ্যে রাইটার্সে এসেছিলাম, সেটা পূরণ হল না। অনিলবাবুর সঙ্গে আমাদের গণ্ডগোলটা কী কারণে হয়েছিল, সেটা খানিকটা শুনেছিলাম সুবোধ বাগচীর মুখে। ভাল করে জেনে আসা উচিত ছিল। অপমানটা হজম করে নিলাম। এই

pathagar.net

লোকগুলোর হাতে অগাধ ক্ষমতা। কী আর করা যাবে?

রাইটার্সের করিডোর দিয়ে হাঁটার সময়ই পিছু নিল মাঝবয়সি একটা লোক। "স্যার, আপনার চিঠিটা নিয়ে গেলেন না?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই লোকটা জানল কী করে চিঠির কথা? লোকটাকে বাজিয়ে দেখা দরকার। বললাম, "কোত্থেকে চিঠিটা নিতে হবে, জানি না।"

"বলবেন তো সে কথা। আসুন, আমার সঙ্গে।"

রাইটার্সে আগে কখনও আসিনি। গলিঘুঁজি চিনি না । এ সব কাজ করার কথা রবিনবাবুর মতো লোকেদের। অনিল মজুমদার লোকটা যে এত খারাপ, আমার ধারণাই ছিল না। হঠাৎই প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল লোকটার উপর। দু'তিনটে বাঁক পেরিয়ে হঠাৎ একটা বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মাঝবয়সি লোকটা। তার পর বলল, "আপনার দাদুকে আমি চিনতাম। প্রায়ই আসতেন তো। আমাদের সাহেবের সঙ্গে মাস কয়েক আগে শিবপ্রসাদবাবুর মনোমালিন্য হয়েছিল। আপনি মিটিয়ে নিন না।"

"মনোমালিন্য কেন হয়েছিল, জানেন?"

"ইলেকশন ফান্ডে ডোনেশন দেওয়া নিয়ে। বোঝেনই তো সব। আপনাদের মতো বিজনেসম্যানরা যা ডোনেশন দেন, সব পার্টি ফান্ডে যায়। এ বার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মিনিস্টার খুব চাপ দিয়েছিলেন আমাদের সাহেবকে। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট তুলে দিতে হবে ড্রাগ ম্যানুফ্যাচারার্সদের কাছ থেকে। তাই আমাদের সাহেব চাপ দিয়েছিল আপনার দাদুকে। উনি টাকা দিতে চাননি। গণ্ডগোলের শুরু সেখান থেকে। ইচ্ছে করলে আপনি সেটা মিটিয়ে নিতে পারেন।"

ওহ, তা হলে এই ব্যাপার। শুয়োরের বাচ্চাটা এই কারণে আমাকে অপমান করল। এই লোকটাকে একদিন আমি চরম শিক্ষা দেব। ভেতরে ভেতরে মারাত্মক রাগ হলেও, মুখে তা

প্রকাশ করলাম না। উল্টে বললাম, "আমি তো ব্যাপারটা জানতামই না। আমি ডোনেশন দিতে রাজি। আপনি মিঃ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলুন।"

"নিশ্চয়ই বলব। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও চিঠিফিটি আর আপনার কাছে যাবে না। ভেতর থেকে আমি সব ম্যানেজ করে দেব।"

"আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করে?"

"আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে না। আপনার কাছে আমিই চলে যাব। এই তো আজই আপনাদের পশুপতিবাবু সাহেবকে টাকা দিয়ে গেলেন। ভবিষ্যতে ওঁর কোনও সমস্যাই হবে না। তা হলে সাহেবকে গিয়ে সব বলছি স্যার। দেখবেন পরে যেন আমাকে ডুবিয়ে দেবেন না।"

বললাম, "না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

রাইটার্স থেকে রাগে ফুলতে ফুলতে আমি বেরিয়ে এলাম। এই ভাবে আমাকে ব্যবসা করতে হবে? না, সম্ভব না। অবাঙালি বিজনেসম্যানরা পারে। সেজন্য ওরা ফুলে ফেঁপে ওঠে। ভাগ্যিস, মারোয়াড়িরা এখনও ওষুধের ব্যবসায় নামেনি। নামলে অনেকদিন আগেই দাদুদের ব্যবসা গোটাতে হত।

বেলা প্রায় তিনটে। সকাল বেলায় রন্টুদের জন্য ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। দুপুরেও অনিল মজুমদারের জন্য লাঞ্চ করা হল না। গাড়ি চালিয়ে এসপ্লানেড আসার পরই রাগটা একটু একটু করে কমতে শুরু করল। আর তখনই ধ্বংসাত্মক খিদে পেয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছেই বাঁ দিকে টার্ন নিলাম। পার্ক হোটেলে গিয়ে পেটে আগে কিছু দেওয়া দরকার। পার্ক হোটেলে শেষ বার এসেছিলাম রিঙ্কিকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন খাবারের অর্ডার দিয়েও কিছু খেতে পারিনি। গাড়ি পার্ক করার সময় রিঙ্কির কথা খুব মনে পড়তে লাগল।

দোতলায় রেস্তোরাঁয় উঠতেই দেখি খুব ভিড়। কোনও

কোম্পানির কোনও কনফারেন্স চলছে বোধহয়। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সব টেবল দখল করে আছে। কোথাও খালি নেই। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল আব্দুল। আমার পরিচিত বেয়ারা। বলল, "স্যার লাঞ্চ করবেন নাকি? তা হলে আমার সঙ্গে আসুন। কোণের দিকের টেবলে একটা জায়গা খালি আছে।"

আব্দুলের পিছন পিছন কোণের দিকে এগোতেই হঠাৎ চোখে পড়ল টেবলে বসে লাঞ্চ করছে জয়সওয়াল এবং আরও দু'জন। বাস্টার্ডটাকে দেখেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আব্দুল আর কোথাও জায়গা পেল না? আমাকে এখানেই নিয়ে এল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, জয়সওয়াল অনেক রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু চেহারায় সুখী সুখী ভাব। চোখাচোখি হতেই ও বলল, "শুভ্র তুই! কী সারপ্রাইজ! বহুত দিন পর তোর সনে দেখা হল।"

ওর মুখে একটা ঘুসি মারতে ইচ্ছে করল। কিন্তু জায়গাটা পার্ক হোটেল। আর সবাই এখানে আমাকে চেনে। তাই খুব নিরাসক্তভাবে চেয়ারে বসে বললাম, "ভাল। তুই কেমন আছিস বল।"

"ভাল। দাঁড়া, দাঁড়া। আগে তোর সনে ইনট্রোডিউস করে দিই মিঃ জয়দেবের। মিঃ জয়দেব রয়চৌধরী। জাপানের হোক্কাইডোতে থাকেন। ওখানকার একটা মেডিসিন কোম্পানির চিফ কেমিস্ট। আর মিঃ জয়দেব, ইনি হচ্ছেন, আমার কলেজের দোস্ত শুভো। কাসানোভা দ্য গ্রেট।"

জয়দেববাবু হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। আমাদের লাইনেরই লোক। বয়স প্রায় আমারই মতো। অথবা আমার থেকে সামান্য কিছু বড়। জয়সওয়ালের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই নেই। তাই জয়দেববাবুর সঙ্গে ভাল করে আলাপের জন্য জিজ্ঞেস করলাম, "জাপানে আপনি কদ্দিন আছেন, জয়দেববাবু?"

pathagar.net

"বছর দুয়েক। তার আগে আমেরিকাতে ছিলাম। ওখানেই পড়াশুনো করেছি।"

"হোক্কাইডোর কোন কোম্পানিতে আছেন?"

'শিমবুন ল্যাবরেটরিজ। ওখানকার একটা ছোট সংস্থা। ওরা একটাই ওষুধ বানায়। টকসিন প্রতিষেধক ফিল্টার।"

জয়সওয়াল এমন সময় বলল, "মিঃ জয়দেব, শুভোর দাদুরও মেডিসিনের ফ্যাক্টরি আছে। ওরা মাল্টিমিলিওনার।"

জয়দেববাবু বললেন, "তাই নাকি? কী ধরনের ওষুধ?"

বললাম, "সব ধরনের। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ওরাল লিকুইড, অয়েন্টমেন্ট, পাউডার, ইন্ট্রা ভেনাস ফ্লুইড।'

"বাব্বাঃ, এত ধরনের ওষুধ! ইন্ডিয়ায় অবশ্য ওষুধ বানানোর খরচ কম। তাই একটা সংস্থার পক্ষে অনেক ধরনের ওষুধ তৈরি করা সম্ভব। আমাদের ওখানে খরচ এত বেশি..."

"কিন্তু আপনাদের ওখানে ওষুধের দামও তো অনেক বেশি।"

"সেটা অবশ্য ঠিক। এখানকার তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। লোকে তাই ভেষজ ওষুধের দিকে আজকাল বেশি ঝুঁকছে। আপনার দাদুর সংস্থায় সে রকম কোনও ওষুধ নেই?"

"আছে। মাত্র একটা। হাঁপানির ওষুধ। একটা সময় সেই ওষুধটা বাজারে খুব চলত। তবে সেটা বানানো এখন আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"ঠিক করেননি। জাপানের ওষুধ সংস্থাগুলো এখন এ সব ভেষজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। তবে ওষুধটা ভাল হওয়া চাই। লুধিয়ানার একটা সংস্থা আমাদের ওখানে একটা ওষুধ রফতানি করত বহুমূত্র রোগের। পরে দেখা গেল, তাতে ভাল ফল দিচ্ছে না। ভারতের বদনাম হয়ে গেল।"

"আমাদের ওষুধটা কিন্তু ভাল। আপনি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন? আমি তা হলে এক্সপোর্ট করতে চাই।"

pathagar.net

জয়দেববাবু পার্স থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি এখন বেশ কিছুদিন আছি। আমার বাড়ি রাজা বসন্ত রায় রোডে। আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।"

আব্দুল এসে আমার খাবারটা দিয়ে গেল। খাওয়া শুরু করতেই জয়ওসয়াল বলল, "তখুন থেকে তোরা মেডিসিনের গল্প করে যাচ্ছিস। শুনলাম, তুই নাকি বসে গেছিস তোর দাদুর বিজনেসে?"

ওহ, তা হলে স্বপ্নময় আমার সম্পর্কে জয়সওয়ালকে অনেক কিছুই বলেছে। অথচ সেদিন ন্যাকামি করল, একজনের কথা আর একজনকে বলা উচিত নয়। ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম, "হ্যাঁ। দাদু এক্সপায়ার করেছে। এখন কোম্পানি আমিই দেখছি।"

জয়সওয়াল ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, "তুই করবি বিজনেস? ও সব তোর ব্লাডে আছে?"

"চেষ্টা করছি রে।"

জয়দেববাবুর খাওয়া হয়ে গেছিল। রুমাল দিয়ে কায়দা করে মুখ মুছে উনি একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ জয়সওয়াল, প্রায় চারটে বাজে। সাড়ে চারটেয় আমার একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। আমি উঠছি।"

জয়দেববাবুর সঙ্গে টেবলে বসা তৃতীয় লোকটাও উঠে পড়ল। আর কোনও কথা না বলে ওরা লিফটের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ওঁদের দিকে তাকিয়ে জয়সওয়াল বলল, "স্লা, একটা লোক দেখলাম বটে। একদম টাইম নষ্ট করে না রে। আমাকে এক ঘণ্টা সময় দেবে বলেছিল। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে উঠে পড়ল। এসেই আমাকে কী বলল জানিস শুভো? টাইম ইজ মানি। যা পোরপোজাল আছে, জানিয়ে দিন। জাপানে থাকে তো, একদম জাপানি বনে গেছে।"

pathagar.net

আমার সঙ্গে জয়দেববাবু যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণ খুব কমই ইংরেজি শব্দ বললেন। কোম্পানিকে সংস্থা, এক্সপোর্টকে রফতানি, হার্বাল মেডিসিনকে ভেষজ ওষুধ বললেন। এমনকী, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কথাটাও উনি এড়িয়ে গেলেন 'একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে বলে। মানুষটা সত্যিই অদ্ভুত। সত্যিই তো, টাইম ইজ মানি। একটা মুহূর্ত বাজে খরচ করা মানে, একটা টাকা রোজগারের সুযোগ নষ্ট করা। ইস, আমি যদি এ রকম কেজো হতে পারতাম! মেয়েদের পিছনে ফালতু ছুটে আমি কত সময় নষ্ট করেছি। তার মানে অনেক টাকা রোজগারের সুযোগও।

এ সব ভাবতে ভাবতে চুপচাপ খেতে লাগলাম। বাড়ি থেকে লাভলি আজ নিশ্চয়ই লাঞ্চ পাঠিয়েছিল অফিসে। মনার হাত দিয়ে। মনা গিয়ে দেখেছে আমি নেই। পুরো খাবারটাই বরবাদ হয়ে যাবে। ইস, বাড়িতে ফোন করে লাভলিকে একবার জানিয়ে দিলে হত লাঞ্চ পাঠানোর দরকার নেই। কিন্তু অনিল মজুমদারের অফিসে বসে থাকতে থাকতে তখন আমার এমন অবস্থা, খাওয়ার কথা মনেও নেই। ঠিক করলাম, পার্ক হোটেল থেকে বেরিয়েই সোজা বাড়ি ফিরে যাব। আজ আর কোনও কাজ নয়। সারা সন্ধেটা রিল্যাক্স করব বাড়িতে বসে। লাভলিকে আজ জিজ্ঞেস করতেই হবে, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কেন ও চলে এল?

জয়সওয়াল বিলের দাম মিটিয়ে দিচ্ছে। বোধহয় উঠে পড়বে। আমাকে বলল, "শুভো, তোর খাবারের দামটা আমি দিয়ে দিয়েছি। আমাকে উঠতে হবে রে। আমার বউ দাঁড়িয়ে থাকবে শ্রীরাম আর্কেডে। শপিং করবে।"

আমার খাবারের দাম ওর দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জয়দেববাবু এখন নেই। সেই কারণে চক্ষুলজ্জা করার কোনও কারণও নেই। কড়া গলায় বললাম, "দাম দেওয়ার কথা তুই ভাবলি কী করে?"

হাসিমুখে জয়সওয়াল বলল, "আমার উপর তোর রাগ এখনও পড়েনি, তাই না রে শুভ্র?"

বললাম, "এই জায়গাটা যদি পার্ক হোটেল না হত, তা হলে তোর পেটে তিন লাথি মারতাম।"

"এ তুই কী বলছিস শুভ্র। বয়স তো যথেষ্ট হল। তুই এখন একজন বিজনেসম্যান। ইন্ডাসট্রিয়ালিস্ট। তোর মুখে এখন এ সব কথা শোভা পায় না। এত ঘমন্ড নিয়ে তুই বিজনেস করবি কী করে?"

বললাম, "ছাড় এ সব কথা। শুনলাম, তুই নাকি ভাল বিজনেস করছিস?"

"বলতে পারিস। এক সনে তিনটে বিজনেস চালাচ্ছি। একটাতে বউকেও বসিয়ে দিয়েছি। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের বিজনেস।"

"জয়দেব ছেলেটার সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে?"

"হোক্কাইডোতে। আমার একটা বিজনেস আছে...মিনারেল ওয়াটারের। জাপান থেকে মেশিনপত্তর আনিয়েছি। তখন কয়েকবার জাপানে গেছিলাম। ওখানেই রেস্টুরেন্টে একদিন আলাপ জয়দেবের সনে।"

"কোনও ধান্ধা করছিস বুঝি?"

"একটা ধান্ধা আছে। এখন বলব না।"

"বেশ আছিস।"

"থাকব না কেন বল। তোরা যখন মেয়েদের পিছনে ঘুরতিস, সেই সময়টায় বাবার গদিতে আমি বসে পড়েছি। বাবাই আমাকে ধান্ধা শিখিয়েছে। কীভাবে টু পাইস করা যায়, তখন থেকেই জানি। তোদের... বাঙালিদের দিয়ে কোনওদিন বিজনেস হবে না। মা লছমী কোনওদিন তোদের কিরপা করবে না।"

"এটা কিন্তু তুই ঠিক বললি না।"

"ঠিকই বলেছি। তুই মানিস বা না মানিস। অনেক ঘাড় নিচু

করতে হয় রে। তোদের... বাঙালিদের ঘাড় জন্ম থেকেই সোজা। সেকেন্ড কথা হল, তোরা মেহনত করিস না। দু'টাকা রোজগার করলেই সনতুষ্ট হয়ে যাস। থার্ডলি, তোরা পাওয়ারের কাছাকাছি থাকিস। কিন্তু তবুও ফায়দা তুলতে পারিস না।"

জয়সওয়াল কথাগুলো মন্দ বলছে না। বললাম, "পাওয়ার মানে?"

"পলিটিক্যাল পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার। আরে বিজনেসে বড় কিছু করতে হলে আগে দু'টো লালবাড়িকে তোর হাতের মুঠোয় আনতে হবে। একটা রাইটার্স, অন্যটা লালবাজার। ম্লা, তোর বিজনেস খায় কে? তুই আমার কলেজ মেট। তাই তোকে টিপস দিলাম। আচ্ছা, এ বার উঠি। না হলে বউ খুব খচে যাবে। বিয়ে তো করলি না। সারা জীবন ছুঁকছুঁক করেই গেলি। তুই কী বুঝবি?"

জয়সওয়াল উঠে পড়ল। আমার খাওয়া শেষ হয়নি। খেতে খেতেই ওর যাওয়া দেখতে লাগলাম। ওকে একটা শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না। গায়ের জোরে ওকে কিছু করা যাবে না। ওকে ধনেপ্রাণে মারতে হবে। এবং সেটাও খুব বুদ্ধি করে। লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জয়সওয়াল। ওর পাশে দু'তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে। লিফটে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎই একটা মেয়ের দিকে চোখ গেল। আরে, রিঙ্কি না? হ্যাঁ, রিঙ্কিই তো। ঘাড় ঘুরিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও হাসছে। এই সময়ে ও পার্ক হোটেলে? তা কী করে হবে? ওর তো এখন মুম্বইয়ে থাকার কথা।

রিঙ্কিকে ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আর তখনই লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

pathagar.net

তেরো

বাড়িতে ফিরে গাড়িটা পোর্টিকোর নীচে রাখতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল লাভলি। উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "সারাটা দিন তুমি কোথায় ছিলে শুভ্রদা? মনা ফিরে এসে বলল, তুমি নাকি অফিসে ছিলে না?"

যাক, তবুও কেউ একজন আমার জন্য চিন্তা করছে। ভাবতেই ভাল লাগল। বললাম, "একটা কাজে গেছিলাম। কোনও ফোন এসেছিল?"

"বেশ কয়েকটা।" আমার হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে লাভলি তার পর বলল, "নাম সব লিখে রেখেছি। ফোনের পাশে রাখা আছে।"

আজ দুপুরে মোবাইল সেটটা হঠাৎ অফ হয়ে গেছিল। চার্জ দিয়ে যাইনি। তাই কোনও ফোনও পাইনি। প্রসঙ্গ বদলে বললাম, "মনা কোথায় রে?"

"হাসপাতালে গেছে। পিসেমশাইয়ের আজ অপারেশন হয়েছে। আজ হাসপাতালে গিয়ে ওকে রাত জাগতে হবে। যদি ওষুধ টষুধের দরকার হয়, সেজন্য। বলে গেছে কাল তুমি অফিস যাওয়ার আগেই চলে আসবে। কেন, কোনও দরকার আছে?"

"না, এমনিই। জানতে চাইছিলাম।"

"সারা দিন পেটে কিছু দিয়েছ শুভ্রদা? কিছু করে দেব?"

"আমাকে খাওয়ানো ছাড়া তোর আর কোনও কাজ নেই, না রে?"

"পিসি যে তোমাকে যত্ন করতে বলেছে।"

"তা হলে যত্ন কর। আমার বাথরুমে গিয়ে গিজারটা একটু চালিয়ে দে। জলটা গরম হোক। আমি ততক্ষণ ফোনগুলো সেরে নিই।"

লাভলি দোতলায় উঠে গেল। আমি সোফায় বসে

pathagar.net

পড়লাম। লাভলির হাতের লেখাটা খুব সুন্দর। ইংরেজিতে নাম আর ফোন নম্বরগুলো পর পর লিখে রেখেছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করা মেয়ে। ও তো জানবেই। দেখলাম, অফিস থেকে ফোন করে ছিলেন সুবোধ বাগচী আর মিসেস ব্যানার্জি। দু'জনকেই এখন আর অফিসে পাওয়া যাবে না। তিন নম্বর ফোনটা লেক ক্লাব থেকে। অনেকদিন ক্লাবে যাইনি। বোধহয় চাঁদাটাদা বাকি আছে। এখন ফোন না করলেও চলবে। চার নম্বর ফোন এসেছিল ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে। করেছিলেন মহাবীরবাবু। তার মানে, কালকের অনুষ্ঠানে যাতে আমি যাই সেই অনুরোধ করবেন। পাঁচ নম্বর ফোনটা, স্বপ্নময়ের। ওর সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। এমন কিছু আর্জেন্ট বলে মনে হয় না। ছয় নম্বর ফোনটা কে করেছিল, বুঝতে পারলাম না।

উপরে উঠে এসে জামা কাপড় বদলে, বাথরুমে ঢুকলাম। শীত হোক বা গ্রীষ্ম, প্রতিদিন বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে স্নান করা আমার অভ্যেস। সেই স্কুল লাইফ থেকে। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির মাঠে সময় পেলেই আমরা খেলতাম। জামা ঘেমে একশা হত। সেজন্য গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে ঢুকতাম বাথরুমে। গীতামাসি পরিষ্কার জামা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। পুরনো অভ্যাসটা রয়ে গেছে।

বাথরুমে ঢুকে দেখলাম, লাভলি শুধু গিজারটাই চালিয়ে দিয়ে যায়নি। বাথটাবটাও যাতে ভর্তি হয়, তার ব্যবস্থা করে গেছে। মেয়েটা সব জানে। এই ক'দিন বোধহয়, ও আমাকে খুব লক্ষ করেছে। আমার পছন্দ-অপছন্দ সব। ইদানীং দেখছি, আমার ঘরটাও গুছিয়ে রাখে। ফাইলপত্তর এদিক সেদিক পড়ে থাকলে তা তুলে রাখে। খুব কাজের মেয়ে। সব থেকে ভাল, একেবারে মনার মতো। খুব কম কথা বলে।

চট করে স্নানটা সেরে নিলাম। তারপর পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নীচে এসে দেখি, লাভলি ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে

টিভি দেখছে। আমাকে দেখেই টিভির সুইচ অফ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "শুভ্রদা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।"

উল্টো দিকের সোফায় বসে বললাম, "কী রে?"

"তোমার সেই লম্বা মতন বন্ধুটার সঙ্গে যে লোকটা সেদিন এসেছিল, সে কিন্তু ভাল না।"

বললাম, "বোস। কেন রে?"

সোফায় বসে লাভলি বলল, "পর পর দু'দিন আমাকে ফোন করেছে। তুমি থাকবে না জেনেই সে সময়টায় ফোন করে। প্রথমে তোমার খোঁজ করে। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, চলো তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

শুনে মনে মনে হাসলাম। ধ্রুব মল্লিক যে লাভলির প্রতি সেদিন আকৃষ্ট হয়েছে, তা ওঁর চোখ দেখেই সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। বেচারি। কলকাতাটাকে বোস্টন শহর ভেবে ফেলেছেন। লাভলিকে বললাম, "তাতে অন্যায়টা কী করেছে। তোকে ভাল লেগেছে বোধহয়।"

"কী বলেছে জানো, তুমি আমার সঙ্গে আমেরিকায় চলো। শুভ্রকে কিছু বলার দরকার নেই। টুক করে আমরা একদিন কেটে পড়ব। লোকটা বিয়ে করেনি শুভ্রদা?"

"করেছিল। ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন একটা মেয়ের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে। তা তুই কী ঠিক করলি বল্। যাবি, আমেরিকায়?"

"তোমার মাথা খারাপ।"

"কেন? গেলে তো ভালই থাকবি। সেদিন শুনলি না, লোকটা বলছিল, তুই ওখানে গেলে নাকি প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবি। কার ভাগ্য কীভাবে খুলে যায়, কেউ বলতে পারে?"

"গেলে ওই লোকটার সঙ্গে যাব কেন?" বলেই মুখটা নিচু করল লাভলি।

pathagar.net

"তা হলে কার সঙ্গে যেতে চাস?"

"তোমার সঙ্গে।"

"তা হলে তোর কোনওদিনই যাওয়া হবে না।"

"না হোক।" বলে মুখ তুলে সোজা ও তাকাল আমার দিকে। ওর পরনে হাল্কা গোলাপি রঙের সালোয়ার-কামিজ। কাঁধে ওড়না। গায়ের রঙটা ফরসা বলে চমৎকার মানিয়েছে। সোফার এক কোণে একটু বাঁকা ভাবে বসে আছে। বসার ভঙ্গিতে সামান্য আড়ষ্টতা। তবুও সরু কোমরের ভাঁজের দিকে আমার চোখ গেল। লাভলির মতো মেয়েরা শরীর চর্চা করে না। বিউটি কনটেস্টের কথা ভাবে না। হয়তো কখনওসখনও হাল্কা প্রসাধন সারে। তবুও এত সুন্দর হয় কী করে?

ওর সঙ্গে গল্প করার জন্যই বললাম, "সারাটা দিন একা একা বাড়িতে তুই কাটাস কী করে লাভলি?"

"কেন, টিভিতে সিনেমা দেখি। বই পড়ি। কত কী জানা যায়। আমার খুব ভাল লাগে একা একা থাকতে।"

"তোর আর কী ভাল লাগে রে?"

"তোমাকে।"

কথাটা লাভলি এত সরাসরি বলল, আমি চমকে উঠলাম। ওর দিকে তাকাতেই শরীরটা শিরশির করে উঠল। ঝট করে মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে একবার ওই সোফাতে ফেলেই ওর শরীর থেকে আমি একদিন সুখ নিয়েছিলাম। লাভলিও সাড়া দিয়েছিল। এখনও ওর সে সব কথা মনে আছে নাকি? ইদানীং যত দিন যাচ্ছে, লাভলি ততই আমার কাছাকাছি আসছে। এখন চোখে চোখ রেখে কথা বলে। মাঝে মাঝে হেসে উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাকে ওর 'ভাল লাগে' কথাটা শুনেই ওর দিকে ভাল করে তাকালাম।

কপালের টিপ থেকে চোখ বোলাতে বোলাতে আমি

একেবারে ওর পায়ের পাতা অবধি ভাল করে দেখলাম। তার পর বললাম, "আমাকে যদি তোর এতই ভাল লাগে, তা হলে অত দূরে বসে আছিস কেন? আমার কাছে আয়।"

ভাবলাম, আসবে না। আশ্চর্য, লাভলি কিন্তু সোফা ছেড়ে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। হাত দিয়ে টেনে এক ঝটকায় ওকে আমার কোলে নিয়ে এলাম। তার পর আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ওর ভিজে ঠোঁটে দীর্ঘ চুমু দিয়ে বললাম, "তোকেও আমার খুব ভাল লাগে রে।"

লাভলির ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে। ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে। আমার কোলের উপর ওর শরীরটা পলকা বলে মনে হচ্ছে। ওর নিতম্বের স্পর্শে আমার সারা শরীরে রক্ত দাপাদাপি করতে শুরু করল। দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে আছি। ওর নরম স্তন লেপ্টে আছে আমার বুকে। লাভলি হঠাৎ এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "শুভ্রদা, আরেকটা দাও না গো।" বলতে বলতেই নিজের একটা আঙুল ঠোঁটে ছুঁইয়ে ও চুমুর ইঙ্গিত করল। এ বার শুধু ঠোঁটেই নয়, পুরো মুখ মণ্ডল জুড়েই চুমু দিতে দিতে ঘাড় ও বুকের কাছে নেমে এলাম। তার পর থেমে ফিসফিস করে বললাম, "তোর ভাল লাগছে?"

"খুউব। ঠিক আগের মতো।"

"আগের কথা তোর মনে আছে?"

চোখ বোজা অবস্থাতেই ঘাড় নাড়ল লাভলি। "আমি কিছুই ভুলিনি গো।" কথাটা বলে আমার বুকে ও মুখ লুকোল, "প্রতিটা দিনের সব কথা আমার মনে আছে। তোমরা ভুলে যেতে পারো, কিন্তু মেয়েরা কখনও এ সব ভোলে না।"

"এতদিন তুই কোথায় ছিলি, লাভলি?"

"ওপরে চলো। তার পর বলছি।"

ওপরে মানে... আমার ঘরে। পাঁজকোলা করে লাভলিকে আমি তুলে নিলাম। ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা

pathagar.net

দিয়ে রইল। ওর মুখ দেখে কেন জানি না, আমার মনে হল এই মুহূর্তটার জন্য ও যেন অপেক্ষা করছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে লাভলিকে আমার বিছানায় এনে ফেললাম। চিত হয়ে শুয়ে ও বলল, "শুভ্রদা, প্লিজ লাইটটা নিভিয়ে দেবে? আমার লজ্জা করছে।"

হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। বাথরুমের দরজা খোলা। স্নান করার পর আলো নিভিয়ে বেরোইনি। শোয়ার ঘরে আবছা আলো। আমার শরীর দিয়ে লাভলিকে গ্রাস করে বললাম, "দাঁড়া, তোকে একবার আদর করে নিই। তারপর তোর সব কথা আমি শুনব।"

নিজেকে ছাড়িয়ে লাভলি এ বার উঠে বসল। প্রথমে কামিজটা খুলে ফেলল। ওর ফরসা দু'টো স্তন আমার চোখের সামনে। পরম যত্নে দুই হাতে দুটো স্তন তুলে ধরলাম। তার পর মুখ ডুবিয়ে চুমু দিতে লাগলাম। ওর স্তন নিয়ে খেলা করার ফাঁকেই সায়োয়ারটা খুলে ফেলল লাভলি। আমার পাজামার দড়িটা খুঁজে বেড়াচ্ছে ও। বেতের লাঠির মতো শক্ত হয়ে ওঠা আমার পুরুষাঙ্গে ওর হাত।

ওর আগ্রহ দেখে আমার অবাক হওয়ার কারণ নেই। কেননা, লাভলি এখন আর আগের মতো কুমারী নেই। ও বিবাহিত এবং নিশ্চয়ই যৌনজীবনে অভ্যস্ত। কামকলায় যদি ও অংশ নেয়, সেটাই ওর কাছে প্রত্যাশিত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা দু'জনে সারা শরীরের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। ওর নরম ও মসৃণ উরু আমার উরু ছুঁতেই শরীরে বিদ্যুতের ঝটকা। লাভলি দুটি পা সামান্য ছড়িয়ে রাখল। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আমি বললাম, "কই, আগের মতো পালিয়ে যেতে তো তুই এখন চাইছিস না।"

লাভলি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "আগে অত বুঝতাম না গো।"

"বিয়ের পর বুঝেছিস, তাই না?"

"না। সেটাও ঠিক না। বিয়ের আগে আমি যা ছিলাম, এখনও তাই আছি।"

অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে?"

"মানে, আমার স্বামীর কোনও ক্ষমতাই নেই। পিসি তাড়াহুড়ো করে আমার বিয়ে দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রথম দিনই বুঝে গেলাম, লোকটা অক্ষম। বিয়ের আগেই জানত। তবুও কেন বিয়ে করল, জানি না। যতবার জিজ্ঞেস করেছি, ততবারই হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে।"

"তার পর?"

"রোজ রাতে আমার পাশে শুয়ে লোকটা যখন নিশ্চিন্তে ঘুমোত, তখন আমার সারা শরীরে জ্বালা জ্বালা করত। ভাবতাম, আমার জীবনটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল। তখনই তোমার কথা আমার মনে পড়ত গো।"

আমার বুকের নীচে শুয়ে লাভলি এ সব কথা বলছে। বেশ গুছিয়েই। শুনে আমি অবাক হচ্ছি। এত কথা ওকে কখনও বলতে শুনিনি। কৌতূহল মেটানোর জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, "গীতামাসিই বা তাড়াহুড়ো করে তোর বিয়েটা দিতে গেল কেন?"

"তুমি কিছুই জানো না?"

"না, আমাকে কেউ তো কিছু বলেনি।"

"একদিন আমাকে আর তোমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন তোমার দাদু। তার পরই পিসিকে ডেকে বলে দেন, আমি যেন কোনওদিন এ বাড়িতে আর না ঢুকি। আমার বিয়ের টাকাটা পিসিকে উনিই দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরই তুমি বাঙ্গালোরে চলে গেলে। তুমি কিছুই বুঝতে পারোনি, তাই না?"

"না। গীতামাসি তা হলে আমাদের ব্যাপারটা জানে?"

"সবই জানে।"

"তখন তোকে কিছু বলেনি?"

"মারধর করেছিল। আমি সুইসাইড করার ভয় দেখাতে চুপ করে গেছিল।"

"তা হলে গীতামাসি ফের তোকে এ বাড়িতে একা রেখে গেল কেন?"

"পিসির কোনও উপায় ছিল না বলে। পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসে যখন আমি শুনলাম, বড়দাদাবাবু মারা গেছে, তখনই এ বাড়িতে আসার জন্য আমিও জেদ ধরেছিলাম। আরও সুবিধা হয়ে গেল, পিসেমশাই অসুস্থ হওয়ার পর।"

"তুই জেদ ধরেছিলি কেন?"

"তার একটা কারণ আছে। বললে তুমি রাগ করবে না, বলো?"

"কী এমন কথা?"

"আগে কথা দাও। আমি যা বলব, তাতে তুমি **রাজি হবে।** না হলে আমাকে সুইসাইড করতে হবে।"

"বল, আমি রাজি।"

"তুমি আমাকে একটা বাচ্চা দেবে শুভ্রদা।"

চমকে উঠে বললাম, "তুই কী বলছিস, তুই জানিস?"

"জানি। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি তোমার কাছে এসেছি। পাঁচ পাঁচটা বছর আমি এ নিয়ে ভেবেছি। তোমাকে ছাড়া আমি এ শরীর কাউকে দিইনি। যদি মা হতেই হয়, তা হলে তোমার বাচ্চার মা হব।"

"এ হয় না লাভলি। তোর হাসব্যান্ড আছে। সে তো সব বুঝে যাবে। তখন?"

"তাতে কিছু আসে যায় না। আমাকে তো একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে হবে শুভ্রদা? একবার আমার কথা ভাবো। অনেক ভেবে চিন্তেই কথাটা বলছি। বেলঘরিয়ায় একটা সময় কোনও উপায় না দেখে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। বি এ পাশও করলাম। তারপর কী মনে হল, ক্যাটারিং স্কুলে গিয়ে রান্না শিখলাম। বছর খানেক হল, ছোট আকারে ক্যাটারিং ব্যবসা

pathagar.net

শুরু করেছি। পেট চালানোর মতো রোজগার নিজেই করতে পারব। আমার শুধু একটা বাচ্চা চাই। তুমি আমাকে দাও শুভ্রদা।"

লাভলির গলায় আকুতি শুনে আমি দ্বিধাগ্রস্থ। বেশ বুঝতে পারছি, মনস্থির করেই ও এ বাড়িতে ঢুকেছে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও কিছু কথা ওর কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। তাই বললাম, "তোর স্বামীর যে কোনও ক্ষমতা নেই, সে কথা গীতামাসি জানে?"

"না, জানে না। কাউকে আমি বলিনি। এখন তো অনেকেই তাড়াতাড়ি বাচ্চা চায় না। হয়তো ভাবে, আমরা চাইছি না।"

"কিন্তু পরে যদি জানাজানি হয়?"

"কেউ জানবে না শুভ্রদা। তুমি যদি চাও, তা হলে আমি অনেক দূরে চলে যাব। জীবনে এ মুখ তোমাকে দেখাব না। প্লিজ, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না। আমার হাসব্যান্ডকে আমি শিক্ষা দিতে চাই। মা হওয়ার অধিকার আমার আছে। কার বাচ্চার মা হব, সেটা মনে হয়, আমারই ঠিক করা উচিত। বিশেষ করে, আমার হাসব্যান্ডের যখন কোনও ক্ষমতা নেই।"

লাভলির মুখে কথাটা শুনে আমি মারাত্মক চমকে উঠলাম। ওর মতো একটা সাধারণ মেয়ের মুখ থেকে এ রকম একটা অসাধারণ কথা শুনব, আমি আশাই করিনি। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম, অ্যাকট্রেস নীনা গুপ্তার মুখে। ভিভ রিচার্ডসের বাচ্চা নেওয়ার পর, যখন হইচই হয়েছিল, তখন এই কথাটাই উনি বলেছিলেন। "কার বাচ্চার মা আমি হব, সেটা আমিই ঠিক করব। এ নিয়ে কেউ যেন মাথা না ঘামায়।" লাভলি তো একই কথা বলছে। কথাটা বিশ্বাস করে বলেই এত জোরের সঙ্গে বলছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লাভলি এ বার বলল, "আমার নিজের বলতে কেউ নেই শুভ্রদা। ছোটবেলায় আমার বাবা-মা দু'জনেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। বাবা ছিলেন

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার। বাধ্য হয়ে গরিব পিসির বাড়িতে আসার পর থেকে বুঝতে পারলাম, জলপাইগুড়িতে আমাদের যা স্ট্যাটাস ছিল, তা আর ফিরে পাব না। আমি অনাথই হয়ে গেলাম।"

"তার পর?"

"মন দিয়ে লেখাপড়ার চেষ্টা করেছিলাম। তুমি জানো না, হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম। পিসি আর পড়াল না। বলল, বেশি পড়লে তোর বিয়ে দিতে পারব না। পিসি তোমাদের বাড়ির গল্প খুব করত। আমার চোখে তুমি তখন রাজপুত্তুর। তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে হত। তাই জোর করেই তখন তোমাদের এ বাড়িতে এসেছিলাম। পিসির সঙ্গে টুকটাক কাজ করতাম। তার পর...তুমি একদিন চিলেকোঠায়...আমার মনে হল, তুমিই আমার ভবিতব্য। তাই দ্যাখো, এতদিন পর ফের তোমার কাছেই আমায় ফিরে আসতে হল।"

লাভলির দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। দেখে আমার বুকটা মুচড়ে উঠল। লাভলি সম্পর্কে আমি এ সব কিছুই জানতাম না। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, "এ সব কথা আমাকে আগে বলিসনি কেন লাভলি?"

"ভয় হত। পাছে আমায় সস্তা মেয়ে ভাব। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি শুভ্রদা। আমার পেটে বাচ্চা আসার পর তোমার ধারে কাছেই আর আসব না।" বলেই ফুঁপিয়ে ও কেঁদে উঠল।

ওর চোখে চুমু দিয়ে কান্না বন্ধ করলাম। ঠোঁটে চুমু দিয়ে ওকে ফের উত্তেজিত করলাম। তার পর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "ঠিক আছে। তোর যখন এত ইচ্ছে, তখন আমি রাজি।"

...আধ ঘণ্টা পর শ্রান্ত শরীরে আমরা দু'জনেই শুয়ে আছি। আমার বুকের উপর মাথা লাভলির। সুগন্ধ ভেসে আসছে ওর চুল থেকে। আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে ও। আমার বুকটা

হাঁপরের মতো ওঠানামা করার সময় লাভলির দেহটাও ওঠানামা করছিল। কয়েক দিন আগে এই বিছানাতেই রিঙ্কিকে নিয়ে শুয়েছিলাম। সেটা একটা আলাদা অভিজ্ঞতা। তাতে ছিল শুধুই রিরংসা। একটু আগে অন্য অভিজ্ঞতা হল।

পরম মমতায় ওকে ডাকলাম, "লাভলি, কী ভাবছিস?"

মুখ তুলে ও বলল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, যেন আমার ইচ্ছেটা পূরণ হয়।"

"তুই বোধহয় ঠিক করলি না রে।"

"না শুভ্রদা, আমি যা করেছি, ঠিক করেছি। জানো, আজ খুব শুভদিন। পাঁজিতে দেখলাম সন্তান কামনা পূরণ হতে পারে।"

"তোর ভাল লেগেছে?"

"খুউব। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না গো। পিসি ফের এ বাড়িতে এসে কাজ শুরু করলে, তখন তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।"

"যদি তোকেও এখানে রেখে দিই? থাকবি?"

" না গো। থাকা সম্ভব না। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় এখানে থাকলে পিসিই তখন সন্দেহ করে বসবে। আগের সব ঘটনা তো পিসি জানে। এখানে নিয়ে আসার দিন পিসি কিন্তু আমাকে ঘুরিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। আমি যেন এমন কিছু করে না বসি, যাতে পিসির মুখ নষ্ট হয়। সে সব কথা থাক, আমার জন্য ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করবে শুভ্রদা?"

ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও কথাটা শুনে দু'হাতে ওর মুখটা তুলে চুমু খেলাম। ভিজে ঠোঁট। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ফের উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওকে জড়িয়ে ধরে উল্টে গেলাম। এখন লাভলির বুকের উপর আমি। চুমুর সঙ্গে ওর শরীরটা পিষে দিতে দিতে আমি বললাম, "পাঁজিতে যখন লেখা আছে, তখন তোর ইচ্ছে পূরণ হবেই।"

pathagar.net

লেক গার্ডেন্সের তিন নম্বর রেল গেটের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দেখি সাগ্নিক। হাঁটতে হাঁটতে লেক গার্ডেন্সের দিকেই যাচ্ছে। এই ছেলেটা কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়িতে গেছিল দুর্গাপুজো নিয়ে কথা বলার জন্য। আমাকে পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট করতে চায়। তার পর আর কোনও পাত্তাই নেই ওদের। গাড়িটা থামিয়ে বললাম, "এই সাগ্নিক, যাচ্ছ কোথায়?"

আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চিনতে পেরে ও বলল, "ওহ, শুভ্রদা আপনি? লেক ক্লাবে প্র্যাকটিস করতে গেছিলাম। এখন বাড়ি ফিরছি।"

বললাম, "উঠে এসো। চলো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাই।"

"চলুন।" বলে সাগ্নিক গাড়িতে উঠে এল।

বললাম, "লেক ক্লাবে তুমি কী প্র্যাকটিস করো?"

"রোয়িং, আগে খুব সিরিয়াসলি করতাম। এখন আর সময় পাই না। বাচ্চাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আসি।"

"আজ অফিস ছিল না?"

"ছিল। তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছি।"

"তোমার অফিসটা কোথায়?"

"সেই নর্থ ক্যালকাটায়। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সাগ্নিক ছেলেটা প্রথম দিন আলাপের সময় বলেছিল বটে, ও মাইক্রো বায়োলজিস্ট। গাড়ি চালাতে চালাতেই বললাম, "সারাদিন ব্যাক্টেরিয়া আর ভাইরাস নিয়ে চর্চা করতে তোমার ভাল লাগে?"

"সত্যি বলতে কী, খারাপই লাগে। তার উপর যা মাইনে পাই, একদম পোষায় না। খুব পরিশ্রম করতে হয়, বুঝলেন।

pathagar.net

ডাক্তাররাও আমাদের খুব এক্সপ্লয়েট করেন। আপনারা ভাল আছেন শুভ্রদা। সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছেন।"

"তার মানে তুমি বলছ, আমাদের পরিশ্রম করতে হয় না?"

"না, তা বলছি না। তবে আপনাদের লাইফটা অনেক সিকিওরড। আমাদের মতো নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না।"

"বিয়ে করেছ?"

"না, সাহস হয়নি। লেক গার্ডেন্সেরই একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমটেম করতাম। আমার রোজগার শুনে পালিয়েছে।" বলেই হা হা করে হেসে উঠল সাগ্নিক। ছেলেটাকে আমার বেশ ভাল লেগে গেল।

"বিদেশে চলে যাচ্ছ না কেন?"

"চেষ্টা করছি। আমেরিকা থেকে একজন খুব নামী প্রফেসর ক'দিন আগে আমাদের এখানে এসেছেন। কলেরার ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে গবেষণা করার জন্য। তাঁর সঙ্গে সামান্য কথা হয়েছে। দেখি কী হয়?"

"কেন, আমেরিকায় কলেরা রোগটা নেই?"

"না নেই। আমেরিকান গভর্নমেন্ট ভয় পাচ্ছে, উগ্রপন্থীরা লোক মারার জন্য ওখানে হঠাৎ কলেরার ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে দিতে পারে। যদি দেয়, তা হলে কীভাবে দ্রুত তা রোখা যায়, সেটা জানার জন্য মাইক্রো বায়োলজিস্ট ভদ্রলোককে আমেরিকান গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছে। তিনি অবশ্য বাঙালি। ডাঃ সুনীল পালচৌধুরী। আমি কলেরার ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। তাই ভদ্রলোককে সাহায্যও করছি। মনে তো হচ্ছে, উনি আমার উপর খুব খুশি।"

"দেখো তা হলে। ওরা কত আগে থেকে ভাবে।"

"অ্যানথ্রাক্সের পর থেকে আমেরিকা খুব ভয় পেয়ে গেছে। সেজন্যই ওরা এত সতর্ক। ডাঃ পালচৌধুরী আমাকে বলছিলেন, ফিরে গিয়ে আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

কিন্তু আমার যা পোড়া কপাল, জানি হবেটবে না।"

"চেষ্টা করো। নিশ্চয়ই হবে।"

"আপনার মুখে চপ কাটলেট পড়ুক শুভ্রদা।" বসেই ফের হাসল সাগ্নিক।

গাড়িটা রামমোহন স্কুলের দিকে বাঁক নিতেই ও বলল, "এখানে গাড়িটা রাখুন শুভ্রদা। বাড়ির কাছে এসে গেছি। ওই যে টিনের চালের বাড়িটা দেখছেন, ওটাই আমাদের। লেক গার্ডেন্সে এই একটাই টিনের চালের বাড়ি। আপনার মনে থাকবে।"

সত্যিই লেক গার্ডেন্সে এ রকম কোনও বাড়ি আছে বলে আমার জানা ছিল না। এখানে উচ্চবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্তদের বাস। সাগ্নিকদের আর্থিক অবস্থা তা হলে ভাল না। ওর সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহল হল। বললাম, "চলো, আমার বাড়িতে চলো। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা মারা যাক।"

"চলুন তা হলে।" গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলার জন্য হ্যান্ডেলে হাত দিয়েছিল সাগ্নিক। হাতটা সরিয়ে নিল। তার পর বলল, "আপনাকে আমরা যা মনে করেছিলাম, এখন দেখছি, আপনি তা নন।"

"কী মনে করেছিলে আমাকে?"

"দাম্ভিক। কাউকে পাত্তাটাত্তা দেন না। হা হা. কিছু মনে করছেন না তো? আসলে পুজো কমিটির ছেলেরা যদি শোনে, আপনি নিজে আমাকে ডেকে গাড়িতে তুলেছেন তা হলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না।"

pathagar.net

আমার সম্পর্কে এই ধারণাটা হওয়া স্বাভাবিক। স্কুল লাইফে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কখনওসখনও ক্রিকেট খেলতাম। তবে সেই ব্যাচের ছেলেগুলোকে এখন আর চোখে পড়ে না। আমারও সময় নেই কারও সঙ্গে মেশার। একটু হেসে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। লাভলি

দরজা খুলে দিয়ে আমার সঙ্গে সাগ্নিককে দেখে সরে গেল। এই মেয়েটাকে এ জন্যই আমার ভাল লাগছে। কখন কী করতে হবে ওকে বলে দিতে হয় না। আমি জানি, একটু পরেই ও চা নিয়ে হাজির হবে।

ড্রয়িংরুমে বসে বললাম, "বলো সাগ্নিক, তোমাদের পুজোর হাল কী?"

"আপনি তো আমাদের হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।"

"পাড়ায় আর কেউ নেই যাকে প্রেসিডেন্ট করতে পারো?"

"আছে। তবে সব নন বেঙ্গলি। লেক গার্ডেন্সে প্রচুর সাউথ ইন্ডিয়ান আর মারোয়াড়ি। ওদের কাছে হয়তো চাইলে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা কোনও অবাঙালিকে প্রেসিডেন্ট করতে চাই না।"

"সন্ধ্যা মুখার্জি তো এখানে থাকেন। তাকে বলো।"

"কার কথা বলছেন? গায়িকা? না, উনি কোনও ব্যাপারে থাকেন না।"

"তা হলে আমাকে প্রেসিডেন্ট হতেই হবে?"

"হলে আমাদের সুবিধা। একজন ইয়াং প্রেসিডেন্ট।"

"ঠিক আছে। আমি রাজি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ শুভ্রদা। আমরা একটু ভরসা পেলাম। এ বার আমরা ফাটিয়ে দেব। দেখি, যোধপুর পার্কের ঠাকুর এ বার কে দেখতে যায়?"

সাগ্নিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ কথা সে কথার পর হঠাৎ ও বলে উঠল, "শুভ্রদা, সেদিন আপনার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিলেন মিঃ মজুমদার।"

"কে মিঃ মজুমদার?"

"হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর। ডাঃ অনিল মজুমদার। আমাদের এই লেক গার্ডেন্সেই তো থাকেন। স্টেট ব্যাঙ্কের ও দিকে।"

pathagar.net

"তাই নাকি? কী জিজ্ঞেস করছিলেন?"

"আমরা যখন বললাম, আপনাকে আমরা পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট করছি, তখন শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।"

"তোমাদের সঙ্গে ওঁর খুব ভাল সম্পর্ক?"

"হ্যাঁ খুব। এই কিছুদিন আগে ওঁর বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়েছিল। তখন আমরা খুব সাহায্য করেছিলাম।"

"কী হয়েছিল?"

"বিশ্রী ব্যাপার। আসলে ভদ্রলোক খুব খারাপ না। ওঁর ছেলেটা বাজে। রিসেন্টলি বিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের। পাড়ারই মেয়ে। আমাদের সবার চেনা। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটা সুইসাইড করল। ওর বাপের বাড়ির লোকেরা বলছে, মার্ডার। এ নিয়ে পাড়ার ছেলেরা দু'ভাগ হয়ে গেছিল। মন্ত্রীটন্ত্রী জানাশোনা। তাই পুলিশ চেপে দিল কেসটা। না হলে ববি...মানে মিঃ মজুমদারের ছেলে ফেঁসে যেত।"

আচ্ছা। তা হলে এই ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। শালা অনিল মজুমদার সেদিন আমার সঙ্গে খুব রংবাজি মেরেছিল। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। সাগ্নিকের কাছ থেকে খুঁটিনাটি সব জেনে নিলাম। তার পর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম, "আচ্ছা, সাগ্নিক, সেদিন তুমি একটা কথা বলেছিলে আমাকে। সার্সের ভাইরাস নাকি অন্য গ্রহ থেকে এসেছে? কথাটা কি ঠিক?"

"বাঃ, আপনার মনে আছে তো? কাগজে পড়েননি? কথাটা তো বলেছেন ডাঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর। উনি অবশ্য অনেকদিন ধরেই বলে যাচ্ছেন, পৃথিবীতে এ রকম অনেক ভাইরাস আসছে অন্য গ্রহ বা গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে। উল্কাপাতের সময় পৃথিবীর বাইরে থেকে এই রকম কিছু... কী বলব... আণুবীক্ষণিক জীব আমাদের বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। সার্স রোগটা হয় করোনাভাইরাস থেকে। ডাঃ নারলিকর বলছেন, ওই ভাইরাসটাও বাইরে থেকে এসেছে।"

বললাম, "আশ্চর্য, তাই যদি হয়, তা হলে তো পৃথিবীর বাইরেও জীবের অস্তিত্ব আছে, স্বীকার করতে হবে।"

"কারেক্ট। সেটাই ডঃ নারলিকর বলতে চান। বিবিসি চ্যানেলে আমি ওঁর বক্তব্য শুনেছি। কী বলেছেন শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। বললেন, করোনা ভাইরাসের নামার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল হিমালয় অঞ্চলে। কারণ ওখানকার বায়ুমণ্ডল পাতলা। কিন্তু এই ভাইরাস ওখানে না নেমে চিনের দিকে চলে যায়। বাতাসের টানে। হিমালয় অঞ্চলে নামলে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হত, বলুন তো? আমরা তো ফাইটই করতে পারতাম না ওই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মারা যেত।"

"ঠিকই বলেছ। আমরা কমব্যাট করতে পারতাম না।"

"এই দেখুন না, আমেরিকার ওষুধের কোম্পানিগুলো অলরেডি সার্সের ওষুধ বের করে ফেলেছে। আপনারা পারবেন?"

"সম্ভব না। রিসার্চ করার জন্য আমাদের অত টাকা নেই।"

"আমেরিকায় এখন এক ধরনের ভাইরাস খুব ছড়িয়েছে। ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস। ডাঃ পালচৌধুরীর মুখে শুনলাম, প্রচুর লোক নাকি মারা যাচ্ছে।"

"রোগটা কী?"

"এক ধরনের এনকেফেলাইটিস। ব্রেনেও অ্যাটাক করে। এই ভাইরাস থেকে অনেক কিছু হতে পারে। আপনি কোমায় চলে যেতে পারেন। আপনার প্যারালিসিস হতে পারে। মারা যেতে পারেন।"

"সিম্পটম কী?"

"জ্বর, গায়ে ব্যথা, গ্ল্যান্ড ফোলা। এই সব আর কী। আমাদের এখানে ছড়ালে প্রচুর লোক শেষ হয়ে যাবে।"

"ভাইরাস ক্যারি করে কারা?"

"মশা। শুধু মানুষ নয়, পাখিও এই ভাইরাসের অ্যাটাকে

মারা যাচ্ছে প্রচুর। ভাবুন, আমাদের এখানে উল্টোডাঙা বা বেলেঘাটার খালপাড়ে যদি এ রকম ভাইরাস এনে আমি ছেড়ে দিই, তা হলে কী অবস্থা হবে? দশ বারো দিনের মধ্যে সারা কলকাতায় রোগটা ছড়িয়ে যাবে।"

"ইচ্ছে করলে ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে দেওয়া যায়?"

"আপনাকে তা হলে কী বললাম এতক্ষণ? অ্যানথ্র্যাক্সের ব্যাপারটা তো জানেন। সামান্য পাউডারের মধ্যে ভাইরাস মিশিয়ে সারা আমেরিকাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল উগ্রপন্থীরা। ইচ্ছে করলে বদবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও লোক এটা করতে পারে। আমরা কাজ করার সময় প্রচুর ধরনের ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া হ্যান্ডেল করি ল্যাবরেটরিতে। ধরুন, একটা টিউবে করে কোনও এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া আমি লুকিয়ে বের করে আনলাম। তার পর সেটা তুলে দিলাম আপনার হাতে। ব্যস, আপনি আপনার ওষুধ বেচার জন্য, তখন যা ইচ্ছে করতে পারেন। ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে দিলেন। লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তো তাদের ওষুধ কিনতে যেতে হবেই।"

হেসে বললাম, "তুমিই তো বদবুদ্ধিটা ছড়িয়ে দিচ্ছ সাগ্নিক।"

"না, না। আমি কথার কথা বলছি। এ রকম হতেই পারে। তবে এটা করতে গেলে আপনাকে কিন্তু আমাদের মতো একজন মাইক্রো বায়োলজিস্টকে অবশ্যই হাত করতে হবে।"

এই সময় ট্রে-তে করে দু'কাপ চা নিয়ে এল লীভলি। একটু আগে একটা ম্যাক্সি পরে ছিল। এখন শাড়ি। আঁচলে গা ঢাকা। আমাকে বলল, "শুভ্রদা, তোমার পিসিমা ফোন করেছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাচ্চাকে নিয়ে ওরা আজ সকালে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তোমাকে আজই যেতে বলেছেন।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কোনও-আপদ বিপদ হল নাকি? বললাম, "এতক্ষণ বলিসনি কেন? নিশ্চয়ই

ইমপরট্যান্ট ব্যাপার।"

লাভলি মুখ গম্ভীর করে চলে গেল। চায়ে চুমুক দিতেই সাগ্নিক বলল, "শুভ্রদা, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না বলুন?"

"না, বলো।"

"আপনার সঙ্গে মনা বলে যে ছেলেটাকে রোজ দেখি, সে কিন্তু গোবিন্দপুরের খুব খতরনাক ছেলে।"

"তার মানে?"

"ছেলেটা মার্ডার-ফার্ডারও করেছে। একটু সাবধান। লেক গার্ডেন্সের ছেলেদের সঙ্গে ওদের একবার ঝামেলা হয়েছিল। তখন ওর ফর্মা দেখেছি। পিস্তল নিয়ে আমাদের অ্যাটাক করতে এসেছিল।"

"আমাদের বাড়িতে যে মহিলা কাজ করেন, ও তার ছেলে।"

"যে-ই হোক, ছেলেটা মারাত্মক। আপনি জেনে রাখুন।"

"ভাল করলে আমাকে জানিয়ে।"

চা শেষ করেই সাগ্নিক উঠে পড়ল। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল, বাড়ি ফেরার সময় নিউ মার্কেট থেকে লাভলির জন্য আজ কয়েকটা ম্যাক্সি, নাইট গাউন, আর সিন্থেটিক শাড়ি কিনে এনেছি। সেগুলো গাড়ির পিছনের সিটেই পড়ে আছে। ফের গাড়ির দরজা খুলে প্যাকেটটা বের করে আনলাম। ভেতরে এসে লাভলিকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। গেল কোথায়?

কোটটা খুলে সোফায় ছুঁড়ে ফেললাম। সারাটা দিন আজ অফিসে খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। আসার সময় মৌলালিতে ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসেও গিয়েছিলাম। ডাঃ অরণি সাহা সত্যি সত্যিই ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। নতুন একজন ডিরেক্টর হয়ে এসেছেন। নাম ডাঃ বিজন বসু। এই লোকটাকে ম্যানেজ করতেই হবে। ড্রাগ কন্ট্রোলের

pathagar.net

ডিরেক্টরকে হাতে রাখতে না পারলে ব্যবসা করা যাবে না।

ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করে সোফায় বসেছিলাম। হঠাৎ লাভলির গলা, "পিসিমার বাড়ি তোমাকে যেতে হবে না শুভ্রদা। উনি ফোনও করেননি।"

"তখন বললি যে?"

"তোমার সঙ্গে যে ছেলেটা এসেছিল, তাকে তাড়ানোর জন্য।"

"কেন?"

"ছেলেটাকে আমি চিনি। ভাল না। গোবিন্দপুরের বস্তির একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে ছিল। মেয়েটার বাবা বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ও বিয়ে করল না। বস্তির মেয়ে বিয়ে করলে নাকি সম্মান চলে যাবে। মনারা অনেক চেষ্টা করেছিল। রাজি করাতে পারল না। শেষে মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মরল।"

শুনে থ হয়ে বসে রইলাম। লাভলি মিথ্যে কথা বলার মেয়ে না। কিছু অতিরঞ্জিত করছে বলেও মনে হয় না। তা হলে সাগ্নিক ছেলেটা এ রকম! গাড়িতে আসার সময় তো আমাকে উল্টো কথা বলল। একটা মেয়েকে নাকি ভালবেসেছিল। ওদের টিনের চালের বাড়ি দেখে মেয়েটাই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। উফ্ জগতে কত রকমের লোক আছে। ভাবা যায় না।

লাভলি সোফায় আমার পাশে এসে বসেছে। বিকেলে বোধহয় গা ধুয়েছে। ওর গা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ পাচ্ছি। ও কোনও পারফিউম ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। তবুও নিজেকে এত সুন্দর আর তাজা রাখে কী করে, জানি না। গত তিন-চার দিন ধরে সময় ও সুযোগ পেলেই ওকে আমি আদর করছি। কাল সকালে তো কিচেন থেকে তুলে ওকে গেস্ট রুমে নিয়ে গেছিলাম। গত পাঁচ বছরে ওর দাম্পত্য জীবনের সব থেকে বড় ঘাটতিটা আমি এই কয়েকটা দিনেই মনে হয়, পূরণ

pathagar.net

করে দিয়েছি। ওর চেহারার মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করছি। ও অনেক শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়েছে। সোফার উপর প্যাকেটটা দেখে লাভলি বলল, "এর ভেতর কী আছে গো?"

"তোর কয়েকটা জিনিস। খুলে দ্যাখ।"

পাকেটটা খুলে লাভলি বলে উঠল, "কোনও মানে হয়, আমার জন্য এতগুলো টাকা নষ্ট করার। কেন আনতে গেলে শুভ্রদা?" লাভলি একটা করে শাড়ি খুলছে, আর ওর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠছে। "নাহ্, খুব অন্যায় করেছ তুমি।" অস্ফুট স্বরে ও বলল।

সোফার উপর পড়ে থাকা সব থেকে দামি নাইট গাউনটা তুলে আমি বললাম, "এটা এক্ষুনি পরে আয়। আমি দেখব, তোকে কেমন মানিয়েছে।"

লাভলি ওঠার নাম করল না। আমার দিকে যখন তাকাল, তখন ওর দু'চোখে জল টলটল করছে। ওকে কাছে টেনে এনে বললাম, "ফের কান্না। ভালবেসে একটা জিনিস এনে দিলাম। পরবি না?"

"কেন মায়ায় বাঁধছ শুভ্রদা। আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম, অনেক দূরে সরে যাব। তোমার দেওয়া এ সব জিনিস যখন দেখব, তখন নিজেকে সামলাব কী করে বলো? তখন তো তোমাকে আমি পাব না।"

"কে বলেছে তোকে দূরে সরে যেতে? আমি তো বলিনি। তুই যেখানেই থাকবি আমার চোখের সামনে থাকবি। শোন, এর পর থেকে তোর সব ভার আমার। যা, এ বার ওঠ। ভাল মেয়ের মতো এই নাইট গাউনটা পরে আয়। ততক্ষণে স্নানটা সেরে নিই।"

বলেই সোফা ছেড়ে উপরে উঠে এলাম। বাথরুমে ঢুকে স্নান করতে করতে সাগ্নিকের কথাই মনে হতে লাগল। ভাগ্যিস লাভলি আমায় সাবধান করে দিল। না হলে ছেলেটার সব কথা আমি বিশ্বাস করে যেতাম। ছেলেটার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

তা থাকুক। ক্ষতি নেই। কিন্তু মিথ্যে কথা বলার অভ্যেসও আছে। টাকার লোভ দেখিয়ে এই ছেলেটাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেওয়া যায়। সাগ্নিক, মনা—এই ধরনের কিছু ছেলেকেই আমার দরকার। আমার কোম্পানিকে আরও অনেক বড় করতে হবে। অনেক প্ল্যান আমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্নান শেষ করে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরতেই দেখি, হাতে পাজামা-পাঞ্জাবি নিয়ে লাভলি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সদ্য কিনে আনা ফিনফিনে নাইট গাউন। দেহের প্রতিটি খাঁজ ফুটে উঠেছে। ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বললাম, "সুপার্ব। আয়নায় দ্যাখ, তোকে কেমন দেখাচ্ছে।"

আমার ঘরে আয়না নেই। বিরাট আয়না আছে বাথরুমে। হাত ধরে ওকে আয়নার সামনে এনে দাঁড় করালাম। পিছন থেকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তোকে এত সুন্দর লাগছে। অথচ তুই ড্রেসটা পরতেই চাইছিলি না।"

আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভলি অস্ফুট স্বরে বলল, "আমার কপালে এত সুখ সইবে শুভ্রদা?"

ওর ঘাড়ের কাছে চুমু দিয়ে বললাম, "সইবে। এখন ঘরে চল। তোকে ভীষণ চটকাতে ইচ্ছে করছে।"

পনেরো

pathagar.net

পিসিমার বাড়ি যাব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় লাভলি এসে বলল, "তিনজন ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করছেন। ভেতরে এনে বসাব?"

বললাম, "কে বল তো? পাড়ার সেই ছেলেরা?" আজ রোববার। ছুটির দিন। ওই ছেলেগুলো আসতেও পারে।

"না গো। অন্য কেউ। প্রত্যেকেই বয়স্ক।"

আজ সকালে গীতামাসি কাজে এসেছে। কিচেনে কী সব

করছে, কে জানে? বললাম, পিসির বাড়িতে গেলে আমাকে না খাইয়ে ওরা ছাড়বে না। তবুও কী সব রান্না করতে বসেছে। তাই লাভলির কোনও কাজ নেই। মনার বাবা সুস্থ হয়ে উঠছে। ডাক্তাররা বলেছে, পেটের ঘা শুকিয়ে গেলেই নাকি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। সেই কারণে গীতামাসির মেজাজ খুব ভাল। ঘুম ভাঙার পর থেকেই গীতামাসির বকবকানি শুনতে শুনতে আমি এত বিরক্ত, শেষ পর্যন্ত পিসিমার বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেললাম। টুবলুর বাচ্চাটাকে একবার দেখে আসা দরকার।

আমার উত্তরের অপেক্ষায় লাভলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ ক'দিন ও আমার আনা নতুন পোশাকগুলো পরছিল। গীতামাসিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টেছে। ফের সেই পুরনো সালোয়ার-কামিজে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে আমি সামান্য উত্তেজিত হলেও নিজেকে দমিয়ে রাখলাম। গীতামাসির উপস্থিতিতে এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যাতে সন্দেহ করে। লাভলিকে বললাম, "ভদ্রলোকদের ড্রয়িং রুমে বসা, আমি ড্রেস করেই আসছি।"

মিনিট পাঁচেক পরেই নীচে নেমে তিনজনকে দেখে কাউকেই চিনতে পারলাম না। সবাই টাই স্যুট পরা। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। আমি হাত জোড় করে নমস্কার করতেই একজন বলে উঠলেন, "অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আসার জন্য আমাদের মাফ করবেন শুভ্রবাবু। আমি ডাঃ নীহার সামন্ত। বেঙ্গল ডক্টর্স অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট। আর এঁরা দু'জন হলেন ডাঃ কিশুক ব্যানার্জি ও ডাঃ মলয় সাহা।"

"বসুন। আর মিনিট দশেক পরে এলে আমাকে পেতেন না।"

ডাঃ সামন্ত বললেন, "আসলে কী জানেন, আমরা এই লেক গার্ডেন্সেই ডাঃ অনিল মজুমদারের বাড়িতে এসেছিলাম। ওঁকে নিশ্চয়ই চেনেন। হেলথ সার্ভিসের

ডিরেক্টর। ওর সঙ্গে কথা বলে ফেরার পথে একটা চান্স নিলাম। যদি আপনার দেখা পাওয়া যায় আর কী।"

ডক্টর্স অর্গানাইজেশনের লোকজন। নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপারে ডোনেশন চান। দাদুর কাছেও ডাক্তারদের আসতে দেখেছি। দাদু কখনও ফিরিয়ে দিত না। বলত, ডাক্তাররা হল আমাদের লক্ষ্মী। ওরা যদি প্রেসক্রিপশনে আমাদের ওষুধের কথা না লেখে তা হলে কোম্পানি লাটে তুলে দিতে হবে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র বললাম, "বলুন আপনাদের জন্য আমি কী করতে পারি?"

"আমাদের অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে আমরা ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে একটা ছোট হাসপাতাল করছি। সরকারের তরফ থেকে কিছু জমি আমরা পেয়ে গেছি। এখন বাড়ি তোলার জন্য কিছু টাকার দরকার। সে ব্যাপারেই আপনার কাছে আসা।"

আমার ধারণাটা তা হলে ঠিক। কারণটা ডোনেশন। বললাম, "কোথায় পেয়েছেন এই জমিটা?"

"পিয়ারলেস আর রুবি হাসপাতালের ঠিক মাঝখানে। ও দুটো হাসপাতাল তো বড়লোক পেশেন্টদের জন্য। আমরা এমন একটা হাসপাতাল করতে চাইছি, যেখানে সাধারণ লোক গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে পারে।"

বললাম, "বাঃ খুব ভাল। আপনাদের অর্গানাইজেশনে কতজন ডাক্তার আছেন?"

"সারা রাজ্য জুড়ে তা প্রায় পনেরো হাজারের মতো হবেন। সবাই লিডিং প্র্যাকটিশনার্স। কলকাতায় প্রায় হাজার দশেকের মতো।"

"নিজেদের প্র্যাকটিস বন্ধ রেখে আপনারা এই হাসপাতাল চালাতে পারবেন?"

"কেন পারব না? আমরা অনেকেই নার্সিংহোমের সঙ্গে ইনভলভড। কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু নার্সিং হোম এক

ধরনের অসাধু লোকেরা চালাচ্ছে। ওদের লক্ষ্যই হচ্ছে, পেশেন্টেদের ধনেপ্রাণে শেষ করে দেওয়া। সেটা আমরা বন্ধ করতে চাই। সস্তায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। আপনাদের মতো লোকেরা সাহায্য না করলে এই হাসপাতাল আমরা তৈরিই করতে পারব না।"

"আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাছে গেছিলেন?"

"হ্যাঁ গেছিলাম। পশুপতিবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেলাম।"

"উনি কত ডোনেশন দেবেন বললেন?"

"এখনও কমিট করেননি। তবে আমরা দু'লাখ টাকা আশা করছি।"

এই সময় লাভলি এসে চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে আমি ডাঃ সামন্তকে বললাম, "আপনাদের এই হাসপাতালের একটা ব্লক তৈরি করতে কত খরচ হবে? ধরুন, যদি আমি ইমারজেন্সি ব্লকটা করে দিই?"

তিন ডাক্তার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তার পর ডাঃ সামন্ত বললেন, "ধরুন, পাঁচ লাখের মতো।"

"ব্লকটা কিন্তু আমার দাদু শিবপ্রসাদ মিত্রের নামে হবে।"

"তাতে কোনও অসুবিধে নেই। স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে।"

"প্রোজেক্টটা আপনারা কবে নাগাদ শুরু করতে চান?"

"এই এপ্রিলেই। পরে আপনার কাছে এসে পুরো প্রোজেক্টটা আমি দেখিয়ে যাব।"

"টাকাটা আমি দেব। কিন্তু তার বদলে আপনারা আমার কী সাহায্যে আসবেন?"

"কেন, আমরা তো আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের মেডিসিন প্রেসক্রাইব করি।"

"আর একটা শর্ত, আমার প্রোপোজালের কথা যেন এখনই কেউ না জানতে পারেন। এটা আপনাদের কাছে আমার

pathagar.net

রিকোয়েস্ট।"

"ঠিক আছে। কেউ জানবেন না। আমরা উঠছি তা হলে।"

"আপনাদের সবার কন্টাক্ট নাম্বারগুলো আমাকে দিন। আমার অফিসের কেউ গিয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

তিন ডাক্তারই তাঁদের কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি দরজা অবধি এগিয়ে দিলাম। প্রতিনমস্কার করে ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কার্ডগুলোতে আমি একবার চোখ বোলালাম। বাহ, ডাঃ কিংশুক ব্যানার্জি হলেন গায়েনোকোলজিস্ট। আর ডাঃ মলয় সাহা চাইল্ড স্পেশালিস্ট। মনে মনে হাসলাম। এই দু'জনকেই আমার ভবিষ্যতে দরকার হবে। অন্তত লাভলির জন্য। কার্ড তিনটে কোটের পকেটে ফেলে রাখলাম।

যাদবপুরে পিসিমার বাড়ি আমি গিয়েছিলাম প্রায় বছর দুয়েক আগে। টুবলুর বিয়ের সময়। তাও রাতের বেলায়। বাঘা যতীনে বাড়ি খুঁজে বের করতেই আমার কালঘাম ছুটে গেল। বাঘা যতীন অঞ্চলটা এত বদলে গেছে, চিনতেই পারছিলাম না। রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে। ঝকঝকে সব দোকান। আগে এখানকার লোকজন কিছু কেনার হলে ছুটত গড়িয়াহাটের মোড়ে। এখন যাওয়ার দরকারই নেই। পিসিমার বাড়ির ঠিকানা জানি না। শুধু একটা কথাই মনে ছিল, এস পি ডি ব্লক। তার পর টুবলুর নাম করতেই লোকে দেখিয়ে দিল। সাংবাদিকদের কত লোক চেনে!

আমাকে দেখে পিসিমা অবাক। ভাবতেই পারেনি, বিনা নেমন্তন্নে আমি হাজির হব। বোধহয় পুজোর ঘরে ছিল। দৌড়ে এসে বলল, "শুভো, তুই?"

"কেন আসতে নেই?"

"আসবি না কেন বাবা। তোরা এত ব্যস্ত লোক। অত ব্যবসা চালাস। আত্মীয়তা করার তোদের সময় কই? তুই

এসেছিস বলে আমি খুব খুশি হয়েছি রে।" টুবলুর বউ এসে আমায় প্রণাম করল। এখনও এ অঞ্চলে এই সব রীতিনীতি আছে তা হলে। বেতের একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, "বসুন দাদা।" ওর মুখ থেকে দাদা ডাকটা শুনে খুব ভাল লাগল।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই প্রথমে গেছিলাম দক্ষিণাপণে। জানতাম না, রোববার দক্ষিণাপণে সব দোকান বন্ধ থাকে। সেদিন লাভলির জন্য যখন নিউ মার্কেটে ঢুকেছিলাম, তখনই আমার উচিত ছিল, ওখান থেকে টুবলুর ছেলের জন্য কিছু কিনে রাখা। দক্ষিণাপণ থেকে বেরিয়ে শেষে গেলাম গড়িয়াহাটের মোড়ে। সেখানে একগাদা জামা-প্যান্ট আর খেলনা কিনে এনেছি। সেগুলো এগিয়ে দিয়ে টুবলুর বউকে বললাম, "যাও এবার আমার জেঠুকে নিয়ে এসো।"

"দাদা, ও তো এখন ঘুমোচ্ছে।"

পিসিমা বলল, "ব্যাটা খুব পাজি হয়েছে বুঝলি। দিনের বেলায় ঘুমোয়। আর রাতের বেলায় জেগে থেকে আমাদের ঘুমের বারোটা বাজায়। তুইও এমন ছিলিস। তোর মাকে পাক্কা চারটে মাস রাতে ঘুমোতে দিসনি।"

"তুমি বললে দাদুর মতো ওর গায়েও নাকি জড়ুল আছে?"

"আছে তো। আমি তো বৌমাকে বলি, আমার কাকাই তোর কোলে ফিরে এসেছে। তা, তুই কী খাবি বল। আমাদের এখন অশৌচ। একেবারে নিরামিষ। তোর খুব প্রবলেম হবে।"

"না পিসিমা। খাওয়াদাওয়ার ঝামেলার মধ্যে যেও না। সকাল থেকে গীতামাসি কী সব রান্না করতে বসেছে। বারবার বলে দিয়েছে, বাড়িতেই খেতে হবে।"

"তা কী হয় বাবা? হ্যাঁ রে সেদিন তোদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। একটা মেয়ে ফোন ধরেছিল। গীতার খোঁজ

pathagar.net

করলাম, বলল হাসপাতালে গেছে। মেয়েটা কে রে? নতুন কাউকে রেখেছিস নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে লাভলির তখনকার ব্যাপারটা পিসিমা জানে কি না, আমি জানি না। জানতেও পারে। কেননা বাড়ির ব্যাপারে দাদু অনেক সময় পিসিমার মতামত নিত। তাই ঘুরিয়ে বললাম, "গীতামাসি কয়েকটা দিন আসছিল না। তাই ওর ভাইঝিকে রেখে দিয়েছিল। রান্না করার জন্য।"

"কোন ভাইঝি? আগে যে আসত, সেই পাকা মেয়েটা?"

"না না। তার তো কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। এ অন্য ভাইঝি। বাচ্চা মেয়ে।" একটা মিথ্যে ঢাকার জন্য আমাকে তিনটে মিথ্যে বলতে হল।

শুনে পিসিমা বলল, "গলা শুনে মেয়েটাকে তো বাচ্চা বলে মনে হল না? কী জানি বাবা, সাবধান। সারাটা দিন বাড়ি খালি থাকে। যা-তা লোককে বাড়িতে রাখিস না। দিনকাল খুব খারাপ।"

বললাম, 'তুমি অযথাই চিন্তা করছ পিসিমা। টুবলু কোথায় গো? ওকে তো দেখছি না? বাড়িতে নেই?'

"আছে। বাথরুমে। এখুনি বেরবে।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই বাথরুমের টিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল টুবলু। গামছা পরা অবস্থায়। ও কে দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। বললাম, "এত বড় কাগজের রিপোর্টার তুই। এখনও গামছা ছাড়তে পারলি না?"

মাথা মুছতে মুছতে টুবলু হাসিমুখে বলল, "তোয়ালে আছে। তবে সেটা ট্যুরে যাওয়ার জন্য। বাড়িতে ইউজ করার মতো তোয়ালে কেনার পয়সা আমার নেই শুভ্রদা। তা কেমন আছ, বলো।"

"ভাল। তোর সঙ্গে একটা দরকার ছিল। আর্জেন্ট ব্যাপার।"

"দাঁড়াও, তা হলে পাজামা গলিয়ে আসি।" বলেই ঘরের ভেতর ঢুকে গেল টুবলু। দু'-তিন কাঠার উপর বাড়ি। আগে দর্মার দেওয়াল আর টিনের চাল ছিল। এখন কংক্রিটের ছাদ। দু'টো মাত্র ঘর। মাঝে ছোট্ট একটা উঠোন। উল্টো দিকে রান্নাঘর আর বাথরুম। দাওয়ায় বসে দেখতে পেলাম, টুবলুর বউ রান্না করছে। ওর সঙ্গে কী ফিসফাস করে, পায়ে চটি গলিয়ে পিসিমা বেরিয়ে গেল। বোধহয় দোকান থেকে কিছু কিনে আনবে। এই সময়টায় না এলেই ভাল হত। শুধু শুধু এদের ব্যতিব্যস্ত করলাম।

ডান হাতে একটা মশা কামড়াল। এক চাপড়ে মেরে ফেললাম। মশারা এমনিতেই সাত দিনের বেশি বাঁচে না। বেচারি একটু আগেই মারা পড়ল। ছোটবেলায় এই মশার ভয়েই পিসিমার বাড়ি আসতে চাইতাম না। মশারির তলায় শুতে হবে, এই অস্বস্তিতে। কে জানে, এখুনি চাপড়ে যাকে মারলাম, সেই মশাটা কোনও ভাইরাস বয়ে বেড়াচ্ছিল কি না? হাতে সামান্য রক্তের ছিটে। তার মানে, কারও রক্ত শুষে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কী ভয়ানক! সঙ্গে সঙ্গে আমার ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের কথা মনে পড়ল। ক'দিন আগেই ওই মারাত্মক ভাইরাসের গল্প শুনিয়ে গেছিল সাগ্নিক।

"শুভ্রদা, এবার বলো তোমার কী এমন আর্জেন্ট দরকার?"

বললাম, "তোদের কাগজে একটা রিপোর্ট করতে পারবি?"

"কী নিয়ে? ইন্টারেস্টিং কিছু?"

"খুব ইন্টারেস্টিং। হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর অনিল মজুমদারকে চিনিস?"

"খুব ভাল করে চিনি। লালাগোলায় আমার সঙ্গে একদিন তর্কাতর্কিও হয়েছিল। শিশুমৃত্যু নিয়ে আমার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল। সেটা ওঁর পছন্দ হয়নি।"

"উনি আমাদের লেক গার্ডেন্সের দিকেই থাকেন। ওঁর

pathagar.net

বাড়িতে একটা মার্ডার হয়েছে। ছেলের বউ। সদ্য বিয়ে হয়েছিল। ওরা সুইসাইড বলে চালানোর চেষ্টা করছে।"

"মার্ডার যে হয়েছে, তুমি সেটা বলছ কী করে?"

"ওর বাপের বাড়ির লোকজন বলছে। মেয়েটাও লেক গার্ডেন্সের। এ নিয়ে পাড়ায় একদিন হইচইও হয়েছিল। পুলিশ নাকি স্টেপ নিতে চায়নি।"

"কেন?"

"অনিল মজুমদার হেলথ মিনিস্টারের ক্লাসমেট ছিল। এখন আমাদের মতো ওষুধ কোম্পানির মালিকদের কাছ থেকে টাকা তুলে মিনিস্টারকে দেয়। যারা টাকা দেয় না, তাদের ওষুধ গভর্নমেন্ট কেনে না। লোকটার উপর আমাদের অনেকেই চটা। মনে হয়, কাগজে যদি ঘটনাটা বেরোয়, তা হলে ঠাণ্ডা হবে। আর আমাদের মতো ব্যবসায়ীরা বেঁচে যাবে।"

"মেয়েটা মারা গেছিল কীভাবে জানো?"

"স্ট্রাঙ্গুলেশন। ওর বাপের বাড়ির লোকজনের মতে।"

"পোস্ট মর্টেম হয়েছিল কি না জানো?"

"সেটা বলতে পারব না। সেটা তোকে খোঁজ নিতে হবে।"

"মেয়েটার বাপের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারো?"

একটুকরো কাগজে সব লিখে নিয়ে গেছিলাম। পকেট থেকে সেটা বের করে দিলাম। তারপর বললাম, "শোন টুবলু, এর জন্য যদি খরচটরচ করতে হয়, তা হলে আমি রাজি আছি।"

"তোমার এত ইন্টারেস্ট কেন শুভ্রদা?"

"আমি ইলেকশন ফান্ডে টাকা দিইনি। আমাদের কোম্পানির নামে বাজে অভিযোগ এনেছে। লোকটাকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।"

ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে দেখি। কথাগুলো অন্য কাউকে বলেছ?"

"কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুই আমার রিলেটিভ। তাই তোর কাছে এলাম।"

"খবরটা আমি বের করার চেষ্টা করব শুভ্রদা। স্টোরিটা করার অসুবিধেও আছে। ডেডবডি পুড়িয়ে দিয়েছে। প্লাস হপ্তা খানেক আগের ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে যদি খবরটা দিতে পারতে, লোকটাকে আমি বাঁশ দিয়ে দিতাম।"

দাওয়ায় বসেই টুবলুর সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। ওর মুখে লালবাগের ভাইরাসের কথা শুনে মনে হল, ইনফ্লুয়েঞ্জা। কিন্তু তা হলে এত বাচ্চা মারা গেল কেন? নিশ্চয়ই ডাক্তারদের গাফিলতি। ওই সব অঞ্চলে সরকারি ডাক্তাররা রোজ হাসপাতালেই আসে না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে হয়তো অনেকেই মরত না। তারপর ওষুধ আর সরঞ্জামের অভাব। বাড়ির লোকেরাও অশিক্ষিত। সব মিলিয়ে ভাইরাসটা ছড়াবার সুযোগ পেয়েছে।

কাগজের অফিসে চাকরি করে বলে দেখলাম, টুবলু অনেক কিছু জানে। সমাজের অনেক নামী লোকের সঙ্গে ওর জানাশুনো। কথা বলার ফাঁকে ওর তিন-চারটে ফোন এল। একবার কী একটা ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বললেন ক্যালকাটা পুলিশের ডি সি সাউথ। টুবলু বেশ কড়া কড়া কথা বলল ভদ্রলোককে। রিপোর্টারদের কী অসীম ক্ষমতা। কানে না শুনলে বিশ্বাসই করতাম না। পুলিশকেও ধমকাচ্ছে। অনিল মজুমদারের কেসটা ও সংক্ষেপে বলে ডি সি সাউথকে জানিয়ে দিল, টালিগঞ্জ থানার ও সি-কে একদম ঝুলিয়ে দেবে, যদি ইনভেস্টিগেশন শুরু না করে।

সেদিন পার্ক হোটেলে জয়সওয়াল একটা কথা বলেছিল, বিজনেস যদি বাড়াতে চাস, তা হলে ক্ষমতার কাছাকাছি তোকে থাকতে হবে। টুবলুকে দিয়েই নাহয় সেই চেষ্টাটা শুরু করা যাক। ওর যোগাযোগ আছে। আমার টাকা। এই

কম্বিনেশন কতদূর যায় দেখি। টুবলু ছেলেটা এমনিতে ভাল। ওকে হাতে রাখতেই হবে। সেই সঙ্গে এমন কিছু করতে হবে, যাতে পিসিমা খুশি হয়। আমি জানি, টুবলু পিসিমার কথা খুব শোনে। মা অন্ত প্রাণ। পিসিমা কিছু বললে, ও না করতে পারবে না। ইস্, আজ ওর বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এলে পিসিমা খুব খুশি হত।

তাই দুপুরে খেয়ে যাওয়ার কথা যখন পিসিমা বলল, তখন আমি না করতে পারলাম না। বাড়িতে ডাইনিং টেবল নেই। পিসিমা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বলল, "তোর খুব অসুবিধে হবে রে শুভ্র। মেঝেতে বসে খাওয়ার অভ্যেস তো নেই। কী আর করবি? আমার এই বাড়িতে এমন একটু জায়গাও নেই, যেখানে ডাইনিং টেবল রাখি।"

ঝুরঝুরে আলু ভাজা, মুগের ডাল, পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর ছানার ডালনা। খুব সামান্য আয়োজন। কিন্তু খেতে আমার যেন অমৃতের মতো মনে হতে লাগল। পাশে বসে বারবার আফসোস করছে পিসিমা। এমন একটা দিনে তুই এলি, ভাল কিছু খাওয়াতেই পারলাম না। শুনে মনে মনে বললাম, একটা সত্যি কথা বলব পিসিমা, ভাল খাওয়া তো রোজই আমি বড় বড় হোটেলে খাই। এমন ভালবাসা দিয়ে কেউ কিন্তু আমাকে কোনও দিন খাওয়ায়নি। সত্যিই টুবলুটা ভাগ্যবান। তোমার মতো এমন একটা মমতাময়ী মা পেয়েছে।

মায়ের কথা আমার মনেই পড়ে না। মা নাকি আমাকে কোনওদিন ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ায়নি। সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে বলে। কথাটা আমি একবার শুনে ফেলেছিলাম, পিসিমার মুখে। কিচেনে পিসিমা কথা বলছিল গীতামাসির সঙ্গে। তখনই মায়ের উপর হঠাৎ রাগটা বেরিয়ে এসেছিল পিসিমার মুখ থেকে। এমন মা কারও হয় নাকি? আমি জানি না, কার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি। হয়তো গীতামাসির। তাছাড়া আর কে-ই বা হবে? পিসিমার বাড়িতে খেতে

pathagar.net

খেতেই আমার মনে হল, বাবা তা হলে এমনি এমনি অন্য মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তার যথেষ্ট কারণও ছিল।

খাওয়াদাওয়া সেরে, টুবলুর সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ কথা বলে পিসিমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম প্রায় দু'টো নাগাদ। বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের পাঁচটার সময় আবার আমাকে বেরোতে হবে লেক ক্লাবের দিকে।। চাঁদাটা আজই দিয়ে আসতে হবে। গাড়ি চালিয়ে বিজয়গড়ের কাছে আসা মাত্রই পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। সুইচ অন করতেই ও প্রান্তে রিঙ্কির গলা, "শুভ্র, তুমি কোথায়?"

ওর গলা শুনে অবাক হয়ে বললাম, "তুমি কোথায়?"

"মেনল্যান্ড চায়নায়। এখনই একবার আসতে পারবে? খুব বিপদে পড়েছি।"

"তুমি কবে কলকাতায় এলে রিঙ্কি?"

"উফ্ ও সব কথা পরে শুনো। দশ-বারোজন বন্ধুকে নিয়ে এখানে বার্থ ডে সেলিব্রেট করতে এসেছিলাম। হাজার দশেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। টাকাটা নিয়ে তুমি শিগগির চলো এসো। না হলে আমি বেরোতে পারছি না।"

ষোলো

অফিসে বসে ইন্টারনেট ঘাঁটছিলাম। হোক্কাইডোতে জয়দেব রায়চৌধুরীদের শিমবুন কোম্পানি সম্পর্কে কিছু জানার জন্য। হঠাৎ মিসেস ব্যানার্জি দরজায় উঁকি মেরে বললেন, "স্যার, আপনার কাছে কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী এসেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "ওঁকে ভেতরে নিয়ে আসুন।"

মিসেস ব্যানার্জি দরজাটা খুলে দিতেই দেখলাম, শুধু কামাখ্যাবাবুর স্ত্রীই নন, সঙ্গে ওর মেয়েও আছে। দাদুর

শ্রাদ্ধের দিন মেয়েটা আমাদের বাড়িতে আসেনি। কামাখ্যাবাবু মারা যাওয়ার পরদিন ভবানীপুরে ওঁদের বাড়িতে গেছিলাম। তখনও ও বাড়িতে ছিল না। ফলে ওকে দেখার সুযোগ পাইনি। আজ দেখলাম, বয়স তেইশ-চব্বিশ। পরনে হালকা নীল রঙের শাড়ি। কামাখ্যাবাবুর মতোই লম্বা। বেশ সুন্দরী, চেহারায় আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। ওর হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। দেখেই মনে হল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসেছে। চেয়ারে বসার সময় অ্যাটাচি কেসটা কার্পেটের উপর দাঁড় করিয়ে রাখল। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী বললেন, "উর্মির বাবার কাজ আগামী বুধবার। আপনি আসবেন।" বলেই উনি একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন।

'ওঁ গঙ্গা' লেখা কার্ড। হাতে নিয়ে বললাম, "আপনি এতদূর আসতে গেলেন কেন? কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।"

"তা হয় নাকি? আমার তো লোকবল নেই, তাই বেরোতে হল।"

বললাম, "আপনি যদি বলেন, তা হলে আমি মিঃ বাগচীর সঙ্গে আরও দু'-একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা সব সামলে দেবে। কামাখ্যাবাবুকে কিন্তু এখানকার সবাই খুব ভালবাসতেন।"

"না, এখন আর দরকার নেই। ছোট্ট অনুষ্ঠান। কোনও রকমে করছি। বাগচীবাবু আমাদের জন্য অনেক ছোটাছুটি করেছেন। ওঁকে আর বিব্রত করতে চাই না।" বলেই একটু চুপ করে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে উনি ফের বললেন, "আরও একটা কাজে আপনার কাছে এলাম। কিছু মনে করবেন না। উর্মির বাবার প্রাপ্য টাকাটা কি একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে? আমাদের সুবিধে হয় তা হলে।"

মেয়েটার নাম তা হলে উর্মি। হ্যাঁ, প্রথম দিন ফোনে এই

নামটা বলেছিল বটে! ঊর্মি মুখ শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবার মৃত্যুর জন্য আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে রেখেছে নাকি? যে উত্তরটা শুনলে ওর মুখটা স্বাভাবিক হবে, সেটাই বললাম, "নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ইন ফ্যাক্ট, উনি এক্সপায়ার করার পরদিনই মিঃ বাগচীকে ডেকে আমি বলে দিয়েছিলাম, সব রেডি করে রাখতে।"

ঊর্মি এ বার শক্ত গলায় বলল, "আজ পাওয়া যাবে?"

বললাম, "দেখছি, মিঃ বাগচী বলতে পারবেন। বোধহয় কিছু ফর্মালিটিজ আছে। একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। সাকসেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। এই সব আর কী। দাঁড়াও, আমি একবার মিঃ বাগচীকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

ফোনে মিসেস ব্যানার্জিকে বললাম, সুবোধবাবুকে একবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে। তারপর শ্রাদ্ধের কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে কামাখ্যাবাবুর স্ত্রীকে বললাম, "শ্রাদ্ধবাসরটা কোথায়?"

"চেতলার গৌড়ীয় মঠে। কার্ডে দেখুন, ঠিকানাটা লেখা আছে।"

"ওখানে কেন?"

"আসলে ঊর্মির বাবা তো খুব বিষয়ী মানুষ ছিলেন না। মারা যাওয়ার পর দেখছি, প্রায় কিছুই আমাদের জন্য রেখে যাননি সেই কারণেই আমাদের খুব সামান্যভাবেই কাজটা সারতে হচ্ছে।"

"কোনও ফ্ল্যাট বা বাড়ি?"

"না। যে বাড়িতে আপনি সেদিন গেছিলেন, সেটা আপনারই দাদুর বাড়ি। উনি আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন। তো, আমি আর ঊর্মি ঠিক করেছি, আমরা আর কলকাতায় থাকব না।"

"কোথায় যাবেন?"

"আমার এক দেওর থাকেন খড়দহে। সেখানেই যাব বলে

pathagar.net

ঠিক করেছি। ঊর্মিরও বিয়ের কথাবার্তা চলছে। ছেলে বিদেশে থাকে। বিয়েটা যদি হয়ে যায়, তা হলে ওকেও চলে যেতে হবে।"

"ঊর্মি কতদূর পড়াশুনা করেছে?"

"এবারই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বি ফার্মা করে বেরোল। ওর বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, ঊর্মি আপনাদের এখানে কিছু করে। সেজন্যই বি ফার্মা পড়িয়েছিল। এবার আপনার দাদুর নামে যে মেডেলটা আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন দিয়েছে, সেটা ও-ই পেয়েছে। আপনি সেদিন অনুষ্ঠানে যাননি। পশুপতিবাবুরা আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন।"

কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলছেন। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। দাদুর শ্রাদ্ধের দিন উনি সারাদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। সেদিন কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তুমি তুমি করে। আজ একটু দূরত্ব রেখে কথা বলছেন। ভবানীপুরের ওই বাড়িটা যে আমাদের, সেটা কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী আজ না বললে আমি জানতেও পারতাম না। হঠাৎই খুব খারাপ লাগল। কামাখ্যাবাবুর জন্য আমার কিছু করা উচিত ছিল। একটু সুস্থ হলে আমি অবশ্য ওঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। এখন সেটা বললে এঁরা বিশ্বাস করবেন কি না সন্দেহ।

বললাম, "আপনি আমার মায়ের বয়সী। প্লিজ, আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলবেন না। সেদিন অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে আমি যেতাম, কিন্তু এত দেরিতে ওঁরা জানালেন, সময় করতে পারলাম না।"

কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী বললেন, "ঊর্মির বাবার কাছে আপনার দাদু কিছু ফাইল এবং দলিলপত্র রেখে গেছিলেন। সেগুলো ঊর্মি গুছিয়ে এনেছে। দেখবেন?"

কার্পেটের উপর থেকে অ্যাটাচি **কেসটা তুলে ঊর্মি আমার**

দিকে এগিয়ে দিল। পরে খুলে দেখব বলে একপাশে সরিয়ে রাখলাম। তারপর বললাম, "আপনারা কিন্তু যতদিন ইচ্ছে ও বাড়িতে থাকতে পারেন। আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

কামাখ্যাবাবুর স্ত্রীর মুখ এই এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, "কী রে, তোকে আমি বলেছিলাম না? শুভ্র অন্তত আমাদের কথা ভাববে? তুই বিশ্বাসই করছিলি না।"

মায়ের কথা শুনে ঊর্মির মধ্যে কোনও ভাবান্তর হল বলে মনে হল না। মুখে রাজ্যের বিরক্তি এনে বলল, "আঃ মা, থামবে?"

এই সময় সুবোধবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, "আমাকে ডেকেছেন?"

বললাম, "কামাখ্যাবাবুর পাওনা চেক রেডি করে রেখেছেন?"

"হ্যাঁ। ম্যাডাম যদি চান, তা হলে এখনই নিয়ে যেতে পারেন। তবে আমার সঙ্গে একবার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আসতে হবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কত পাবেন উনি?"

"সাড়ে সাত লাখের মতো।"

"ওটা দশ করে দিন। ওঁর ঋণ আমরা আরও বেশি টাকা দিলেও শোধ করতে পারব না। আপনি কী বলেন মিঃ বাগচী?"

"অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ঠিক আছে, ওই ফিগারটাই করে দিচ্ছি।"

pathagar.net

মায়ের সঙ্গে ঊর্মিও উঠে যাচ্ছিল, সুবোধ বাগচী বললেন, "তোমার আসার দরকার নেই মা। এখানে বসে অপেক্ষা করো।"

কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে যেতেই আমি বললাম, "ঊর্মি, তুমি চাইলে তো আমাদের এখানেই জয়েন করতে পারো।"

"না। দরকার হবে না। সেদিন পশুপতিবাবু অলরেডি আমাকে একটা অফার দিয়েছেন। সেটা নেব কি না ভাবছি। ওঁদের ফ্যাক্টরিটা বেলঘরিয়ায়। খড়দহ থেকে ওখানে যাতায়াত করতে আমার সুবিধা হবে।"

"কিন্তু তোমার বাবার তো খুব ইচ্ছে ছিল, তুমি এখানে চাকরি করো।"

ঊর্মি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বাবার তো অনেক ইচ্ছেই ছিল। ক'টা আর পূরণ হল?"

"তুমি এত বিরক্ত কেন ঊর্মি?"

"কে বলল, আমি বিরক্ত?" মুখে এক চিলতে হাসি এনে ঊর্মি বলল, "ঠিক আছে, আপনার অফারটা নিয়ে আমি ভাবব।"

যাক, বোঝা গেল মেয়েটা হাসে। ওর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ইন্টারনেটে মন দিলাম। আজ বেলা একটার সময় মেনল্যান্ড চায়নায় লাঞ্চ করার জন্য ডেকেছি জয়দেব রায়চৌধুরীকে। রিঙ্কিও আসবে বলেছে। সঙ্গে একজন সুন্দরী মহিলা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। জয়দেব সেদিন আমাদের হার্বাল ওষুধ 'ব্রঙ্কল' নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল। কয়েকটা স্যাম্পল পুরনো স্টক থেকে বের করেছি। সেই সঙ্গে হাঁপানি সারানোর এই ওষুধটা সম্পর্কে কিছু লিটারেচারও। জয়দেবকে দিতে হবে। মেনল্যান্ড চায়নায় যাওয়ার আগে একটু হোমওয়ার্ক করছি ইন্টারনেটে। জানা দরকার, জাপানে জয়দেব যেখানে চাকরি করে সেটা কত বড় কোম্পানি?

সেদিন জয়দেব নাকি জয়সওয়ালকে বলেছিল, টাইম ইজ মানি। কথাটা শুনে ওর সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়েছে। ও সময় নষ্ট করার লোক না। বেলা একটার আগেই আমাকে মেনল্যান্ড চায়নায় পৌঁছতে হবে। বরানগর থেকে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লেগে যাবে। বারোটার সময় বেরোব ভেবেছিলাম। কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী এসে পড়ায় আটকে

গেলাম। অ্যাকাউন্টস থেকে উনি ফিরে আসার আগে আমি বেরিয়ে গেলে সেটা খুব খারাপ দেখাবে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পৌনে বারোটা। ঠিক আছে, মিনিট পনেরো এখনও অপেক্ষা করা যাবে।

"শর্মিলা বলে কোনও মেয়েকে আপনার মনে আছে শুভ্রবাবু?"

প্রশ্নটা শুনে ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বললাম, "কে শর্মিলা?"

"এই প্রশ্নটাই আপনার কাছে আশা করেছিলাম। মেয়েটা ক্যালকাটা গার্লসে পড়ত। কলেজে পড়ার সময় যাকে নিয়ে আপনি একদিন ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে গেছিলেন। কী মনে পড়ছে?"

ঊর্মির ঠোঁটে বিদ্রুপ। দেখে একটু রাগই হয়ে গেল। এইটুকু মেয়ে, নিজেকে কী ভাবছে? আমাদের একজন এক্স এমপ্লয়ির মেয়ে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার কে দিয়েছে ওকে? একটু শক্ত গলাতেই বললাম, "হবে হয়তো। অত মনে নেই।"

"শর্মিলা এখন একটা মেন্টাল নার্সিংহোমে রয়েছে।"

মুখ তুলে বললাম, "কেন?"

"আপনি জানেন! আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। ডায়মন্ডহারবার থেকে ফিরে আসার পর সব গল্পই ও আমার কাছে করেছিল। আপনার পরিচয়টা সেদিনই পেয়ে গেছিলাম। আজ চোখে দেখলাম বটে, কিন্তু আপনাকে সেদিন থেকেই চিনি।"

ঊর্মির স্পর্ধা দেখে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত চোখেই ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি কী বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না। ওই মেয়েটা আমার জন্যই এতদিন পর মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে গেছে?"

"এতদিন পর নয়। আপনি যেদিন ফোনে ওকে বলে দিয়েছিলেন, ও যেন কোনওদিন আপনাকে বিরক্ত না করে,

সেদিন থেকেই শর্মিলা মেন্টাল ব্যালান্স হারায়। আপনি আমার একজন বন্ধুর জীবন নষ্ট করেছেন। আপনাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করব না।"

এতক্ষণে বুঝলাম, ঊর্মি কেন প্রথম দিনই ঠক করে রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল। বাচ্চা মেয়ে। তাই এত আবেগপ্রবণ। কথাগুলো বলার জন্য ওর মুখটা এখন বেশ উত্তেজিত। মুখের লালচে আভার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অদ্ভুত সেক্সি লাগছে ঊর্মিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মনে মনে বললাম, তোমাকে যদি বশে আনতে না পারি, তা হলে আমার নামই শুভ্রশঙ্খ মিত্র নয়। রাগটাকে দমিয়ে ফেলে বললাম, "তোমার বন্ধুকে তুমি খুব ভালবাসো, তাই না?"

"অবশ্যই।"

"ওর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তা হলে কালই নিয়ে চলো। কোথায় যেতে হবে?"

"বেহালায়। আপনি কি সিরিয়াস?"

"কেন, তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি নই? চলো দেখে আসি, তোমার বন্ধু আমার একদিনের সঙ্গিনী হয়ে কেন এত অসুস্থ হয়ে পড়ল। কাল কোত্থেকে তোমাকে আমি পিক আপ করব বলো, এবং কখন?"

"বেশ, বিকেল পাঁচটায় রাসবিহারীর মোড়ে আমি অপেক্ষা করব। মেট্রো রেলের গেটে। যেখানে মাদার টেরিজার মুরালটা রয়েছে।"

"ঠিক আছে।"

ঊর্মি পাল্টা কী একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় মিসেস ব্যানার্জি দরজা খুলে বললেন, "স্যার, আপনার লাঞ্চে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন ঠিক বারোটা।"

শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। অফিসে ফেরার আর প্রশ্নই নেই। ঊর্মির আনা অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে বললাম,

pathagar.net

"একটা জরুরি মিটিংয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি ঊর্মি। মাকে বলে দিও। আশা করি, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু ঊর্মির ভূত আমার মাথায় চেপে রইল। মেনল্যান্ড চায়নায় যাওয়ার পথে ওর কথাই ভাবতে লাগলাম। এই একটি মাত্র মেয়ে, যে আমার মুখের উপর বলতে পারল, আপনাকে আমি জীবনেও ক্ষমা করব না। শর্মিলা মেয়েটাকে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎই মনে পড়ল... হ্যাঁ, আমাদের কলেজ ফেস্ট-এর সময় কার সঙ্গে যেন ও এসেছিল। স্বপ্নময়দের সঙ্গে আমি বাজি লড়েছিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যেই ওকে পটিয়ে বিছানায় শোয়াব। আর প্রমাণস্বরূপ কোনও একটা চিহ্ন এনে ওদের দেখাব।

হ্যাঁ, ভবানীপুরেরই মেয়ে। এবার মনে পড়ছে। প্রথম দিন বাড়িতে ফোন করে মজার মজার কথা বলে ওকে খুব হাসিয়েছিলাম। পরের দিনই ওকে গাড়িতে তুলেছিলাম ওদের স্কুলের সামনে থেকে। তার পরের দিন ওকে নিয়ে গেছিলাম, আমাদের সবার ঠেক ইনসোমনিয়াতে। ও বলেছিল, ওর বাবা দিল্লিতে থাকেন। বাড়িতে মা ছাড়া আর কেউ নেই। সারাদিনের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়তে ওর কোনও অসুবিধে নেই। ছয়দিনের মাথায় নিয়ে গেছিলাম ডায়মন্ডহারবারের এক রিসর্টে। সারা দিন স্ফূর্তি করার পর ওর ব্রা লুকিয়ে আমি পকেটে পুরে রেখেছিলাম। সেটাই স্বপ্নময়দের এনে দেখাই। এখন ভাবতে খারাপ লাগছে। ওই ব্রা-টা নাকি প্যাকেটে করে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদেরই কেউ। সেটা ওর মায়ের হাতে পড়েছিল।

ঊর্মি বোধহয় পুরো ব্যাপারটাই জানে। আমাকে ঘেন্না করাটাই স্বাভাবিক। কলেজ লাইফে ওই উদ্দাম জীবন তখন ভাল লাগত। দাদু মারা যাওয়ার পর আমার কাছে জীবনের মানেটাই বদলে গেছে। আমার কোম্পানির ব্যালান্স শিটটাই আমার কাছে সব। শর্মিলা বলে একটা মেয়ের নার্সিংহোমে

BanglaBook.org

ভর্তি থাকাটা আমার মনে কোনও রেখাপাত করে না। এই যে কাল মেয়েটাকে দেখতে যাব বললাম, সেটা ঊর্মিকে বাগে আনার জন্য। আমি জানি, কাল যদি ও আমার সঙ্গে দেখা করে, তা হলে ভবিষ্যতেও করবে। ওকে আমি চুম্বকের মতো টানব। ও কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না।

মৌলালীর মোড়ে পৌঁছে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় সাড়ে বারোটা। না, হাতে এখন সময় আছে। মনা সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে। আজকাল ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। এটাই ওর কাজ। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ও বলল, "শুভ্রদা, মেনল্যান্ড চায়নায় কি আপনার খুব দেরি হবে?"

বললাম, "জানি না। কেন রে?"

"আজ একটু আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন?"

"পাড়ায় কোনও অকেশন আছে বুঝি?"

"না না। আজ একবার লাভলিদির বেলঘরিয়ার বাড়িতে যাব।"

"তোর লাভলিদির বাড়িটা ঠিক কোথায় রে?"

"রথতলার কাছে। বি টি রোডের খুব বেশি দূরে না। আমাদের অফিস থেকে কয়েক মিনিটের পথ।"

"ওর হাসব্যান্ড কী করে?"

"আপনি জানেন না? জামাইবাবু তো আমাদের ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে। স্যালাইন ডিপার্টমেন্টে। আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই। ছোটখাটো চেহারা। খুব নিরীহ ধরনের। নাম লোকনাথ দাস। আমার মা-ই তো লাভলিদির বিয়ের পর আপনার দাদুর হাতেপায়ে ধরে জামাইবাবুকে ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।"

"বেলঘরিয়াতেই যদি যাবি, তা হলে আমার সঙ্গে এতদূর এলি কেন? বরানগর থেকেই তো চলে যেতে পারতি।"

"কী করে যাব? লাভলিদিও যে আজ আমার সঙ্গে

বেলঘরিয়ায় যাবে। অফিসে আসার সময় মা আমাকে বলে দিল। যে করেই হোক, লাভলিদিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। আপনাদের বাড়িতে লাভলিদি অনেক দিন রইল। এদিকে জামাইবাবুর খুব অসুবিধে হচ্ছে।"

লাভলি চলে যাবে শুনে মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল। মেনল্যান্ড চায়নায় ঢোকার আগে পর্যন্ত ভাবতে লাগলাম, কী করে ওকে আটকানো যায়।

সতেরো

জয়দেব বলল, "সেদিন হাঁপানির ওষুধ নিয়ে আপনি যা বলছিলেন, আমার মনে হয় সেটা চেষ্টা করতে পারেন। কাল আপনি ফোন করার পর বাড়িতে আপনার কথা হচ্ছিল। তখন আমার মা কিন্তু বললেন, একটা সময় আমার দাদু নাকি ব্রঙ্কল খেয়ে খুব ভাল থাকতেন।"

"আপনার দাদুর কি হাঁপানি ছিল?"

"হ্যাঁ। মায়েরও আছে। মা যখন এতদিন পর মেডিসিনটার কথা বলছে, তখন নিশ্চয়ই মেডিসিনটার গুডউইল ছিল এবং এখনও আছে। আপনি লেগে পড়ুন।"

বললাম, "আপনি কি এক্সপোর্ট করার কথা বলছেন?"

"কেন নয়? ফরিদাবাদের একটা কোম্পানি... কী যেন নামটা... শিবা ইন্ডিয়া। আমাদের ওখানে এক ধরনের হার্বাল টনিক পাঠাচ্ছে। কালই ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে খবরটা দেখলাম। আপনিও উদ্যোগ নিন। যা সাহায্য করার, আমি করব।"

"ওরা কি কোনও টেস্ট-ফেস্ট করে?"

"অবশ্যই। আমাদের ওখানকার পদ্ধতি আমেরিকার মতো। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে। তারা

গুণাগুণ বিচার করে। তবে সিদ্ধান্ত জানাতে খুব বেশি দেরি করে না। দু'সপ্তাহের মধ্যেই ভাল-মন্দ যা জানানোর জানিয়ে দেয়। আপনি যদি আপনার ওষুধ... ব্রঙ্কল-এর স্যাম্পল আর ফর্মূলার্টা জে এফ ডি এ-র কাছে কাল পাঠিয়ে রফতানি করার অনুমতি চান, তা হলে আমার তো মনে হয় এক মাসের মধ্যে উত্তর পেয়ে যাবেন।"

"আপনাকে দেখানোর জন্যই আজ আমি কয়েকটা স্যাম্পল নিয়ে এসেছি।"

"কই দেখি?"

পায়ের কাছে রাখা অ্যাটাচি কেস থেকে বিভিন্ন সাইজের তিনটে বোতল বের করে দেখালাম। দেখেই মুখ কুঁচকে উঠল জয়দেবের। "কিছু মনে করবেন না শুভ্রবাবু। প্যাকেজিংটা এত খারাপ, ওখানে ওষুধের দোকানে পড়ে থাকলে কেউ ছোঁবেও না। এ সব ব্যাপারে আপনারা নজর দেন না। কিন্তু বাজারে চালু করার জন্য ওষুধের প্যাকেজিং খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

একটু লজ্জা পেয়েই বললাম, "এক্সপোর্ট করলে তখন দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ এটা কিন্তু মনে রাখবেন। আমি একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়ে যাই জানেন? এখানকার ওষুধের ব্যবসাটা এত বড়, অথচ ভুল রাস্তায় এগোচ্ছে। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা... নাকি তারও বেশি হবে? অথচ..." ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ফিগারটা ডাবল করুন। এখন কুড়ি হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে।"

"হোয়াটেভার... প্রায়োরিটি মিসপ্লেসড। এ ছাড়া আর কী বলব? যে দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগেন, সে দেশে তার ওষুধ বেশি তৈরি করার দিকে কোনও কোম্পানির নজর নেই। বেশি উৎসাহ ডায়েবেটিস আর হার্ট প্রবলেম সংক্রান্ত ওষুধ তৈরি নিয়ে। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। আপনারা বড়লোকদের কাছে ওষুধ বিক্রি করার

কথাই বেশি ভাবেন। কেননা এ দুটো রোগ বেশি হয় বড়লোকদের। তুলনায় কিন্তু গরিবদের কথা ভাবেনই না।"

জয়দেবের মুখে এ সব কথা শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। ঠিকই বলছে। গরিবদের যে সব রোগ বেশি হয় তার ওষুধের দাম খুবই কম। বেশিরভাগই ও টি সি মানে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন। ওই সব ওষুধে লাভের মাত্রাও বেশি হয় না। তাই বড় কোম্পানি কোনও আগ্রহ দেখায় না। এসব কথা জয়দেবকে বলে লাভ নেই। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তাই বললাম, "লিবারালাইজেশনের পর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কম্পিটিশন করতে হচ্ছে তো। সেই কারণে আমরা অনেক সতর্ক।"

"না শুভ্রবাবু, মানতে পারলাম না। লিবারালাইজেশনের পর এখানকার বড় কোম্পানিগুলোর শতকরা তেইশ ভাগ ব্যবসা বেড়েছে। আমি তো দু'একটা কোম্পানির কথা জানি, যাদের ব্যবসা একশো চৌত্রিশ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে। রোন পাউলেঙ্ক, নোভারটিস। জাপানিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আছি। তাই পরিসংখ্যান ছাড়া কথা বলি না।"

জয়দেববাবুর কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকেরই ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই। তারা এত গরিব। ওষুধের দাম খুব কম হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থা। জাপানে একজন এইডস রোগীর রোগ ধরার জন্য খরচ তিরিশ হাজার টাকা। আমাদের দেশে পাঁচশো টাকাতেই সেই পরীক্ষাটা করা যায়। কত তফাত। বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি রোগীর কথাই শুধু ভাবছেন। আমরা যারা ওষুধ বানাই, তাদের কথা কে ভাবে? গ্যাট চুক্তির জন্য দু'হাজার পাঁচের পর আমাদের ব্যবসার হাল কী হবে, আন্দাজ করতে পারছি না। অন্তত দেড়টা বছর তো আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন!

কিন্তু কথাগুলো আমি বলার আগে রূপের আলো জ্বেলে

সামনে এসে দাঁড়াল রিঙ্কি। ওর আসার কথা একটায়। এল আধ ঘণ্টা দেরি করে। পরনে নীল টাইট জিনস, লেবু রঙের টি শার্ট আর তার উপর লেদার জ্যাকেট। একদম মডেল মডেল লাগছে। রিঙ্কিকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন জয়দেববাবু। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। উনি উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল।"

রিঙ্কি পাত্তাই দিল না। আমাকে বলল, "ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগগিরি কিছু খাবার দিতে বলো।"

বললাম, "আমি অর্ডার দিয়েই বসেছি। এখুনি নিয়ে আসবে। তোমার এত দেরি হল কেন রিঙ্কি?"

"আর বোলো না। সেদিন আমার জন্মদিনে গড়িয়াহাটের যে জুয়েলারি শপে তুমি নিয়ে গেছিলে, এখন সেখান থেকেই আসছি। বেরিয়ে ট্যাক্সি পাই না। কেউ এত অল্প রাস্তা আসতে চায় না। শেষে একজন লিফট দিল।"

ওকে বললাম, "একটু বোসো। আমরা কথা সেরে নিই।"

জয়দেববাবু রিঙ্কির দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেননি। দেখে মনে মনে হাসলাম। এইবার আসল কথাটা পাড়তে হবে। রিঙ্কিকে আসতে বলায় কাজ হয়েছে। জয়দেববাবু একেবারে বোলড। এবার বললাম, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। আপনি কলকাতায় থাকবেন কত দিন?"

"বলতে পারছি না। মা যতদিন না সুস্থ হন, ততদিন থাকতেই হবে।"

"কী হয়েছে আপনার মা-র?"

"বয়স হলে যে সব রোগ হয় আর কী। বরাবর হাঁপানি ছিল। তার উপর কিডনি ভাল নেই। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি। মনে হয়, মাস তিনেকের আগে ফিরতে পারব না।"

"এখানকার বাড়িতে আপনার আর কেউ নেই?"

pathagar.net

"না। আমার একটাই মাত্র বোন। বিয়ে হয়ে গেছে। এখন থাকে কানাডায়। বাবা মারা গেছেন দু'বছর আগে। তাই আমাকেই ছুটে আসতে হল।"

"বিয়ে করেননি?"

"না মশাই। সুযোগ হয়নি। এই মাস চারেক আগে ওখানে একটা বড় ফ্ল্যাট কিনেছি। জানেনই তো, কী অসম্ভব দাম ওখানে ফ্ল্যাটের। এইবার পয়সা জমাব। তারপর বিয়ে করব।"

"বাঙালি মেয়ে? না ও দেশের কেউ?"

"মা তো মেয়ে দেখছেন। আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।"

"বলেন তো, আমি মেয়ে দেখি।"

জয়দেববাবু হাসলেন। তারপর বললেন, "আমরা কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এসেছি।"

বললাম, "আপনাদের কোম্পানি যে ফিল্টার পেপারটা তৈরি করে, সেটা কী রোগের জন্য?"

"হাস। ওটা হাস রোগের ওষুধ?"

সার্স রোগের কথা ইদানীং কাগজে খুব পড়ছি। কিন্তু এই রোগের কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাল করে জানার জন্য বললাম, "কী রোগ বললেন?"

"হাস। এইচ ইউ এস। হেমোলিটিক ইউরেমিক সিনড্রোম। এখানে এই রোগটা এখনও আসেনি। এক ধরনের জীবাণু থেকে হয়। আমেরিকা, কানাডা আর ইউরোপে প্রচুর লোক মারা গেছে।"

pathagar.net

"কী ধরনের জীবাণু?"

"এই জীবাণুটার নাম ইকোলাই। আপনারা এখানে বিকোলাই-এর নাম শুনেছেন। এই অঞ্চলে অনেকেরই হয়। কিন্তু এই জীবাণুটা একটু আলাদা ধরনের। আসলে একজন জার্মান ব্যাক্টেরিওলজিস্ট থিয়োডর ইসচেরিখ এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাঁকে সম্মান দেওয়ার জন্যই পরে নাম

দেওয়া হয় ইসচেরিসিয়া কোলাই। সংক্ষেপে ইকোলাই। জীবাণুটা ঘাঁটি বাঁধে মানুষের শরীরের কোলন-এ। খুব যাচ্ছেতাই ধরনের রোগ বাধায়।"

"লক্ষণগুলো কী?"

"জ্বর, রক্ত-পায়খানা। বাচ্চাদের হলে বাঁচানো মুশকিল। তিনদিনের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। অবশ্য ঠিক সময়ে যদি ধরা না পড়ে। বড়দের পক্ষে অতটা ক্ষতিকারক না। তবে হাস হওয়ার পরে সবথেকে যেটা ভয়ঙ্কর, সেটা হল কিডনি নষ্ট করে দেয়।"

"আমাদের দেশে এই জীবাণু নেই?"

"থাকবে না কেন? ইকোলাই প্রচুর ধরনের হয়। বিপজ্জনক হল ও ওয়ান ফিফটি সেভেন: এইচ সেভেন। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বংশবৃদ্ধি করে। যেখানে-সেখানে বাড়তে পারে। যে-কোনও মাধ্যম মারফত শরীরে ঢুকতে পারে। শরীরে ঢুকে ঠিক আশ্রয় নেয় নিজের জায়গায়... মানে কোলন-এ। তারপর এমন টক্সিন সৃষ্টি করে, যমে-মানুষে টানাটানি।"

"আপনাদের ওষুধটা কী?"

"আমরা যে ফিল্টার পেপারটা তৈরি করি, তা খাইয়ে দিলে ওই টক্সিনকে... সোজা বাঙলায় কী বলব... শুষে নেয়। তারপর পায়খানার সঙ্গে বের করে দেয়।"

"ধরুন, আমরা যদি ওই ফিল্টার তৈরি করতে চাই, তা হলে কী করতে হবে?"

"করতে পারেন। কিন্তু কেন করবেন? এখানে তো হাস হয় না।"

"আমাদের এখানে ফিল্টার তৈরির খরচ নিশ্চয়ই আমেরিকা বা জাপানের মতো হবে না। অনেক কম খরচে তৈরি করে, যদি আমরা এক্সপোর্ট করি?"

"হ্যাঁ সেটা অবশ্য করতে পারেন। কিন্তু ফর্মুলা পাবেন কোথায়?"

pathagar.net

"আপনি দেবেন। আপনি তো শিমবুনের চিফ কেমিস্ট। এর জন্য অবশ্য আমি ভাল টাকা দেব। আর বিয়ে করার জন্য তো আপনার টাকার দরকার।"

শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন জয়দেববাবু। তারপর রিঙ্কির সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য বলে উঠলেন, "ম্যাম দেখছেন, আপনার বন্ধু আমাকে কেনার চেষ্টা করছেন। আমার কোম্পানির কোনও কর্তার কানে এ কথা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জেলে পাঠানোর চেষ্টা করবে।"

"আপনাদের এ ফিল্টারটা কতদিন আগে পেটেন্ট নেওয়া?"

"ধরুন, সাড়ে তিন বছর।"

"তা হলে তো আপনার জেলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। একটা পেটেন্ট চার বছরের বেশি কার্যকর হয় না। যে কোনও কোম্পানিই তার পর ফর্মূলাটা নিয়ে ওষুধ বানাতে পারে। তবে পদ্ধতিটা একটু আলাদা হওয়া দরকার। সে পদ্ধতিটা না হয় আপনিই বাতলে দেবেন। আমার এখানে প্রোডাকশন শুরু হতেই তো মাস ছয়েক কেটে যাবে!"

"আপনি তা হলে হিসাব কষেই আমাকে ডেকেছেন।"

"শিমবুনের চাকরি ছেড়ে যদি আমার কোম্পানিতে জয়েন করতে চান তা হলে আমি রাজি আছি।"

"না মশাই। এ দেশে ফিরে আসার কোনও প্রশ্ন নেই। মা যত দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন সম্পর্ক রাখব। তারপর আর পাও দেব না। দেখি, আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।"

জয়দেববাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার এসে গেল। ব্যবসার কথা বন্ধ রেখে আমি খাওয়ায় মন দিলাম। আমাদের এখানে এক কোম্পানির কেমিস্টকে অন্য কোনও কোম্পানি ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু

আমি যে প্রস্তাবটা এখুনি দিলাম, সেটা অভিনব। জানি, জয়দেববাবু না করে দেবেন। কিন্তু আগামী দু'তিন মাসে আমার ইউনিটটা তৈরি করে দিয়ে গেলেও আমি লাভবান হব। কত টাকার প্রোজেক্ট সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। কিন্তু আমি যে রাস্তায় এগোচ্ছি, তাতে টাকাটা জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

জয়দেববাবু খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই রিঙ্কির দিকে তাকাচ্ছেন। দু'একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রিঙ্কি বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় অন্য কোথাও যাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমাদের আলোচনায় ওর মন নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। জ্বর, রক্ত পায়খানা— এসব কথা শুনতে ওর ভাল লাগবে কেন?

সেদিন ফোনে এই রেস্তোরাঁতে আমায় ডেকে রিঙ্কি খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। ভাগ্যিস, সঙ্গে ভিসা কার্ডটা ছিল। প্রায় ষোলো হাজার টাকা সেদিন ও খসিয়ে দিয়েছিল। রিঙ্কি কিছু অনুরোধ করলে আমার পক্ষে না করা এখন তো সম্ভবই না। আমি জানি, ওই ষোলো হাজার টাকা ষোলো লাখ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। সেদিন জন্মদিন উপলক্ষে ওকে একটা আংটি কিনে দিয়েছিলাম। গড়িয়াহাটের মোড়ে আমাদেরই খুব জানাশোনা পাল জুয়েলার্স থেকে। দাদুর আমল থেকে পাল জুয়েলার্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। কিন্তু আজও রিঙ্কি কেন সেখানে গিয়েছিল, বুঝলাম না।

সেদিন পাল জুয়েলার্স থেকে বেরিয়ে রিঙ্কিকে নিয়ে আমি লেক ক্লাবে গেছিলাম। প্রায় সন্ধে সাতটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। সেখানেই কথায় কথায় ও বলল, আদৌ ও মুম্বইয়ে যায়নি। বাবার সঙ্গে নাকি ওর ট্রুস হয়ে গেছে। মুম্বইয়ে যাচ্ছি বলে ও নাকি প্রথমে যায় মিনিস্টারকাকুর বাড়িতে। তখন মিনিস্টারকাকুই বুঝিয়েসুঝিয়ে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। মিনিস্টারকাকু নাকি ওর বাবাকে ধমকও দিয়েছেন।

ফের মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে নাকি কোনও সম্পর্কই রাখবেন না। কথায় কথায় রিঙ্কি সেদিন আরও বলেছিল, "জানো, মিনিস্টারকাকুকে তোমার কথা বলেছি। উনি বলেছেন, ছেলেটাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসিস।"

রিঙ্কিকে ধরে যদি হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে একটা লাইন করা যায়, সেই আশাতেই আছি। হেলথ সার্ভিস বা ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর তখন আমার হাতের মুঠোয় থাকবে। কমপক্ষে সাড়ে চার বছর এই গভর্নমেন্ট এখনও থাকবে। এর মধ্যেই কোম্পানিকে এক নম্বরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। মিনিস্টার হাতে থাকলে একটা ছোট্ট কোম্পানিকে কোথায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায়, তার উদাহরণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট। একটা দশ টাকা দামের ওষুধও তা হলে সরকারের কাছে নব্বই টাকায় বিক্রি করা যায়। কোনও চক্ষুলজ্জা করার দরকার হয় না।

বাবার সঙ্গে ট্রুস করা নিয়ে রিঙ্কি আমায় যা বলেছে তা সত্যি কি না আমি জানি না। কিন্তু একটা ধন্ধ এখনও আমার কাটেনি। এতদিন কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কেন রিঙ্কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি? ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছিল যেদিন পার্ক থানার পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায়। মাঝে প্রায় দিন পনেরো কেটে গেছে। কেন ও ফোনেও আমার সঙ্গে কথা বলেনি? আমি নিশ্চিত, পার্ক হোটেলে সেদিন যাকে দেখেছিলাম, সে রিঙ্কিই। ওর সঙ্গে কয়েকজন অবাঙালি বন্ধু ছিল। কেন জানি না, এখন মনে হচ্ছে, ও বদ পাল্লায় পড়েছে।

খেতে খেতেই রিঙ্কি হঠাৎ চাপা গলায় বলল, "এই শুভ্র, তোমার কাছে হাজার খানেক টাকা হবে?"

"কেন?"

"আমার খুব দরকার। আমার এক বন্ধুর বিবাহবার্ষিকী। কিছু দিতে হবে।"

"দাঁড়াও, জয়দেববাবু চলে যান। তারপর নিও।"

"লোকটাকে ভাগাও না। আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।"

রিঙ্কি ছেলেমানুষের মতো আর কী বলে ফেলবে, সেই ভয়ে চুপ করে গেলাম। জয়দেববাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন। মুখ মোছার ফাঁকে বারবার উনি তাকাচ্ছেন রিঙ্কির দিকে। রিঙ্কি প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কেননা ও আমার পাশে বসে। মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি চাপল। খাওয়া শেষ করার পর জয়দেববাবুকে বললাম, "আমাকে একবার টয়লেটে যেতে হবে। আপনার কি আর কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

"আছে। সাড়ে তিনটের সময়। তাজ বেঙ্গলে।"

"তা হলে আপনার দেরি করা উচিত হবে না। ফোনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আমার প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাববেন।"

বলেই আমি টয়লেটের দিকে এগোলাম। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে দেখি জয়দেববাবু নেই। রিঙ্কি আমাকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টাকাটা দাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

পার্স থেকে দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিতেই রিঙ্কি সাইড ব্যাগে চালান করে দিয়ে বলল, "রাতে ফোন কোরো। কাল মিনিস্টারকাকুর বাড়িতে তোমায় কখন নিয়ে যাব, জানিয়ে দেব।" বলে ও আর দাঁড়ালই না।

খাবারের দাম মিটিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে ধীরেসুস্থে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রায় তিনটে। বরানগরে ফিরে যেতে মন চাইল না। কিন্তু বাড়িতে গিয়েই বা করবটা কী? বাড়িতে লাভলি থাকলে নাহয় সময় কেটে যেত। কিন্তু ও তো মনার সঙ্গে বেলঘরিয়া ফিরে যাবে। বাড়িতে ফিরে রোজ ওর হাসিমুখ দেখি। দরজা খুলেই ও হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচি কেসটা

নিয়ে নেয়। গা থেকে কোট খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে। এসব একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে।

রোজ ডিনার করার পর লাভলি হাতের কাজ সেরে উঠে আসে আমার ঘরে। একসঙ্গে কিছুক্ষণ টিভি দেখি। কখনও কখনও ব্লু ফিল্মও। কলেজ লাইফে জোগাড় করা ওই সব ক্যাসেট এতদিন আমার আলমারির কোণে পড়েছিল। টিভি দেখার পর ও যখন নীচে নেমে যেতে চায়, তখন ওকে জোর করে বিছানায় নিয়ে যাই। সহবাস করার পর সারা রাত্তিরই আমাকে জড়িয়ে ধরে ও শুয়ে থাকে। আজ থেকে সে সব পাট চুকে গেল। বাড়ি ফিরে সেই আবার গীতামাসির মুখটা দেখতে হবে। বাড়িতে ফোন করে লাভলিকে যদি এখন আটকাই, তা হলে গীতামাসি সন্দেহ করবে।

মাঝে একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই যে তুই রাত্তিরে এ বাড়িতে থেকে যাস, গীতামাসি বারণ করেনি?"

লাভলি বলেছিল, "প্রথম দু'দিন রাত্তিরে ফিরে গেছিলাম। তারপর একদিন বাড়িতে গিয়ে গল্প বানালাম, বাড়ি ফেরার সময় দু'টো ছেলে ফলো করেছিল। গোবিন্দপুরের রাস্তাটা রাতের দিকে কী রকম ফাঁকা থাকে জানোই তো। পিসি বিশ্বাস করে নিল কথাটা। সেদিনই বলেছে, শুভ্র যেদিন রাত্তির করে বাড়ি ফিরবে, সেদিন তোর আসার দরকার নেই। তা ছাড়া, পিসির কি এখন আমাকে নিয়ে ভাবার সময় আছে? পিসেমশাইকে নিয়ে এখন এমন চিন্তায় আছে, অন্য দিকে মনই দিতে পারছে না। বিয়ের পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, তবুও ওদের মধ্যে ভালবাসা দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই।"

লাভলি এই ক'টা দিন আমাকে অনেক তৃপ্তি দিয়েছে। ওর ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমি খুব খুশিই হব। হাঁটতে হাঁটতে পার্কিং এরিয়ায় গিয়ে গাড়িতে উঠে ঠিক করলাম, বাড়ি ফিরে যাব। কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী যে দলিল আর কাগজপত্তর দিয়ে

গেলেন, সেগুলো ভাল করে দেখা দরকার। গড়িয়াহাটের ফ্লাই ওভারে ওঠার সময় মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে কথা বলা পছন্দ করি না। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিই। কিন্তু ফ্লাইওভারে গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে পাল জুয়েলার্সের মালিক নীরেন পালের গলা শুনতে পেলাম, "শুভ্রবাবু বলছেন?"

"হ্যাঁ বলছি।"

"স্যার, আপনার স্ত্রী আজ আমাদের এখানে এসেছিলেন। একটা নেকলেস নিয়ে গেছেন। ষাট হাজার টাকার। চেকটা কী পাঠিয়ে দেবেন?"

কথাটা শুনে আমি উত্তর দিতেও ভুলে গেলাম।

আঠারো

সকালে ঘুম ভাঙল লাভলির ডাকে। হাতে চায়ের কাপ। বলল, "তোমার পিসতুতো ভাই ফোন করেছিল। তোমাকে রিংব্যাক করতে বলেছে।"

সাতসকালেই স্নান সেরে নিয়েছে। কাঁধ বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে ভিজে চুল। ওকে শিশিরে ভেজা ফুল বলে মনে হল। কাল বিকেলবেলা বাড়ি ফিরতেই লাভলি দরজা খুলে দিয়েছিল। আশা করিনি। তাই ওকে দেখেই আমার বুকের ভেতরে কী যেন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল। আমার স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিয়ে পাল জুয়েলার্স থেকে রিঙ্কির নেকলেস কেনার শোকও ভুলে গেছিলাম লাভলিকে বাড়িতে দেখে। দরজা বন্ধ করে ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ও তখন ইশারায় দেখিয়েছিল, যমুনা আর বোচান কিচেনে আছে।

দুপুরে বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে খবর এসেছিল, মনার বাবার শরীরটা ফের খারাপ হয়েছে। তাই লাভলির বেলঘরিয়ায় যাওয়া হয়নি। খবরটা শুনেই মনা দৌড়ে যায় হাসপাতালে। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে গীতামাসি গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। লাভলিকে তাই এ বাড়িতে থেকে যেতে হয়েছে।

লাভলির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বললাম, 'টুবলু কখন ফোন করেছিল রে?"

"মিনিট পনেরো আগে।"

ঠিক আছে, চা খেয়ে ধীরেসুস্থে ওকে ফোন করা যাবে। বললাম, "গীতামাসি এখনও আসেনি?"

"না। সকালে ভাই এসেছিল। বলল, কাল থেকে পিসেমশাইয়ের রক্ত-পায়খানা হচ্ছে। ডাক্তাররা বলেছে, আরও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।"

"ভালই তো। তা হলে তোকে আরও কয়েকদিন কাছে পাব।"

"যাঃ, এ কথা বোলো না। পিসির কথা ভাবো তো। পিসেমশাইয়ের কিছু হলে পিসিও বোধহয় বাঁচবে না। তোমাদের সংসার দেখতে গিয়ে পিসি কোনওদিন নিজের সংসার দেখার সময়ই পায়নি। কিন্তু পিসেমশাই এত ভাল, কোনওদিন এ নিয়ে কমপ্লেন করেনি।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, "বাঃ, তুই পিসির কথাই ভাবছিস। কই, আমার কথা তো ভাবছিস না।"

"আমি চলে গেলে রিঙ্কিকে তুমি বিয়ে কোরো। তা হলেই তো আমার কাছ থেকে যা পাও, সব পাবে।"

"তুই রিঙ্কির কথা জানলি কী করে রে?"

"একদিন ফোন করেছিল। তখনই নামটা জানলাম। তার পর পিসিকে জিজ্ঞেস করলাম। পিসি বলল, তুমি নাকি ওকে বিয়ে করবে।"

"দূর, ও সব মেয়েকে কি বিয়ে করা যায়? ঘরে সাজিয়ে রাখতে হয়। যাক গে, তুই চলে গেলে তোর সঙ্গে কী করে দেখা হবে বল তো?"

"তুমি কি বেলঘরিয়ায় যাবে নাকি?"

"যদি যাই, তোর আপত্তি আছে?"

"না, না। ওসব করতে যেও না। পাড়ায় জানাজানি হয়ে যাবে।"

"তোর এদিকের কী খবর?"

"মনে হয়, আটকে গেছে। পরশু মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। হয়নি। এই প্রথম আমার দু'দিন দেরি হল। জীবনে তখনও হয়নি। এখন কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে, জানো।"

চায়ের কাপটা টবিলের উপর রেখে হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনলাম। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, "যদি সত্যিই প্রেগন্যান্সি হয়, তা হলে তোকে কিন্তু আমি বেলঘরিয়ায় রাখব না।"

ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে লাভলি বলল, "কী বলছ তুমি? আমাকে কোথায় রাখবে?"

"ভবানীপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে। সেখানে। আর এক দু'মাসের মধ্যেই বাড়িটা খালি হয়ে যাবে। তোর জন্য লোক রেখে দেব। ওখানে থাকবি।"

"তোমার মাথা খারাপ? লোকনাথ, পিসি, পিসির বাড়ির আর সবাই? ওদের কথা ভেবেছ? ওদের কী বলবে?"

"ওরা কেউ কিছু জানবে না।"

"না, তা হয় না শুভ্রদা। তোমার দিকটাও ভাব। এ সব অবৈধ সম্পর্কগুলো কখনও চাপা থাকে না।"

"আমাকে ছাড়া তুই থাকতে পারবি, লাভলি?"

প্রশ্নটা শুনে লাভলি চুপ করে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "আমার কথা আমি ভাবছি না। আমার কোনও দাম নেই। কেউ আমাকে চেনেও না। কিন্তু সমাজে তোমার একটা

পজিশন আছে। তোমার কথাই আমি ভাবছি। কাল তোমাকে না বলে চলে গেলে ভাল হত।"

ওকে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে বললাম, "তুই যেখানেই থাকবি, ঠিক খুঁজে বের করব। আপাতত লোকনাথের কথা ভুলে যা।"

লাভলি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "মনে হয় নীচে কেউ এসেছে। তুমি কি একটু পরেই বেরিয়ে যাবে?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমি অফিসে যাব। তুই ব্রেকফাস্ট রেডি কর।"

বাথরুম থেকে মুখ টুখ ধুয়ে আসার পর টুবলুকে ফোন করলাম। ও প্রান্তে ও উত্তেজিত, "আমাদের কাগজটা আজ দেখেছ শুভোদা?"

বললাম, "না রে। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। খবরটা কি বেরিয়েছে?"

"প্রথম পাতায় বেরিয়েছে। অনিল মজুমদারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। কাল মন্ত্রী আমাকে বলেছে, অনিল মজুমদারকে আর হেলথ সার্ভিসে রাখবে না। আগে তুমি খবরটা পড়ে দেখো। তার পর ফোন কোরো।"

অন্যদিন চায়ের কাপের সঙ্গে সঙ্গে লাভলি কয়েকটা খবরের কাগজও দিয়ে যায়। আজ বেলা হয়ে গেছে দেখে বোধহয় আনেনি। ওপর থেকে জোরে ওকে বললাম, কাগজগুলো দিয়ে যেতে। ওর বদলে উঠে এল মনা। কাগজগুলো টেবলে রেখে বলল, "বাবা ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুভ্রদা। আজ আমাকে ছুটি দেবেন?"

"ডাক্তাররা কী বলছে?"

"খোলাখুলি তো কিছু বলছে না। অপারেশন করাটা বোধহয় উচিত হয়নি। আমার ভাল লাগছে না শুভ্রদা। মনে হচ্ছে, খুব খারাপ কিছু।'

মনার চোখ ছলছল করছে। ওর মতো ডাকাবুকো ছেলেও

pathagar.net

কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। ক্যান্সার নয় তো? কথাটা মনে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গীতামাসির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাঙ্গুর হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে একবার কথা বললে হয়। ভরসা দেওয়ার জন্যই মনাকে বললাম, "এত চিন্তা করছিস কেন? আমি তো আছি। তেমন হলে বড় ডাক্তার দেখানো যাবে।"

"মা তো আপনার ভরসাতেই আছে শুভ্রদা। সব সময় বলে, আমার বুকের দুধ খাইয়ে ওকে মানুষ করেছি। ও আমাকে ফেলতে পারবে না।"

এত দিন পর তা হলে কথাটা জানতে পারলাম। কার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি। মনার পিঠে চাপড়ে বললাম, "তোর মতো ছেলে ঘাবড়ে গেলে চলবে? আগে দ্যাখই না ডাক্তার কী বলে।"

চোখ মুছতে মুছতে মনা নীচে নেমে যাওয়ার পর কাগজ খুলে বসলাম। বড় বড় করে হেডিং। হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর পরিবারসহ পুলিশ হাজতে। মাই গড! অনিল মজুমদারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে! তা হলে টুবলু কাজের কাজ করেই দিয়েছে! খবরের মাঝে একটা ছবি। পুলিশ ভ্যান থেকে অনিল মজুমদার নামছেন। তাড়াতাড়ি রিপোর্টের বাকি অংশে চোখ বোলাতে লাগলাম। সবই আমার জানা। মেয়েটার বাপের বাড়ির লোকজনের কথাও রয়েছে। পুত্রবধূ হত্যার অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ অনিল মজুমদারকে ধরতে কেন এত দেরি করল, টুবলু সে প্রশ্নও তুলেছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে টালিগঞ্জ থানার একজন এ এস আইকে। যে এফ আই আর নিতে চায়নি।

খবরটা পড়তে পড়তে দু'টো নতুন তথ্য জানতে পারলাম। ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর বিজন বসুই হেলথ সার্ভিসে যেতে পারেন। আর যে সব ওষুধ কোম্পানির মালিকের থেকে অনিল মজুমদার মন্ত্রীর নাম করে টাকা নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রী

ব্যাক্তিগত ভাবে কথা বলবেন। টুবলু কায়দা করে দুটো ব্যাপারেই অনিল মজুমদারকে ফাঁসিয়েছে। এই তথ্যগুলো পড়ে মনটা খুব হালকা হয়ে গেল, এক, বিজন বসু হলেন রিঙ্কির বাবা। আগে জানতাম না। এখন জানি। ফলে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল। দুই, পশুপতিবাবু সমস্যায় পড়ে গেলেন। ওঁরা কেউ অবশ্য মন্ত্রীর কাছে গিয়ে মুখ খুলবেন না। আমি ভাল মতোই সেটা জানি। কিন্তু আমাকে ডাকলে পরিষ্কার টাকা চাওয়ার কথা মিনিস্টারকে জানিয়ে দেব। এ সব ব্যাপারে ন্যাকামির কোনও দরকার নেই।

ফের ফোন করলাম টুবলুকে। "তুই তো কামাল করে দিয়েছিস টুবলু!"

"তোমাকে বলেছিলাম না? ভাগ্যিস পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটায় স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের কথা বলা ছিল। তাই স্টোরিটা করতে পারলাম।

"পেলি কোথায় রিপোর্টের কপি?"

"জোগাড় করতে হয়েছে। তুমি বলেছিলে, খরচাপাতি করতে হলে করবে। যার কাছ থেকে রিপোর্টটা পেয়েছি, তাকে কিছু দিতে হবে। তাকে কি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব? হাজার পাঁচেক টাকা কিন্তু দিতে হবে।"

"না রে। টাকাটা আমি তোকে দেব। তুই যাকে দেওয়ার দিবি। আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখিস। আর মাস খানেকের মধ্যে তোকে এমন একটা খবর দেব, তাজ্জব হয়ে যাবি।"

"টাকাটা কোত্থেকে নেব, শুভ্রদা?"

"বাড়িতে এলে আসতে পারিস। অথবা আপিসে। না হলে বল, মনাকে আমি তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। পিসিমার হাতে দিয়ে আসবে।"

পিসিমার নাম শুনেই পিছিয়ে গেল টুবলু। "না শুভোদা, মা যেন এ সব কিছু জানতে না পারে। আচ্ছা, আমিই রাতে ফেরার

pathagar.net

সময় তোমাদের বাড়িতে নেমে পড়ব।"

বললাম, "আয় তা হলে। আর একটা কথা। তুই যে অনিল মজুমদারের খবরটা আমার কাছ থেকে পেয়েছিলি, এটা যেন কেউ না জানে।"

"তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। কালকের কাগজটা দেখো। অনিল মজুমদারকে নিয়ে আরও ইন্টারেস্টিং খবর পাবে।"

"কী খবর রে?"

"এখন বলা যাবে না। আচ্ছা ছাড়ি। আমায় এখুনি বেরোতে হবে।"

ফোনটা ছাড়ার পর মনে মনে হাসলাম। টাকাটা আর কাউকে দিতে হবে না। টুবলুর পকেটে যাবে। আমি নিশ্চিত। তা যাক, আমার কাজটা ও করে দিয়েছে। ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মনে এত আনন্দ হল, শিস দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকলাম। নেহাত মনা বাড়িতে আছে। তাই লাভলি এই মুহূর্তে বেঁচে গেল। না হলে এখনই ওকে জাপটে ধরে তুলে আনতাম।

...ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে মোবাইলটা বেজে উঠল। রিঙ্কির ফোন, "তুমি এখন কোথায়, শুভ্র?"

গলাটা শুনে লাইনটা কেটে দেব কি না ভাবলাম। আবার কোথায় আমাকে গচ্চা দিতে হবে কে জানে? শুকনো গলায় বললাম, "বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি।"

"একবার রাজভবনে আসতে পারবে?"

"রাজভবনে? কেন?"

"মিনিস্টারকাকুর বাড়িতে। বাঃ, মেনল্যান্ড চায়নায় কাল যে বললাম, তোমার সঙ্গে মিনিস্টারকাকু কথা বলতে চেয়েছে?"

হ্যাঁ, কথাটা রিঙ্কি একবার বলেছিল বটে! তবে সেটা যে আজই তা কিন্তু বলেনি। বললাম "কখন যেতে হবে?"

"এখনই। অফিস যাওয়ার পথে চলে এসো। আমি কাকুর বাড়িতে আছি। তোমার জন্য সকালবেলায় চলে এসেছি।"

pathagar.net

আমার কী সৌভাগ্য! রিঙ্কি কিছু আদায় করার বদলে আমাকে কিছু করে দিচ্ছে। বললাম "রাজভবনের কোন দিকটায় যেতে হবে বলো তো?"

"গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের উল্টো দিকের রাস্তায় ঢুকেই বাঁ দিকের গেট। দেখবে সেন্ট্রি বসে আছে। চলে এসো। তার পর তোমাকে নিয়ে একটু বেরোব। কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করার আছে।"

উফ, রিঙ্কি পারেও বটে! কাল পাল জুয়েলার্স আমাকে ঝুলিয়েছে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আরও কত জায়গায় আমাকে সমস্যায় ফেলবে কে জানে? ঠিক করে রাখলাম, মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলার পরই কাজের বাহানায় কোথাও কেটে যেতে হবে। নাহ, এ ভাবে চললে ও আমাকে একদিন ফতুর করে দেবে। রিঙ্কির চালচলন যেমন দেখছি, তাতে ওকে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারি না। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, তার কপালে প্রচুর দুঃখ আছে। ও সত্যিই এক ধরনের মানসিক রোগী। পার্ক স্ট্রিট থানার ও সি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন। আপনার বন্ধুকে ডাক্তার দেখান।

গাড়ি চালিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে ঢোকার পর ফের মোবাইলটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে গাড়িটা পার্ক করলাম। মিসেস ব্যানার্জির ফোন, "স্যার, আপনি এখন কোথায়?"

"রাস্তায়। কেন বলুন তো?"

"একটা সুখবর আছে। কাল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে একটা ফ্যাক্স মেসেজ এসেছে। ওরা আমাদের কাছ থেকে প্রচুর মেডিসিন কিনতে চায়। প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো। দিন সাতেকের মধ্যেই ওষুধ সরাসরি আমাদের জাকার্তায় পাঠাতে হবে।" মিসেস ব্যানার্জির গলায় উত্তেজনার ছাপ। "স্যার, আজ কিন্তু আমরা ছাড়ব না। আপনাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে।"

pathagar.net

খবরটা শুনেই প্রচণ্ড আনন্দ হল। বললাম, "কাল এই খবরটা এসেছে। আর আপনি আজ আমাকে দিচ্ছেন?"

"আসলে স্যার, ফ্যাক্সটা এল যখন, কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিলেন। আমি পড়ে দেখিনি। আজ অফিসে এসে পড়েই দেখি, দারুণ ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানালাম। অফিসে কখন আসছেন স্যার?"

"আমি এখন রাজভবনের দিকে যাচ্ছি। মিনিস্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বেলা একটা নাগাদ অফিসে পৌঁছব। সুবোধবাবুকে বলে আপনি মিষ্টি আনিয়ে রাখবেন। কেউ যেন বাদ না যায়।"

"ও কে স্যার। তাড়াতাড়ি আসুন।"

মোবাইলের সুইচ অফ করে ফের গাড়ি স্টার্ট দিলাম। দাদুর অ্যাটাচি কেসে হু-র চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমি দিল্লিতে নিয়মিত যোগাযোগ করছিলাম। দিল্লিতে ওদের একটা অফিস আছে। যারা দক্ষিণ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কাজ করে। কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম, জাকার্তায় গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা। রোজ রোজ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের মারপিট হচ্ছে। বোধহয় সেজন্য ওখানে ওষুধ দরকার। এবং খুব দ্রুত। তাই মাল সরাসরি জাকার্তায় পাঠাতে বলেছে।

একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে পারলাম না, দিল্লি আর ফরিদাবাদে এত বড় বড় ওষুধ কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও আমি কেন অর্ডারটা পেলাম? তার মানে, টেন্ডারে আমার দাম সবথেকে কম ছিল! অথচ বাজারে যে দামে আমরা যে ওষুধ বিক্রি করি, টেন্ডারে আমি ঠিক তার দু'গুণ দাম লাগিয়েছিলাম। হু-র অর্ডার পাওয়ার জন্য আমি লোক ধরার চেষ্টা করিনি। কাউকে কমিশনও দিতে হবে না। তাই ভাবতেও পারিনি, এত বড় একটা অর্ডার পাব। একটা অভিজ্ঞতা হল। বেশি লোভ না করে ঠিকঠাক টেন্ডার দিতে পারলে বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে তা হলে প্রতিযোগিতায় নামা যায়।

গাড়ি চালাতে চালাতেই ভাবতে লাগলাম, আমার ভাগ্যের চাকা তা হলে ঘুরছে! দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে একের পর এক ঝামেলা। স্যালাইন কেলেংকারি, তার পর ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর অরণিবাবুর বদলি হয়ে যাওয়া, হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর অনিলবাবুর অপমান—সব মিলিয়ে কোনও দিশা পাচ্ছিলাম না। বহুদিন পর আজ একটা সত্যিকারের ভাল খবর পেলাম। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, কাল ঊর্মিরা অফিসে ঢোকার পরই ফ্যাক্স মেসেজটা এসেছিল। তা হলে কি ঊর্মিই কপালটা খুলে দিল?

রাজভবনে পৌঁছলাম বেলা দশটা নাগাদ। পূবদিকের দোতলা বাড়িগুলোতে যে মন্ত্রীরা থাকেন, তা জানতাম না। আমাকে দেখেই রিঙ্কি দৌড়ে এসে বলল, "তোমার এত দেরি হল কেন শুভ্র? কাকু এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এসো, ভেতরে এসো। উনি খাচ্ছেন। খেতে খেতেই তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবেন।"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে টিভিতে আর খবরের কাগজে অনেকবার দেখেছি। তবে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থায় ভদ্রলোককে দেখব, আশা করিনি। এক চিলতে ডাইনিং রুম। ডাইনিং টেবল বলে কিছু নেই। মন্ত্রী মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে ভাত খাচ্ছেন। আমি হাত জোড় করতেই উনি বললেন, "বোসো বোসো। তোমার কথা মামণির মুখে রোজ শুনি। তুমিই এখন আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের মালিক?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তোমার দাদু দু'একবার আমার কাছে এসেছিলেন। তখন উনি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা ছিলেন। তোমার প্রবলেমটা কী?"

"স্যার, হেলথ সার্ভিস আমাদের কাছ থেকে কোনও মালই আজকাল কিনছে না।"

"কেন বলো তো?"

"ডিরেক্টর আমাদের পছন্দ করেন না। আমি জানি না, দাদুর

pathagar.net

সঙ্গে কী কারণে কনফ্লিক্টটা হয়েছিল। সেদিন আমি নিজে কথা বলতে গেছিলাম। উনি আমায় অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিলেন।"

"কারণটা কী?"

"স্যার বলাটা কি ঠিক হবে?"

"বলো, বলো। অত সংকোচ কোরো না। আর দু'দিন পর তুমি আমার মামণির লাইফ পার্টনার হতে যাচ্ছ। তোমার ভালমন্দ আমাকে ভাবতেই হবে। কী হয়েছিল, আমায় সব খুলে বলো?"

"স্যার, আপনার নাম করে উনি আমার কাছে সাত লাখ টাকা চাইলেন। দাদুর মুখে শুনেছি, দু'বার টাকা নিয়ে উনি নিজেই মেরে দিয়েছিলেন। আমাকেও যখন টাকার কথা বললেন, তখন দাদুর কথা মনে হয়েছিল। আমি পাঁচ লাখের বেশি দিতে রাজি হইনি। তাই উনি চটে গেলেন। শুধু তাই নয়, আমাকে ফলস্ কেস দিয়ে শো কজও করবেন বলেছিলেন।" খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যে কথাগুলো বলে গেলাম।

শুনে খাওয়া বন্ধ করলেন মিনিস্টারকাকু। তার পর বললেন, "শোনো ভাই শুভ্র আজ পরিষ্কার একটা কথা তোমাকে বলে দিই। আমাদের পার্টিটা তো অনেক বড়। তাই চালানোর জন্য অনেক টাকাপয়সার দরকার হয়। তোমরা না দিলে টাকা আমরা পাব কোথায় ভাই?" টাকাটা আমি নিজের জন্য নিই না। এই দেখছ তো, কীভাবে আমরা বামপন্থীরা থাকি।"

বললাম, "স্যার, আপনি চাইলে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু মাঝখান থেকে অন্য একজন টাকা মেরে দেবে, সেটা হতে দেওয়া যায় না।"

"অনিল মজুমদারের সম্পর্কে এ কমপ্লেনটা অনেকের মুখে শুনেছি। আমার বদনাম করে দিয়েছে। যাই হোক, ও সাসপেন্ড হয়েছে। ডাঃ সংকর্ষণ চাকলাদার বলে একজনকে আমি হেলথ সার্ভিসে আনছি। তুমি কালই রাইটার্সে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা

কোরো। আমি যা বলার বলে রাখব। কিন্তু ওই কথাটা মনে রেখো ভাই, ইলেকশনের সময় যেন হাত উল্টে দিও না।"

"না স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"তা হলে এবার এসো। মামণি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে। তোমার সঙ্গে বোধহয় যাবে কোথাও।"

বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন রিঙ্কির মিনিস্টারকাকু। এই প্রথম আমি বামপন্থী কোনও মন্ত্রীকে দিলখোলা হাসতে দেখলাম।

উনিশ

বিকেল ঠিক পাঁচটায় রাসবিহারীর মোড়ে গিয়ে দেখি, পাতাল রেলের গেটের সামনে ঊর্মি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্রিন্টেড সিল্কের শাড়ি। হালকা গোলাপি রঙের। নাহ্, মেয়েটার রং সম্পর্কে ভাল আন্দাজ আছে। রিঙ্কিকে শাড়ি পরলে মানায় না। কিন্তু ঊর্মিকে ওই অল্প দামের শাড়িতেই খুব মহার্ঘ লাগছে। বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকলাম , "এসো।"

গাড়ির ভেতরে ঢুকে ঊর্মি বলল, "আমি ভেবেছিলাম, আপনি আসবেন না।"

"তোমার মনে এ রকম ধারণা হল কেন?"

"জানি না। সৎ সাহস দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে চেতলা ব্রিজের দিকে এগোলাম। বেহালা অঞ্চলটা আমি খুব ভাল চিনি না। কিন্তু মাঝেমধ্যে ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে বেহালার উপর দিয়ে গেছি। দুর্গাপুর ব্রিজ, নিউ আলিপুর, তারাতলার মোড়, তারপর সোজা বেহালা। ওখানে যে মেন্টাল নার্সিংহোম আছে, তা কোনওদিন শুনিনি। আসার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ঊর্মিকে কথা দিয়ে ফেলেছি বলে এলাম।

pathagar.net

বেলা সাড়ে বারোটার সময় আজ অফিসে ঢুকতেই সবার মধ্যে উৎসাহের জোয়ার দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। দেড় কোটি টাকার অর্ডার পাওয়ার খবরটা রটে গেছিল। আমার কাছে প্রথম এলেন সুবোধ বাগচী। তারপর রবিনবাবু থেকে একে একে রন্টু পর্যন্ত সবাই। আমাদের চিফ কেমিস্ট অসীমবাবু তো বলেই ফেললেন, "আপনি প্রোডাকশন নিয়ে একদম ভাববেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে সব মাল আমরা রেডি করে ফেলব।"

দিল্লিতে ফোন করে হু-র মিঃ ম্যালকম রিচার্ডসের সঙ্গে কথা বললাম। উনি বললেন, সুকর্ণ ওয়াজিদ বলে ওদের একজন আমাদের এখানে আসবেন। তিনিই জাকার্তায় মাল পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন। ভদ্রলোকের জন্য গ্রান্ড হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখলাম। সুবোধবাবুকে আমি বারবার সতর্ক করে দিলাম, "কোনও ওষুধ সম্পর্কে যেন কোনও কমপ্লেন না আসে। যার ইউনিট নিয়ে কমপ্লেন আসবে, তাকে আমি পরদিনই বিদেয় করে দেব।"

গাড়ি চালাতে চালাতে অফিসের কথাই ভাবছি। ঊর্মি জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা কঠিন করে আছে। আজ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ছাড়বেই। হঠাৎই মনে হল, নার্সিংহোমে যাওয়ার কথা বলে আমি ছেলেমানুষি করেছি। শর্মিলা বা ঊর্মি—এরা কারা? কেন ঊর্মির জন্য এতটা সময় আমি নষ্ট করব? কামাখ্যাবাবু যতদিন আমাদের কোম্পানিতে ছিলেন, ততদিন বিনা পারিশ্রমিকে নিশ্চয়ই কাজ করেননি। অত মানবিকতা দেখাতে যাওয়া আমার উচিত হয়নি।

একটু চটানোর জন্যই বললাম, "ঊর্মি, তোমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই?"

"থাকলেও আপনাকে বলতে যাব কেন?"

"আমার তো মনে হয় তোমার বয়ফ্রেন্ড থাকতেই পারে না।"

"কী করে শিওর হলেন?"

"তোমার চোখমুখ দেখে। তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র রসবোধ নেই। প্রেম নেই। কিছু নেই।"

রাগে থমথম করে উঠল ঊর্মির মুখ। কোনও কথা না বলে ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, "প্রেম বলতে আপনি কী বোঝেন, আমি শর্মিলার কাছ থেকে তা শুনেছি।"

"ভুল শুনেছ। যাক গে, কাল তোমার মা বলছিলেন, তোমার নাকি বিয়ের কথাবার্তা চলছে। ভাগ্যবান লোকটা কে জানতে পারি?"

"নাম বললে চিনতে পারবেন?"

"চিনতে না পারলেও পরে তো খোঁজখবর নিতে পারব।"

"নাম ধ্রুব মল্লিক।"

নামটা শুনে বিষম খেলাম। ঊর্মি তা হলে ওই ডিবচ-টার খপ্পরে পড়েছে। পড়াই উচিত। এমন দাম্ভিক মেয়ের শেষ পর্যন্ত এই পরিণতিই হয়। বললাম, "ভদ্রলোক খুব হ্যান্ডসাম। আমেরিকায় থাকেন। বিজনেস কনসালট্যান্ট। প্রচুর রোজগার করেন। অ্যাম আই রাইট ঊর্মি?"

ঊর্মি যেন চমকে উঠল। এই প্রথম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ধ্রুব মল্লিককে চেনেন?"

"সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তোমার বয়সের সঙ্গে ম্যাচ করবে? ভদ্রলোকের বয়স কিন্তু পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।"

"হতেই পারে না। আপনি বাড়িয়ে বলছেন।"

"ধ্রুব মল্লিকের সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ?"

"এক বন্ধুর বাড়িতে। আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে ধ্রুব মল্লিকের খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

"তোমার বন্ধুটি খুব মোটা... মানে একটু ওভার ওয়েট।"

"সেটাও আপনি জানেন?"

"ওষুধের কারখানা না চালিয়ে, জ্যোতিষচর্চা করলে ভাল

করতাম কী বলো?"

"তাই তো দেখছি। কিন্তু ধ্রুব মল্লিককে আপনি চেনেন কি না, তা তো বললেন না?"

"চিনি। ভাল মতো চিনি।"

"ওর সম্পর্কে আর কী জানেন?"

"উনি একবার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই বউ টেকেনি। এখন এক পানামা সুন্দরীকে নিয়ে লিভ-টুগেদার করেন। সেই মেয়েটি কলকাতায় বেড়াতে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবার ভয়ে ধ্রুব মল্লিক তাকে আনতে পারেনি। তাই মনের দুঃখে সেই মহিলা অন্য একজনের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডসে বেড়াতে গেছেন।"

"আপনি মিথ্যে বলছেন।"

"যা জানি বলছি। এখন বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছে। ধ্রুব মল্লিকের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তোমার মা বা কাকা কথা বলেছেন?"

"না। এখনও বলেননি।"

"তা হলে বিয়ের আশা ত্যাগ করে তুমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করো।" কথাটা শুনে ঊর্মি চুপ করে রইল। নার্সিংহোমে পৌঁছনো পর্যন্ত কোনও কথা বলল না। ডায়মন্ডহারবার রোড থেকে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে একটা ছোট্ট গলি। তার ভেতরে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাইরে থেকে মনে হয় লোহার খাঁচা। মনেই হল না, এটা কোনও নার্সিংহোম।

ডোর বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে লোহার দরজা খুলে একটা অল্পবয়েসি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

ঊর্মি বলল, "নিভাদি আছেন? বলুন ঊর্মি এসেছে।"

বুঝলাম, ঊর্মি প্রায়ই এখানে আসে। কয়েক মিনিট পরেই মাঝবয়সি এক মহিলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ঊর্মিকে বললেন, "তুমি! এসো, ভেতরে এসো। অনেক দিন পরে এলে।"

"পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম দিদি। তাই আসতে পারিনি।"

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, লম্বা এক ফালি করিডোর। সেখানে বসার ব্যবস্থা। রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য। পাশেই একটা ঘর। বোধহয় সেখানে ডাক্তাররা বসেন। কেননা জুতো খুলে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ লেখা আছে। নিভা নামে মহিলাটি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। নার্সিংহোম বলতে আমি দেখেছি, উডল্যান্ডস, বেলভিউ বা ক্যালকাটা নার্সিংহোম। ঘরে ঢুকে আশাহত হলাম। খুবই মলিন অবস্থা। দেখেই বুঝলাম অপরের দয়া-দাক্ষিণ্যে নার্সিংহোমটা চলে।

"আপনারা? কার জন্য এসেছেন?" পিছন থেকে কে যেন বললেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, এক ভদ্রমহিলা। গলায় স্টেথিসকোপ। নিশ্চয়ই ডাক্তার হবেন। নমস্কার করে বললাম, "আমরা শর্মিলাকে দেখার জন্য এসেছি।"

"ওহ্ শর্মিলা দত্ত। এখন একটু ভাল আছে। আপনারা ওর কে হন?"

ঊর্মি এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি শর্মিলার বন্ধু। প্রায়ই আসি। আপনাকে তো এর আগে কখনও দেখিনি?"

"আমি পূর্ণিমা চ্যাটার্জি। সাইকিয়াট্রিস্ট। নতুন এসেছি। আপনারা কি শর্মিলাকে দেখতে চান? ও এখন পাশের ঘরে বসে টিভি দেখছে। গিয়ে দেখতে পারেন।"

পর্দা সরিয়ে ঊর্মি পাশের ঘরে ঢুকে গেল। আমি চেয়ারে বসলাম। শর্মিলাকে দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। মেয়েটাকে এতদিন পর দেখলে চিনতে পারব কি না সন্দেহ। পূর্ণিমা চ্যাটার্জি কম্পিউটার খুলে বসলেন। আমি ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলাম। আমার মুখ দেখে ভদ্রমহিলা বোধহয় কিছু আন্দাজ করেছেন। তাই হঠাৎ বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আপনার পরিচয়টা কী জানতে পারি?"

"আমি শুভ্রশঙ্খ মিত্র। ব্যবসা করি।"

"আপনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, নার্সিংহোমের এতটা খারাপ অবস্থা বোধহয় কল্পনা করেননি।"

"সত্যি বলতে কী, তাই।"

"কী করব বলুন। প্রায় তিরিশ জন পেশেন্ট। সরকার যা সাহায্য দেয় তাতে চলে না। আগে পেতাম, এখন ডোনেশন চাইলে কেউ দিতে চায় না। পেশেন্টদের আত্মীয়স্বজনরা ভর্তি করিয়েই উধাও হয়ে যান। আর এ-মুখোই হন না। আমরা তো পেশেন্টদের বের করে দিতে পারি না। ফলে কোনও রকমে চালিয়ে যাচ্ছি। নার্সিংহোমটা তুলেও দিতে পারছি না। পিকিউলিয়ার অবস্থা।"

ভদ্রমহিলা আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি ম্যাক্সি পরা মেয়েকে নিয়ে ঊর্মি ঘরে ঢুকে এল। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। শীর্ণ চেহারা। দীর্ঘকাল রোগভোগের চিহ্ন সারা মুখে। চোখে বোধহীন শূন্যতা। ঘরের কাউকে চিনল বলে মনে হল না। শুধু কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে একবার অর্থহীন হাসল। হলদে দাঁত, ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা লালা— বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

ওকে দেখিয়ে ঊর্মি আমাকে বলল, "এ শর্মিলা। আমার সেই বন্ধু।" বিশ্বাসই করতে পারলাম না, এই সেই মেয়ে, যাকে নিয়ে একদিন আমি ডায়মন্ডহারবারে স্ফূর্তি করতে গেছিলাম। মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই পারলাম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমাকে একবার দেখিয়েই ঊর্মি শর্মিলাকে নিয়ে ফের ভেতরের ঘরে চলে গেল। মাথা নিচু করে আছি দেখে পূর্ণিমা চ্যাটার্জি বললেন, "এখন তো তাও ভাল দেখলেন। শর্মিলা যখন ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, তখন দেখলে আপনাদের কষ্ট হবে।"

ঊর্মি ফের এ ঘরে ফিরে এসেছে। জ্বলন্ত চোখে আমার দিক একবার তাকিয়ে পূর্ণিমা চ্যাটার্জিকে বলল, "শর্মি কি কোনও দিনই ভাল হবে না ডক্টর?"

pathagar.net

"বলা কঠিন। এই মেয়েটার কেস হিস্ট্রি আমি ভাল করে স্টাডি করেছি। বংশগত রোগ। এদের ফ্যামিলিতে আরও দু'তিন জন মেন্টাল পেশেন্ট ছিলেন। বাবার দিক থেকে। ওকে যখন ওর মা ভর্তি করে দিয়ে যান, তখনই আমরা জানতে পারি।"

জিজ্ঞেস করলাম, " ওর মা আসেন?"

পূর্ণিমা চ্যাটার্জি বললেন, "প্রথম প্রথম আসতেন। এখন আর আসেন না। শুনেছি ভদ্রমহিলা ফের বিয়ে করে চেন্নাইয়ে চলে গেছেন।"

"ডক্টর, আপনি বলুন তো, এই মেয়েটা কি সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের জন্য মেন্টাল ব্যালান্স হারিয়েছে? এটা জানা আমার খুব দরকার।"

"মনে হয় না। তা হলে কেস হিস্ট্রিতে নিশ্চয়ই লেখা থাকত। তবে মেন্টাল ডিসঅর্ডার হওয়ার পিছনে অবশ্যই সেক্স। আসলে আমি যতটুকু জানি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি। মেয়েটার বাবা মেন্টাল পেশেন্ট হওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওর মায়ের তখন খুবই অল্প বয়স। চাকরি করতেন। তাই স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। এ দিকে, শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর একটা তাগিদ ছিল। নিত্যিনতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসতেন বাড়িতে। মেয়েটা বড় হওয়ার পর যখন বুঝতে পারল, মা ব্যভিচারিতা করছে, তখন বিদ্রোহ করল। ও জানত, ওর বাবা দিল্লিতে চাকরি করেন। মায়ের প্রতি রাগে মেয়েটাও বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে শুরু করল। একদিকে মা মেয়েটিকে বারণ করত। অন্যদিকে মেয়েও মাকে বলত, তুমি নিজেকে শোধরাও।" বললাম, "তারপর?"

"একদিন রাতে মা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সেক্সচুয়াল অ্যাক্ট করছেন, তখন মেয়েটা দেখে ফেলে। রাগের মাথায় মায়ের পুরুষ বন্ধুটিকে কাচের বোতল দিয়ে মারাত্মক আঘাত করে। পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকেই

মেয়েটার মেন্টাল ডিসঅর্ডার হয়ে যায়। এই হচ্ছে ওর কেস হিস্ট্রি।" শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শর্মিলার অসুস্থতার জন্য তা হলে আমি দায়ী নই। উফ, আজ ঊর্মির সঙ্গে এসে তা হলে ভালই করেছি। ঊর্মি নিজের কানেও সব শুনেছে। ফেরার সময় ওর দম্ভ ভেঙে দিতে হবে। পূর্ণিমা চ্যাটার্জিকে বললাম, "এই মেয়েটিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কী করতে হবে বলুন?"

"অতি যত্নে ওকে রাখতে হবে। ভাল ভাল ওষুধ খাওয়াতে হবে। সোনারপুরের ওদিকে একটা নার্সিংহোম হয়েছে। একটু অবস্থাপন্নদের জন্য। ওখানে ভর্তি করে দেখতে পারেন। মাসে তিন চার-হাজারের ধাক্কা।"

"ডাজ নট ম্যাটার। আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? আমি এই মেয়েটির দায়িত্ব নিতে চাই। আপনি এখুনি কথা বলুন।"

পূর্ণিমা চ্যাটার্জি বললেন, "ব্যবস্থা আমি করতে পারি। কিন্তু ওর মা? তাঁর অনুমতি ছাড়া তো আমি মেয়েটাকে ছাড়তে পারব না?"

"ডক্টর, আমার একটা ওষুধ কোম্পানি আছে। আপনার এখানে যত মেডিসিন লাগে আমি ডোনেশন দেব। প্লিজ, মেয়েটাকে বাঁচান।"

পূর্ণিমা চ্যাটার্জি কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ও কে. আমাদের গভর্নিং বডিতে আমরা আলোচনা করে দেখি। আপনি এক সপ্তাহ পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বাই দ্য বাই, আপনার কার্ড আছে?"

"নিশ্চয়ই।" পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলাম। তারপর উঠে বললাম, "আজ চলি তা হলে?"

"আসুন।"

বাইরে বেরিয়েই দেখি ঘন অন্ধকার। ছোট গলিতে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। হেঁটে কোনও রকমে গাড়িতে এসে উঠলাম। নার্সিংহোমের গেটের সামনে ঊর্মি কথা বলছে পূর্ণিমা

চ্যাটার্জির সঙ্গে। একটু পরে ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ও এসে গাড়িতে উঠল। ওর চোখমুখে সেই ঔদ্ধত্যটা এখন নেই। ডায়মন্ডহারবার রোডে পৌঁছে দেখি আলোয় সব ঝলমল করছে। দোকানপাট একেবারে গড়িয়াহাটের মতো। বেহালা যে এত পাল্টে গেছে আমার ধারণাই ছিল না।

ঊর্মি গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, "তোমাকে কি বাড়ি পৌঁছে দেব?"

"না, থ্যাঙ্কস।"

"একা যেতে পারবে?"

"কেন পারব না?"

"আমার সম্পর্কে ভুল ধারণাটা আজ নিশ্চয়ই ভেঙেছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ভাঙবে, তবু মচকাবে না। বললাম, "আমার মনে হয়, তোমাকেও সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। যাতে তোমরা দুই বন্ধু একই সঙ্গে থাকতে পারো।"

"প্লিজ, ঠাট্টা করবেন না। শর্মিকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, জানেন?" ঊর্মির কথার সুর হঠাৎ বদলে গেছে। "ও কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। ভগবান কেন যে ওকে এত কষ্ট দিচ্ছে..."

"টেক ইট ইজি ঊর্মি। তোমার আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, আমরা সেটাই করে এলাম। ভাল ট্রিটমেন্ট পেলে ও ভাল হয়েও যেতে পারে। কে বলতে পারে, আর ছ' মাস বাদে ও তোমার আর ধ্রুব মল্লিকের মাঝে বসে গল্প করবে না?"

"ফের ঠাট্টা করছেন?"

"এখন ঠাট্টা বলছ, নার্সিংহোমে যাওয়ার সময় তো আমার কথা বিশ্বাসই করছিলে না। তোমাকে একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি। টু ট্রিপল ফাইভ ডাবল ওয়ান সেভেন ফোর। তোমার মা বা বয়স্ক কাউকে ধ্রুব মল্লিকের বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলো। আমার কথা শুনে বিয়েটা যেন ভেঙে দিও না।"

pathagar.net

"থাক, কথা বলার কোনও দরকার নেই।"

"তা হলে চাকরি। এছাড়া তো তোমার কোনও গতি নেই। কে বিয়ে করবে তোমার মতো রসকষহীন মেয়েকে? ফার্মেসি ছাড়া যে আর কিছু জানে না।"

এই কথাটা শুনে হেসে ফেলল ঊর্মি। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। শর্মির কথা এই মুহূর্তে ও ভুলে গেছে। হাসি থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে ও বলল, "গাড়িটা একবার থামাবেন শুভ্রদা? অনেকক্ষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। দোকান থেকে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল নিয়ে নেব?"

"নার্সিংহোমে জল চাইলেই তো পারতে।"

"ফোটানো জল ছাড়া আমি খাই না। কলেজের ক্যান্টিনে জল খেয়ে একবার পেটের খুব প্রবলেম হয়েছিল। তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছি। বাইরে কোথাও তেষ্টা পেলে মিনারেল ওয়াটার কিনে খাই।"

"কে বলেছে, বোতলের জল ভাল? কাগজে পড়োনি, নামী কোম্পানির বোতলেও আজকাল ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে! দাঁড়াও, তোমাকে কোক খাওয়াচ্ছি।"

"প্লিজ শুভ্রদা, কোক আমি খাই না। ফ্যাট হয়ে যাবে।"

নিউ আলিপুরের মুখে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করালাম। তারপর নিজেই নেমে গিয়ে বিসলেরির একটা বোতল কিনে ঊর্মির হাতে দিলাম। কয়েক ঢোক জল খেয়ে ও বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব শুভ্রদা? কিছু মনে করবেন না বলুন?"

"না। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পারো।"

"এই যে একই সঙ্গে এত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেন, তাদের কষ্ট দিতে ভাল লাগে?"

"কে বলল, আমি প্রেম করেছি। প্রেম তো স্রেফ একজনের সঙ্গেই করা যায়। তাকে কষ্ট দেওয়া যায় না।"

"তার মানে? আপনি কারও সঙ্গে প্রেমই করেননি?"

"না, সে রকম মেয়ে আমার জীবনে এখনও আসেনি। আমাকে যে ভালবেসে বেঁধে ফেলতে পারে।"

"যাঃ আপনার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"বিশ্বাস না হলে কোরো না। আমি কিন্তু এখনও সেই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছি।"

ঊর্মির সঙ্গে এই ধরনের গল্প করতে করতেই একটা সময় রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে গেলাম। আসার সময় রাগ রাগ মুখ করে বসেছিল। ফেরার সময় বেশ হাসিখুশি। গাড়ি থেকে ও যখন নামছে, তখন বললাম, "ফের কবে দেখা হচ্ছে ঊর্মি?"

"কেন কাল? কাল আসছেন তো গৌড়ীয় মঠে। আমি কিন্তু রাগ করব যদি আপনি তাড়াতাড়ি না আসেন।"

"আসব।" বলেই গাড়ি চালিয়ে দিলাম টালিগঞ্জের দিকে। হিসাব করতে লাগলাম, তা হলে আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। ঊর্মিকে বাগে আনতে আমার আর বেশিদিন লাগবে না। মানছি, ও অন্য ধরনের মেয়ে। ও রিঙ্কি নয়, এমন কী লাভলিও। রিঙ্কি আর লাভলি— দু'জনেই নিজেদের স্বার্থে আমাকে শরীর দিচ্ছে। ঊর্মির কোনও স্বার্থ নেই। ও স্রেফ মধ্যবিত্ত মানসিকতার মেয়ে। মন না দিলে, ও কিছুতেই শরীর দেবে না। ওর সঙ্গে জোর খাটানোও যাবে না। নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, ধীরে বৎস ধীরে। ধ্রুব মল্লিকের হাত থেকে যাকে বাঁচিয়েছ, তাকে হাতের মুঠোয় আনার জন্য একদম তাড়াহুড়ো করতে যেও না।

পরক্ষণেই মনে হল, এরকম যৌনোন্মাদের মতো চিন্তা করা কি এখন আমার সাজে? কলেজ লাইফে বন্ধুদের দেখানোর জেদ ছিল। এখন তো আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার উপর অনেকগুলি পরিবার নির্ভরশীল। ঊর্মির মতো একটা ভদ্র, শিক্ষিত মেয়েকে ভোগ করার চিন্তা— এ তো এক ধরনের অসুস্থতা। না না। এসব ভাবাটাই আমার অনুচিত। হঠাৎই মনে হল, বদ চিন্তা হল জীবাণুর মতো। একটা থেকে দুটো দুটো

থেকে চারটে, চারটে থেকে চারশো, এইভাবে বাড়ে। সুস্থ শরীরটাকে একসময় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কী দরকার, ওই নোংরা জীবাণুকে আশ্রয় দিয়ে জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তোলার?

জীবনে একটা শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। কলেজ থেকে ঘাড়ধাক্কা খাওয়া। অপরাধটা করেছিলাম আমি আর জয়সওয়াল। তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ জয়সওয়াল এসে একদিন বলল, ওর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। পরের সপ্তাহেই ওকে জয়পুরে গিয়ে বাবা-মায়ের মনোনীত মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। মারোয়াড়ি ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। জয়সওয়াল বলেছিল ওর পক্ষে না বলা সম্ভব না। তার পরদিন থেকেই ও আমার মাথা খেয়ে ফেলছিল, বিয়ের আগে 'ও সবের' একটু অভিজ্ঞতা নিতে চায়।

পরদিনই ওকে নিয়ে গেছিলাম, ডায়মন্ডহারবার রোডে এক রিসর্টে। আমাদের কপাল খারাপ, সেদিনই পুলিশ রেড হয়েছিল। আমরা কোন কলেজের ছাত্র, পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে জয়সওয়াল তা বলে দিয়েছিল। আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ওর উপর। সেদিন টাকাপয়সা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু পরদিন কলেজে এসে আমাদের মধ্যে খুব মারপিট হয়েছিল। ফাদার অ্যাব্রাহাম আমাদের আলাদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানেও জয়সওয়াল রিসর্টে যাওয়ার কথা ফাদারের কাছে বলে দিয়েছিল। বলেছিল, আমি নাকি ওকে জোর করে রিসর্টে নিয়ে যাই। ওর কোনও দোষ নেই। পরে ফাদার আমার কোনও কথাই শুনলেন না। কলেজ থেকে আমাকে বের করে দিলেন।

সাধে এখনও আমি রাগ পুষে আছি? যেখানে সুযোগ পাব, শুয়োরের বাচ্চাটাকে কাঁচা খেয়ে নেব। পরক্ষণেই মনে হল, থাক। এই রাগটাও জীবাণুর মতো। শুধু ক্ষতিই করে। কী দরকার পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলার। জয়সওয়াল এখন আর

আগের মতো কলেজ ছাত্র নেই। দু'টো লালবাড়ি ওর হাতের মুঠোয়। ও কতটা শক্তিমান, তা না জেনে ওকে আঘাত করতে যাওয়া উচিত হবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম প্রায় আটটা নাগাদ। সদর দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকতেই দেখি, ড্রয়িংরুমে টুবলু জমিয়ে আড্ডা মারছে লাভলির সঙ্গে। আমাকে দেখেই বলল, "এতবার মোবাইলে ধরার চেষ্টা করলাম। কোথায় ছিলে শুভ্রদা?"

টুবলুকে দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। লাভলির কথা বাড়ি ফিরে নিশ্চয় ও পিসিমাকে বলবে। মুখ গম্ভীর করে বললাম, "একটা মিটিংয়ে আটকে গেছিলাম। তুই বোস। টাকা আমি নিয়ে আসছি।"

কুড়ি

মৌলালিতে ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে দেখি, কোণের একটা চেয়ারে মুখ শুকনো করে বসে আছেন পশুপতিবাবু। পাত্তাই দিলাম না। মাস দুয়েক আগে এই ভদ্রলোকই অনিল মজুমদারের পি এ-র ঘরে আমাকে পাত্তা দেননি। 'সাহেব আছেন নাকি' বলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। পাল্টা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমিও আজ ডিরেক্টর বিজন বসুর পি এ-কে একই কথা জিজ্ঞেস করলাম, "সাহেব আছেন নাকি?"

গত দু' মাসে রিঙ্কির বাবার কাছে আমি কম করে অন্তত পনেরো বার এসেছি। আমাকে এখন সবাই চেনেন। আশা ফার্মাসিউটিক্যালসের মালিক হিসাবেই শুধু নয়, সাহেবের হবু জামাই হিসাবে আমার অবারিত দ্বার। অরণিবাবুর আমলে আমার দাদুর কাছে যাঁরা হাত পাততেন, তাঁরাই এখন পারলে আমাকে স্যালুট মারেন। সাহেবের অনুমতির কোনও দরকার

pathagar.net

হয় না। আমি যখন ইচ্ছে তখন ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকতে পারি। যত বড় মিটিংয়েই উনি ব্যস্ত থাকুন না কেন।

আমাকে দেখে পি এ রজনীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাহেব ভেতরে আছেন। আপনি চলে যান।"

পশুপতিবাবুর দিকে এবার তাকিয়ে আমি বললাম, "আরে আপনি? আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। টাকাটা আপনারা নিয়ে গেলেন না তো?"

পশুপতিবাবু মুখ কালো করে বললেন, "কোন টাকাটা?"

"দাদুর নামে যে মেডেলটা আপনারা দিলেন, তার টাকা। কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক লিখে দেব।" বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরে বসে রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর শ্যামসুন্দর মাইতি। হাতে খোলা ফাইল। বোধহয় কোনও ব্যাপারে ওঁরা আলোচনা করছিলেন। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তখনই আমাকে দেখে বিজনবাবু বললেন, "শুভ্র, এসো এসো। তোমার প্রিয় বান্ধবীটির খবর কী?"

বললাম, "ওর সঙ্গে একটু পরেই আমার দেখা হবে ফ্লুরিজে। কিছু বলতে হবে?"

"না না। কিছু বলতে হবে না। আজ সাতসকালে সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কিনা। তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

কথাটা বলেই রিঙ্কির বাবা শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হয়ে গেলেন। আদৌ আমার সঙ্গে রিঙ্কির আজ দেখা হবে না। দেখা হোক, আমি চাইও না। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই, আমার কিছু টাকার শ্রাদ্ধ। দিন দশেক হল, আমার সঙ্গে রিঙ্কির খুব কমই দেখা হচ্ছে। ও এখন জয়দেব রায়চৌধুরীর ঘাড়ে চেপেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আমারই কারসাজি। জয়দেব সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমি রিঙ্কিকে অনেক কথা বলেছি। এমন ধারণা দিয়েছি, জয়দেব টাকার কুমির। অন্য দিকে,

জয়দেবকে বলেছি রিঙ্কি ওর প্রেমে পাগল হয়ে গেছে।

বিজনবাবুকে তো সে কথা বলা যায় না। বরাবর ভদ্রলোককে ধারণা দিয়ে যেতে হবে, রিঙ্কি ছাড়া আমার কোনও গতি নেই। আজও একটা বড় কাজ নিয়ে এসেছি। কাজটা উদ্ধার করতেই হবে। আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে জয়দেব হাস রোগের সেই ফিল্টার পেপার-এর কিছু স্যাম্পল তৈরি করে দিয়েছে। এর বিনিময়ে ওকে দশ লাখ টাকা দিতে হয়েছে। তিন সপ্তাহ ধরে জয়দেব রোজই আমার ফ্যাক্টরিতে এসে ফিল্টার পেপারের পুরো প্রোজেক্টটা করে দিয়েছে। জাপান থেকে এক মাসের মধ্যে ইকুইপমেন্ট আনিয়েছে। কোম্পানি থেকে একটা টাকাও আমি নিইনি। লয়েডস ব্যাঙ্কে দাদু যে টাকা আমার জন্য রেখে গেছিল, সেখান থেকেই আমি খরচ করেছি। দিনে পঞ্চাশ হাজার ফিল্টার পেপার তৈরি করার ক্ষমতা এখন আমার আছে। চাহিদা হলে সেটা সত্তর হাজারেও পৌঁছতে পারে।

সেই ফিল্টার পেপার ড্রাগ কন্ট্রোলে জমা দিতে এসেছি। নিয়ম হচ্ছে, এই ফিল্টার পেপার নির্দিষ্ট কিছু ডাক্তারের কাছে পাঠানো হবে। তাঁরা পরীক্ষা করে মতামত দেবেন। তার পর সেই রিপোর্ট ফিরে আসবে ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টরের কাছে। যদি কেউ বাগড়া দেন, তা হলেই হয়ে গেল। আর রিপোর্ট ভাল হলে তখন ডিরেক্টর আমার কোম্পানিকে ফিল্টার পেপার বিক্রির অনুমতি দেবেন। সাধারণত বেশ কিছুদিন লেগে যায়, এ সব বেড়াজাল ডিঙিয়ে অনুমতি পেতে। কিন্তু আমি আগেভাগেই সব ঠিক করে রেখেছি। দিন সাতেকের মধ্যেই আমার অনুমতি চাই।

চেয়ারে বসে নিজের অ্যাপ্লিকেশনটা একবার পড়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, শ্যামসুন্দরবাবু বলছেন, "স্যার, আমার মনে হয় গেরাল্ড ইন্ডিয়াকে একটা শো-কজ করা উচিত। সব থেকে ভাল হয়, লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া।"

গেরাল্ড ইন্ডিয়ার নামটা শুনেই কান খাড়া করলাম। পশুপতিবাবুর কোম্পানি। কী এমন করেছেন উনি? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু না হলে লাইসেন্স বাতিল করার কথা উঠতই না। বাইরে পশুপতিবাবু মুখ কালো করে বসে আছেন। তার মানে ওঁকে ডেকে আনা হয়েছে। ভদ্রলোক ভাল রকম ঝাড় খাবেন।

ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যা শুনলাম, তাতে বোঝা গেল শ্যামসুন্দরবাবু দিন কয়েক আগে কী একটা কাজে বর্ধমান গেছিলেন। সেখানে কাজ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ ডিস্ট্রিক্ট ড্রাগ স্টোর্সে গিয়ে খাতাপত্তর পরীক্ষা করেন। তখনই উনি আবিষ্কার করেন, গেরাল্ড ইন্ডিয়া দু'নম্বরি করেছে। ওদের মাল পাঠানোর কথা ছিল এক লাখ পিস। কিন্তু ওরা পাঠিয়েছে ষাট হাজার। খাতাপত্রে কিন্তু এক লাখের কথাই লেখা আছে। গভর্নমেন্ট দামও দিয়েছে এক লাখের।

তার মানে, বাকি চল্লিশ হাজার পিস মাল না পাঠিয়ে গেরাল্ড ঠকিয়েছে গভর্নমেন্টকে। হয়তো ড্রাগ স্টোর্সের সুপারিন্টেডেন্টকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে ওরা ম্যানেজ করেছিল। জেলায় কোথায় কখন কত ওষুধ খরচ হচ্ছে, কেউ তার কোনও হিসাব রাখে না। হঠাৎ খাতাপত্র চেক হওয়ায় ওরা ধরা পড়ে গেছে। সুপারিন্টেডেন্টকে তখনই সাসপেন্ড করে এসেছেন শ্যামসুন্দরবাবু। এবার গেরাল্ডের পালা।

রিঙ্কির বাবা বললেন, "হেলথ সার্ভিসের সংকর্ষণকে কিছু জানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ স্যার, উনিই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে আমাদের হাত থেকেও গেরাল্ড বাঁচতে পারবে না।"

pathagar.net

"কেন?"

"ভিজিট করার সময় আমি ওখানে কিছু স্পুরিয়াস মেডিসিনও পেয়েছি। একেবারে জিরো পার্সেন্ট মেডিসিন। ভাবতে পারেন। স্রেফ চকের গুঁড়ো।"

"মাই গড। কী বলছেন আপনি! পাবলিক হেলথ নিয়ে যারা

ছেলেখেলা করে, তাদের এখুনি লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া উচিত।"

"তা হলে স্যার সেই ভাবেই চিঠি দিচ্ছি। গেরাল্ডের মালিক আবার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। পরে ঝামেলা করতে পারেন।"

"করুক। আমি একবার মিনিস্টারকে জানিয়ে রাখব।"

ফাইলপত্তর গুছিয়ে শ্যামসুন্দরবাবু বেরিয়ে যেতেই রিঙ্কির বাবা বললেন, "বলো শুভ্র, তুমি কি জন্য এসেছ।"

"স্যার, একটা নতুন মেডিসিন প্রোডাকশনে নেমেছি। আপনার আশীর্বাদ চাই।"

"কী রোগের মেডিসিন?"

"হাস। হেমোলিটিক ইউরেমিক সিনড্রোম।"

"সে তো আমেরিকায় হয়। তুমি এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে কেন?"

"ওখানে এক্সপোর্ট কবর।"

"আশ্চর্য! ওখানে এই মেডিসিনের পেটেন্ট এখন কাদের হাতে?"

"একটা জাপানি কোম্পানির হাতে। শিমবুন ল্যাবরেটরিজ।"

"পাগলামি করো না শুভ্র। ওসব অনেক বড় কোম্পানি। ওদের সঙ্গে কমপিট করতে পারবে?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি হিসাব কষেই এগোচ্ছি। অনেক কম দামে এই ওষুধটা দেব। একটা ফাইল আমি বিক্রি করব দশ ডলারে। সেখানে শিমবুন-এর ওই মেডিসিনের দাম প্রায় একশো ডলার।"

"কিন্তু তোমার এই মেডিসিন যে ওখানকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাপ্রুভ করবে, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? ওখানে কিন্তু ভীষণ কড়াকড়ি।"

"জানি স্যার। আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই এফ ডি এ-র

BanglaBook.net

কাছে অ্যাপ্লাই করব। তার আগে আপনারা যদি ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেন, তা হলে আমার সুবিধা হয়।"

"কাদের সঙ্গে তোমার ডিল হল?"

"ইউ এস ডিফেন্স মিনিস্ট্রি মালটা চাইছে স্যার। প্রায় চার কোটি টাকার ডিল।"

"মাই গড। তুমি তো দেখছি খুব করিতকর্মা ছেলে শুভ্র?"

"চেষ্টা করছি। আপনারা যদি একটু তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভ করেন, তা হলে..."

"তাড়াতাড়ি বললে হয়? তুমি তো আমাদের নিয়মকানুন জানোই। ডাক্তারদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেতেই আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। ওদিকটা যদি তুমি ম্যানেজ করতে পারো, এদিকটা আমি দেখব।"

"ডাক্তারদের নিয়ে চিন্তা করবেন না স্যার। বেঙ্গল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনকে এই ক'দিন আগে আমি পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছি। হাসপাতাল করার জন্য। প্যানেলে কে কে থাকবেন, শুধু সেই নামগুলো যদি জানতে পারি, তা হলে কুইকেস্ট পসিবল টাইমে আমি রিপোর্ট আনিয়ে দেব।"

কথাগুলো শুনে রিঙ্কির বাবা হাসলেন। তার পর বললেন, "ঠিক আছে। কাগজপত্রগুলো তুমি শ্যামসুন্দরবাবুকে একবার দেখিয়ে নাও। তার পর আমি দেখছি, কী করা যায়।"

"তা হলে আমি উঠি স্যার?"

"এসো।"

ডিরেক্টরের ঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলাম। জানি, বাইরে পশুপতিবাবু বসে আছেন। তাঁকে আমার হাসিমুখটা দেখানো দরকার। একটু আগে পরিষ্কার একগাদা মিথ্যে কথা বলে এলাম। ব্যবসা করতে গেলে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলতেই হয়। আসলে আমেরিকায় এক্সপোর্ট করার কোনও কথাই নেই। কিন্তু ফিল্টার পেপার তৈরি করা আমার খুব দরকার।

pathagar.net

রিঙ্কির বাবার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটা রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে চালিয়ে দিলাম। এখুনি একবার সংকর্ষণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। হেলথ সার্ভিসের নতুন ডিরেক্টর। আজ অফিসে এসেই দিল্লি থেকে একটা খবর পেয়েছি, ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিরাট বড় একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ওরা প্রায় দশ কোটি টাকা দেবে। সেই টাকার অর্ধেক আসবে কলকাতায়। সংকর্ষণবাবুকে আগেভাগে বলে রাখলে আমরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ সাপ্লাইয়ের বরাতটা পেলেও পেতে পারি।

খবরটা আমায় দিলেন মিঃ ওয়াজিদ। ইন্দোনেশিয়ান এই ভদ্রলোকই এসেছিলেন, হু-র প্রতিনিধি হয়ে জাকার্তায় ওষুধ পাঠানোর জন্য। গ্র্যান্ড হোটেলে ওঁকে রেখে আমি খুব যত্নআত্তি করেছিলাম। দিল্লি ফিরে যাওয়ার সময় ভদ্রলোকের স্ত্রীর জন্য দামি একটা নেকলেসও পাঠাই। মিঃ ওয়াজিদ এমন খুশি, ফিরে গিয়ে সুন্দর একটা চিঠি লেখেন। ভাল একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে ভদ্রলোকের সঙ্গে।

আমার টার্গেট এখন ফাইজার কোম্পানির মতো হওয়া। একটা মাত্র ভিটামিন ট্যাবলেট ফাইজার কোম্পানির কপাল খুলে দিয়েছে। বিকোসুল। ইন্ডিয়ান ড্রাগস জার্নালে সেদিন দেখলাম, বিকোসুল ট্যাবলেট গত বছর সারা ভারতে বিক্রি হয়েছে ছত্রিশ কোটির মতো। ভাবা যায়? বিকোসুলের মতো, কোনও কোম্পানির আর কোনও ওষুধ এত বেশি সংখ্যক বিক্রি হয়নি। ট্যাবলেটটা ওভার দ্য কাউন্টার পাওয়া যায়। প্রেসক্রিপশনের দরকার হয় না।

একটা ওষুধ...এ রকম একটা ওষুধ আমার দরকার। আশা ফার্মাসিউটিক্যালসকে তা হলে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। একটা জিনিস ইদানীং লক্ষ করছি, হঠাৎই আমরা ভাল ভাল অর্ডার পাচ্ছি। এবং তা এমন জায়গা থেকে, কোনওদিন আশাই করিনি। এটা শুরু হয়েছে, উর্মি ফ্যাক্টরিতে পা দেওয়ার

pathagar.net

পর থেকে। মায়ের সঙ্গে ও যেদিন প্রথম আমাদের অফিসে এসেছিল, সেদিনই জাকার্তার অর্ডারটা আমরা পাই। যেদিন চাকরিতে যোগ দিল, সেদিন বরাত এল হেলথ সার্ভিস থেকে। অনেক দিন পর। হ্যাঁ, আমার কথা শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেনি ঊর্মি। নতুন ফিল্টার পেপার ইউনিটে ও সুপারভাইজার হিসাবে জয়েন করেছে মাস দেড়েক আগে।

ঊর্মি যে আমাদের লক্ষ্মী, অন্য কেউ এটা লক্ষ করেনি। কিন্তু আমি করেছি। সত্যিই, এক-একজন এমন থাকে, যার সংস্পর্শে এলে ভাগ্য খুলে যায়। আমার ক্ষেত্রে মনে হয়, ঊর্মি সেই মেয়ে। রিঙ্কিকে বিয়ে করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছি। তার পর থেকে ঊর্মির প্রতি টান আমার বাড়ছে। সত্যিই মেয়েটার ব্যক্তিত্ব আছে। এই ক'দিনে লক্ষ করছি, ও খুব কাজেরও মেয়ে। জয়দেবের মতো খুঁতখুঁতে লোকও আমার কাছে ওর প্রশংসা করে গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, ফিল্টার পেপার ইউনিট আমার কোম্পানিকে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে যাবে।

গাড়ি চালিয়ে ধর্মতলায় এসে হঠাৎ কী মনে হওয়ায়, রাইটার্সে একবার ফোন করলাম। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সঙ্কর্ষণবাবু এখন নাও থাকতে পারেন। আমার যাওয়াটাই তখন বেকার হয়ে যাবে। ও প্রান্তে কেউ ফোন তুলছেন না। বার তিনেক ফোন করার পরও কাউকে পেলাম না। হঠাৎ মনে হল, আজ শনিবার। এই সময়টায় রাইটার্সে কারও থাকারও কথা নয়। সংকর্ষণবাবুকে না হয় পরে বাড়িতে ধরে নেওয়া যাবে। এটা ভেবেই গাড়ি চালিয়ে দিলাম। লেক ক্লাবের দিকে।

এত বিকেলে বাড়িতে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। লাভলি থাকলে না হয় একটা কথা ছিল। মনার বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পরই লাভলি বেলঘরিয়ায় চলে গেছে। যাওয়ার আগের দিন খুবই কান্নাকাটি করেছিল আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। আমি সেদিন অনেকবার ওকে বলেছি,

"বেলঘরিয়ায় যাওয়ার তোর কোনও দরকার নেই। চাস তো, অন্য কোথাও তোকে রাখার ব্যবস্থা করছি।" লাভলি কিছুতেই রাজি হয়নি। বারবারই ও বলেছে, "অন্য কোথাও গিয়ে উঠলে আর কোনওদিন পিসির কাছে মুখ দেখাতে পারব না।" একবারও কিন্তু ও লোকনাথের কথা বলেনি। স্বামীর প্রতি ওর বিদ্বেষ দেখে সেদিন আমি অবাকই হয়ে গেছিলাম।

মনে মনে আমি কিন্তু প্রস্তুত। আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে লাভলিকে এনে রাখার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ঊর্মি চাকরিতে ঢোকার পর পরিস্থিতিটা পাল্টে গেছে। ওরা এখনও ভবানীপুরের বাড়িতেই আছে। কামাখ্যাবাবুর কাছে দাদুর যে সব দলিল আর কাগজপত্তর ছিল, সেগুলো ঘাঁটাঘাটি করে আমাদের আরও একটা বাড়ির হদিশ আমি পেয়েছি। কাশীপুরে একটা বাগানবাড়ি। ঠিক করেছি ওখানেই লাভলিকে নিয়ে গিয়ে রাখব। ওর শরীরে যে তিলে তিলে বাড়ছে, সে আমারই রক্তের ফসল। তাকে অনাদরে পৃথিবীর আলো দেখানো ঠিক হবে না। তাই ঠিকাদার লাগিয়ে কাশীপুরের বাড়িটা মেরামত করিয়েছি। এখন একটা গেস্ট হাউসের মতো মনে হচ্ছে। লালবাগের যে ছেলেটিকে মনা ধরে এনেছিল, সেই সান্টু মণ্ডলকে আমি ওই বাড়ির কেয়ারটেকার করেও রেখেছি। ও-ই লাভলির দেখাশোনা করবে।

রেড রোড দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। ও প্রান্তে ঊর্মি। বলল, "শুভ্রদা, তুমি এখন কোথায়?"

রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললাম, "বাড়ির দিকে।"

অফিসে চাকরি নেওয়ার পর থেকে ঊর্মি আমাকে আপনি আপনি করা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি সম্বোধন করতে আমিই বলে দিয়েছিলাম। ও বলল, "তুমি কী রকম মানুষ বলো তো? তোমার জন্য এখনও আমি বসে আছি।"

"ফোনটা কোত্থেকে করছ?"

"মিসেস ব্যানার্জির ঘর থেকে।"

"উনি নেই?"

"না। অনেকক্ষণ চলে গেছেন।"

"বাঁচা গেছে। এখন তা হলে মন খুলে কথা বলতে পারি।"

আমার রসিকতায় পাত্তাই দিল না ঊর্মি। গম্ভীর গলায় বলল, "আজ আমাকে নিয়ে তোমার বেহালায় যাওয়ার কথা ছিল না?"

"তাই বুঝি?" ছি ছি, একদম ভুলে গেছি।"

"মিসেস পূর্ণিমা চ্যাটার্জি কিন্তু আমাদের জন্য নার্সিং হোমে বসে আছেন। শর্মিলার সব ব্যবস্থা উনি করে ফেলেছেন। আজ আমাদের টাকা দিয়ে আসার কথা। তা হলে কাল সোনারপুরের নার্সিং হোমে শর্মিকে উনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন।"

বিকেলের দিকে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে রিঙ্কির বাবাকে পটানোয় এত ব্যস্ত ছিলাম, মনেই পড়েনি শর্মিলার কথা। ঊর্মির চটে যাওয়ার কারণ আছে। বললাম, "ঠিক আছে। আমি একাই ওখানে যাচ্ছি। তুমি চিন্তা করো না।"

"বাড়ি ফিরে তুমি কিন্তু আমাকে ফোন করে সব কথা জানাবে। না হলে জীবনেও তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না।"

ওকে রাগানোর জন্য বললাম, "আমার থেকে শর্মি তোমার কাছে বড় হল?"

"এখনও ইয়ার্কি মারছ? তোমার উপর আমার মারাত্মক রাগ হচ্ছে শুভ্রদা।"

"রাগ হওয়া ভাল। পরে সেটাই গিয়ে অনুরাগ হয়ে দাঁড়ায়।"

"বয়ে গেছে তোমার অনুরাগী হতে। এখন ফোনটা ছাড়ো। গাড়ি চালাচ্ছ। অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।"

"তোমার জন্য জান দিতেও আমি রাজি।"

"বলতে লজ্জা করছে না? কথা দিয়ে কথা রাখতে পারো না, আবার আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছ?"

"বললাম তো, বেহালায় যাচ্ছি।"

"এখনি গিয়ে ওখান থেকেই আমায় ফোন করবে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছচ্ছি। মনে থাকবে?"

"ইয়েস ম্যাডাম, মনে থাকবে।"

ও পাশ থেকে লাইনটা কেটে দিল ঊর্মি। মোবাইলের সুইচ অফ করে আমি ফের গাড়ি স্টার্ট করলাম।

...রাত প্রায় আটটার সময় বাড়িতে ফিরে দেখি, মনা বা গীতামাসি কেউ নেই। দরজা খুলে দিয়ে বাহাদুর বলল, "ছোট দাদাবাবু, আজ রাতে গীতামাসি আসতে পারবে না। আপনাকে বলে দিতে বলেছে।"

হয়তো সিনেমা-টিনেমা দেখতে গেছে। কথাটায় পাত্তা না দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। স্নান করার জন্য জামা খুলতেই ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলেই বললাম, "শুভ্র বলছি।"

ওদিকে অফিসের রন্টু সেনের গলা, "স্যার একটা দুঃসংবাদ আছে।"

"কী হয়েছে?"

"আমাদের স্যালাইন ডিপার্টমেন্টে একজন এমপ্লয়ি ছিল, লোকনাথ দাস। সে আজ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটা থাকত বেলঘরিয়ায়। এইমাত্র ওর পাড়ার লোক এসে আমায় খবর দিয়ে গেল।"

খবরটা শোনামাত্রই লাভলির মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। হ্যাঁ, ওর স্বামীর নামই তো লোকনাথ দাস। ঠিক বুঝতে পারলাম না, এটা দুঃসংবাদ কি না। ও পাশ থেকে রন্টু কী একটা প্রশ্ন করল, আমি শুনতেই পেলাম না।

একুশ

"এই শুভ্র, ভায়াগ্রা বলে ওষুধটা কোথায় পাওয়া যায় রে?"

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে স্বপ্নময় হঠাৎ প্রশ্নটা করল। বিয়ে করার পর এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছে। না জানিয়েই, সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা নাগাদ। এখন রাত প্রায় ন'টা। এখনও ওঠার নাম করছে না। গীতামাসি অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছে। আমাকে খেতে দিয়ে তার পর বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু মাল খেতে বসে স্বপ্নময় জমে গেছে। ওর মধ্যে বাড়ি ফেরার কোনও তাগিদই দেখছি না।

ওর বিয়ের এখনও দু' সপ্তাহ হয়নি। এরই মধ্যে ভায়াগ্রার দরকার হল কেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। হালকাভাবেই বললাম, "ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ভায়াগ্রা তুই কোথাও পাবি না।"

শুনে স্বপ্নময় যেন একটু হতাশ হল। তার পর বলল, "তুই জোগাড় করে দিতে পারবি না?"

"কেন? তোর দরকার?"

"মনে হচ্ছে। তোকে একটা কথা বলার ছিল ভাই। আমার না, কোনও কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে না।"

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, "কী প্রবলেম হচ্ছে, আমায় বল তো?"

"ঠিকমতো ইরেকশন হচ্ছে না। বউয়ের সঙ্গে ও সব করার সময় আমার সোনাগাছির সেই মেয়েটার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই যে রে, তোদের সঙ্গে একবার যে-মেয়েটার ঘরে গেছিলাম। ব্যস, ওর মুখটা মনে পড়ামাত্তর সব ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। কী করি, বল তো ভাই?"

কথাগুলো শুনে খুব হাসি পেয়ে গেল। শালা, ভাল ছেলে হলে যা হয়! এত মেয়ের সঙ্গে আমি সহবাস করেছি, কই কারও সঙ্গে বিছানায় শুয়ে তো কারও কথা মনে পড়ে না?

pathagar.net

বাড়ির ভয়ে মেয়েদের সঙ্গে মিশতই না স্বপ্নময়। আমাকে নানা রকম উপদেশ দিত, ও সব না করার জন্য। এখন বুঝুক, ঠিক বয়সে ঠিক জিনিসটা না করলে কী হয়! বিয়ের দিন স্বপ্নময় আমাকে গোয়াবাগানে যেতে বলেছিল। কিন্তু যেতে পারিনি। বউভাতের দিন আমি ওদের বেলগাছিয়ার বাড়িতে গেছিলাম। ওর বউকে সেদিনই প্রথম দেখি। ধ্রুব মল্লিক যতটা মোটা বলেছিল, আমার কিন্তু ততটা মনে হয়নি।

উল্টে, শ্রাবণী... মানে স্বপ্নময়ের বউকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। বেথুন কলেজে পড়া মেয়ে। বেশ চটপটে কথাবার্তায়। স্বপ্নময়ের মা আমাকে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর, শ্রাবণী আমাকে বলেছিল, "আপনার কথা অনেক শুনেছি। বন্ধুর মতো এই বেলা আপনিও বিয়েটা সেরে ফেলুন।"

ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না যে।"

"কে বলল? আমার হাতেই একজন আছে। আমার এক বন্ধু। আপনি তাকে চেনেন। বলুন, তা হলে ঘটকালি করি।"

"আগে বলো, ঘটকালির জন্য তোমাকে কী দিতে হবে?"

"কিচ্ছু না। শুধু আমার বন্ধুটাকে সুখে রাখবেন।"

"বোঝাই যাচ্ছে, তোমার বন্ধুটা এখন সুখে নেই।"

শুনে হেসে উঠেছিল শ্রাবণী। কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্বপ্নময়দের এক আত্মীয় উপহার দিতে এলেন। হাত বাড়িয়ে সেটা নেওয়ার পর শ্রাবণী বলেছিল, "এ সব ঝামেলা চুকে যাক। আমরা হনিমুন থেকে ফিরে আসি। তার পর একদিন আড্ডা মারতে আসবেন শুভ্রদা। আপনাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে। আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত লোক। বিরাট ব্যবসা চালান। তবুও রিকোয়েস্টটা করলাম। কী, বলুন, আসবেন তো?"

তখনকার মতো ঘাড় নেড়েছিলাম। কিন্তু জানতাম, স্বপ্নময়দের আড্ডায় নতুন বউয়ের যোগ দেওয়া ওর বাবা

মোটেই পছন্দ করবেন না। হয়তো তখন কিছু বলবেন না। পরে ঝাল ঝাড়বেন স্বপ্নময়ের উপর। তাই স্বপ্নময়ও চাইবে না। আমি ভেবেই রেখেছিলাম, একটা দিন ওদের দু'জনকে ডিনার খাওয়ানোর জন্য ডাকব। তাজ বা অন্য কোথাও। তখন সেখানে শ্রাবণীর সঙ্গে আড্ডা মারলে কেউ দেখতেও আসবে না। কিন্তু আজ স্বপ্নময়ের মুখে যা শুনছি, সেটা বেশ আশঙ্কার কথা। বললাম, "এখনই কিন্তু তোর ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।"

আঁতকে উঠল স্বপ্নময়, "না, না। ডাক্তারকে এসব জানানো ঠিক হবে না। ঠিক একদিন না একদিন বাবার কানে পৌঁছে যাবে।"

"তা হলে শ্বশুরের দেওয়া কালিস গাড়িটা নিয়েই তুই থাক। তোর বউ কিন্তু আর ক'দিন পর ভেগে যাবে পাড়ার কোনও ছেলের সঙ্গে।"

শুনে খুব মুষড়ে পড়ল স্বপ্নময়। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভরে দে তো। আজ খুব ইচ্ছে করছে।"

সন্ধে থেকে চার পেগ হয়ে গেছে। আর দেওয়া ঠিক হবে না। স্বপ্নময়ের কোটা আমি জানি। এর পর হুইস্কি দিলে, ও একা বাড়ি ফিরতেই পারবে না। আট পেগ পেটে দিলেও আমার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু আজ বেশ গুমোট। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘর ছেড়ে বেরোতেই ইচ্ছে করছে না। স্বপ্নময়ের গ্লাসে হাফ পেগ ঢেলে বললাম, "ন'টা বাজে। বাড়ি ফিরবি না?"

"না রে। বাড়ি ফিরতে আর ইচ্ছেই করে না। রাতে বউ এসে আমার পাশে শোবে ভাবলেই, ভয় করে। তুই ভাই যে করেই হোক, আমাকে এক ফাইল ভায়াগ্রা জোগাড় করে দে।"

বললাম, "সম্ভব না। তোর কোন ডোজ দরকার, না জেনে ওসব দেওয়া উচিত না। খুব বাজে সাইড এফেক্ট হয়। আমি ওষুধের লাইনের লোক। আমি জানি।"

pathagar.net

কথাটা শোনার পরই গুম হয়ে গেল স্বপ্নময়। তারপর হঠাৎ বলল, "এখন আমার খুব আফসোস হয়, জানিস। মনে হচ্ছে, তুই ঠিক। কনজুগাল লাইফে হ্যাপি হওয়ার জন্য আগে থেকে একটু একটু এক্সপেরিয়েন্স থাকা দরকার। শালা, এর জন্য আমার বাবাটাই দায়ী, বুঝলি। ওই লোকটা এত কনজারভেটিভ যে, আমার জীবনটাই শেষ করে দিল।"

"আমার একটা পরামর্শ নিবি?"

"বল।"

"আগে ভেবে দ্যাখ তো, সোনাগাছির মেয়েটার কথা কেন তোর মনে পড়ছে? শ্রাবণী আর ওই মেয়েটার মধ্যে কি কোনও সিমিলারিটি আছে?"

"হ্যাঁ। ওই মেয়েটার গজদাঁত ছিল। শ্রাবণীরও আছে।"

"তা হলে একটা কাজ কর। ওই মেয়েটার ঘরে তুই ফের একবার যা। গিয়ে দ্যাখ তো, ইরেকশন হয় কি না?"

"কী বলছিস তুই?"

"ঠিকই বলছি। কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে তিনিও তোকে এই পরামর্শটা দেবেন। আমার কী মনে হয় জানিস, বহুদিন ধরে তোর মনে একটা পাপ বা অপরাধ বোধ, যা-ই বলিস না কেন, জমা হয়ে রয়েছে। সেটা দূর করার জন্য তোর আর একবার পাপ করা দরকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আর কী। আমার সাজেশনটা নিয়ে দ্যাখ, দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"কিন্তু সোনাগাছি তো বিরাট বড় জায়গা। মেয়েদের গিজগিজে ভিড়। তার মধ্যে এত দিন পর সেই মেয়েটাকে কোথায় খুঁজে পাব?"

"কেন পাবি না? বলে দিচ্ছি। এখনও আমার মনে আছে। নন্দরানির ফ্ল্যাট। তিনতলায়। মেয়েটার নাম ছিল সন্ধ্যা।"

"মাই গড, এখনও তোর মনে আছে?"

"আমি সেদিন যে মেয়েটাকে নিয়েছিলাম, তার নাম ছিল

শ্যামলী। সেটাও ভুলিনি। আমি কোনও কিছু ভুলি না।"

"ওখানে যেতে বলছিস বটে, কিন্তু পরে যদি কোনও রোগটোগ হয়ে যায়?"

"দুর, কিচ্ছু হবে না। কনট্রাসেপটিভ নিয়ে যাবি। মাস্ট।"

"তুই ঠিক বলছিস, আজই শালা যাব। যা হয় হবে।" এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে স্বপ্নময় উঠে দাঁড়াল। "আমার মোটা বউটাকে দেখিয়ে দেব, আমি পারি।" এক পা এগিয়ে স্বপ্নময় একটু টলে গেল। ফের সোফায় বসে পড়ে বলল, "এই শুভ্র, তোকে না একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার বউয়ের এক বন্ধু তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে রে। তাকে তুই চিনিস?"

"তোর বউয়ের বন্ধু, কে?"

"ঊর্মি। ঊর্মি মুখার্জি। দু'একবার আমাদের বাড়িতেও এসেছে। তোর গল্প আমার কাছে করছিল! বোঝ, মায়ের কাছেমাসির গল্প। তোর প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ। একদিন বলে কি না, পুরুষ মানুষ বলতে যা বোঝায়, শুভ্র মিত্র হচ্ছে তাই।"

শুনে মজা লাগল। ঊর্মি যে শ্রাবণীর বন্ধু, সেটা বেহালার নার্সিং হোমে যাওয়ার দিনই ওর মুখ থেকে জানতে পেরেছিলাম। ও আমার নামে আর কী বলেছে, তা জানার জন্য বললাম, "তাই নাকি? মেয়েটা আমায় চিনল কী করে রে?"

"ওর বাবা নাকি তোদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন। তোর প্রশংসা শুনে শালা আমি যেই বলেছি, শুভ্র তো এক নম্বরের উওম্যানাইজার—তখন আমার বউ দপ করে জ্বলে উঠল। কী বলল জানিস? শুভ্রদার ক্ষমতা আছে। তাই উওম্যানাইজিং করে। তোমার তো সে ক্ষমতাও নেই। কী ইনসাল্ট বল তো। নাহ্, আমি শালা আজ সোনাগাছি যাবই। সেই সন্ধ্যা মেয়েটাকেও তুলে বাড়ি নিয়ে যাব।"

বলতে বলতে স্বপ্নময় উঠে দাঁড়াল। তার পর টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওর হাঁটা দেখে আমার প্রচণ্ড হাসি পেয়ে

গেল। আমি জানি, বাইরে বেরিয়েই ও একটা ট্যাক্সি ধরবে। তার পর সোজা গিয়ে নামবে বেলগাছিয়ায়। নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের আমি চিনি। মুখেই যত বারফাট্টাই। বেচারা স্বপ্নময়! আজ ও ওর বাবাকে দোষী করল। একবার নয়, দু'বার।

শ্বশুরের দেওয়া কালিস গাড়িটা কোথায়, জানতে চেয়েছিলাম। তখন ও বলেছিল, "আমার বাবাটা কী লোক জানিস? আজ আমার গাড়ি নিয়ে বরাহনগরে গেছে। পিসিদের দেখাতে। ছেলে শ্বশুরবাড়ি থেকে পেয়েছে। নিজে গাড়ি নিয়ে গিয়ে সব আত্মীয়দের দেখাচ্ছে। আর আমাকে তোদের বাড়ি আসতে হল পাতাল রেলে। কী বাবা, ভাবতে পারিস? খুব বেঁচে গেছিস শুভ্র। তোর বাবা নেই।" এই কথাগুলো যখন স্বপ্নময় বলছিল, তখন মাত্র দুপেগ হুইস্কি ওর পেটে।

স্বপ্নময় চলে যাওয়ার পর সোফায় বসে একা একাই ড্রিঙ্ক করতে লাগলাম। লাভলির বর লোকনাথ সুইসাইড করার পর থেকে আমি নিজেও এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছি। অফিসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি রাত আটটা, সাড়ে আটটা পর্যন্ত। কোনও ক্লাবেও আজকাল যাই না। সোজা বাড়ি ফিরে আসি। একা ড্রিঙ্ক করতে করতে বিজনেস পেপার বা মেডিকেল জার্নাল উল্টেপাল্টে দেখি। অফিস থেকে ফেরার সময় বি টি রোডে পৌঁছে অনেকদিনই ভেবেছি উল্টো দিকে যাই। একবার বেলঘরিয়ায় গিয়ে দেখে আসি লাভলি কেমন আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ সংবরণ করি। কেননা মনা আজকাল প্রায়ই ওর বাড়িতে গিয়ে থাকে।

কেন লোকনাথ সুইসাইড করল, গীতামাসিরা সে সম্পর্কে কিছু জানে না। বেলঘরিয়ায় উল্টো কথা রটেছে। বরানগরে দু'পার্টির মারামারির মাঝে পড়ে গিয়ে লোকনাথ মার্ডার হয়েছে। তার পর ওর লাশ নাকি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাটা যে-ই রটাক, সে আমার অসীম উপকার করেছে। আমি নিজে তো জানি, কেন লোকনাথ ছেলেটা

সুইসাইড করল? মাঝে মাঝে চিন্তা করলে পরিষ্কার ছবিটা যেন দেখতে পাই। লাভলি প্রেগন্যান্ট, জানতে পারার পরদিনই লোকনাথ গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়।

ওর বডি পাওয়া গেছিল বাবুঘাটে। খুব বিচ্ছিরি অবস্থায়। মাছ ঠুকরে ঠুকরে ওর চোখমুখ বিকৃত করে দিয়েছিল। ওর ডেডবডি দেখে এসে পরদিন অফিসে গল্প করেছিল সবার কাছে রণ্টু। লোকনাথ ছেলেটাকে নিজের চোখে কোনওদিন দেখিনি। তাই ওর মৃতদেহ দেখতে কেমন লাগছিল, তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। গীতামাসি পরে এসে আমার কাছে গল্প করেছিল, বেচারি লোকনাথ নাকি জানতেও পারেনি বাচ্চার বাবা হতে যাচ্ছে। লাভলি নাকি বলার সুযোগই পায়নি।

গীতামাসি কথায় কথায় আজকাল প্রায়ই আমার কাছে লাভলির প্রসঙ্গ তোলে। কালই রাতে খাওয়ার সময় হঠাৎ বলল, "মেয়েটাকে নিয়ে কী করি বল তো শুভ্র?"

তখন অফিসের কথা ভাবছিলাম। কথাটা না-বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "কার কথা বলছ?"

"লাভলি। লাভলির কথা। বেলঘরিয়ায় একা ওকে রাখা ঠিক হচ্ছে না। একে কাঁচা বয়স, তার উপর প্রেগনেন্ট। জায়গাটা তো ভাল নয়।"

"তোমার কাছে এনে রাখছ না কেন?"

"আসতে চাইছে না। মাথায় কী ঢুকেছে কে জানে? কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে, বাচ্চাটা পেটে না এলেই ভাল হত।"

pathagar.net

কথাটা শুনে সাবধান হয়ে গেলাম। কিছু না বলে চুপচাপ খেতে লাগলাম। কে জানত, লোকনাথ সুইসাইড করবে? লাভলিও নিশ্চয় ভাবেনি। ভেবেছিল, লোকনাথ চুপচাপ সব মেনে নেবে। আমাদের এখানে থাকার সময় আমি বেশ কয়েকবারই লাভলির কাছে এই প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। ও প্রশ্নটা

উড়িয়ে দিয়ে বলত, "লোকনাথের কথা ছাড়ো। আমি তো তোমাকে প্রথম দিনই বলে দিয়েছি, আমি কার বাচ্চার মা হব, এটা আমার প্রিরোগেটিভ।"

আমি কোনও কথা বলছি না দেখে গীতামাসি বলল, "ওর পেটে যদি বাচ্চাটা না আসত, ফের তা হলে ওর বিয়ে দিতে পারতাম। দেখতে শুনতে তো খারাপ না। শিক্ষিত মেয়ে। বয়সটাও বেশি না। ওকে বললাম, অ্যাবরশন করে নে। শোনার পর কী বলল, জানো শুভ্র? কথাটা আর কোনওদিন মুখেই আনবে না। এখন একটা বাচ্চাসহ কে ওকে বিয়ে করবে বলো তো?"

বললাম, "চান্স কম।"

লাভলির প্রসঙ্গ ওখানেই থেমে গেছিল। গীতামাসি অবশ্য জানে না, লাভলির ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। জীবনটা একা একা ওকে কাটাতে হবে না। আমি ঠিক করেই রেখেছি, খুব শিগগিরই ওকে নিয়ে আসব আমাদের কাশীপুরের বাড়িতে। ওর সব দায়িত্ব এখন আমার। লোকনাথ নেই। লাভলির ব্যাপারে আইনগত কোনও ঝামেলাও হবে না। সান্টু ওর মাকে লালবাগ থেকে কাশীপুরে নিয়ে এসেছে। খুব বিশ্বস্ত ছেলে। কোনও দিনই কারও কাছে ও মুখ খুলবে না। ও-বাড়িতে এখন শুধু একটা ফোন লাগিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। আমি জানি, কাশীপুরে থাকার কথা বললে লাভলি প্রথম প্রথম আপত্তি করবে। কিন্তু কী করলে ও রাজি হবে, তা আমি জানি।

চুমুক দিয়ে হুইস্কির গ্লাসটা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আধ ঘন্টা আগে গীতামাসি একবার আমাকে তাগাদা দিয়েছিল, ডিনার করার জন্য। তার পর থেকে আর পাত্তাই নেই। গেল কোথায়? কিচেনে গিয়ে দেখলাম, গীতামাসি নেই। এক এক দিন আমার দেরি হলে গেস্ট রুমের ডিভানে গিয়ে শুয়ে থাকে। গেস্ট রুমে ঢুকে দেখি, গীতামাসি সেখানেও নেই। আমাকে না বলে বাড়ি চলে যাওয়ার লোক তো গীতামাসি নয়? কী মনে

হওয়ায় বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

তখনই চোখে পড়ল উল্টো দিকে রাধা মেডিকেল স্টোর্স থেকে গীতামাসি বেরিয়ে আসছে। হয়তো মনার বাবার জন্য কোনও ওষুধ কিনতে গেছিল। কথাটা ভেবে হেঁটে এসে ডাইনিং টেবিলে বসলাম। মনার বাবা অবশ্য এখন ভাল আছে। মাঝে একদিন এ বাড়িতে এসে কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে গেছে। খুব ভাল লেগেছিল সেদিন যখন বলল, "তুমি হেল্প না করলে আমি হয়তো হাসপাতাল থেকেই ফিরতেই পারতাম না শুভ্র। আমার আর গীতার জীবন তো শেষ হয়ে এল, তোমার কাছে এখন আমার একটাই রিকোয়েস্ট, আমার ছেলেটাকে কিন্তু তুমি দেখো।"

ঘরে ঢুকেই গীতামাসি বলল, "ইস, তুমি বসে আছ? এ দিকে আমি ওষুধ কিনতে গেছিলাম। আজ সকাল থেকে দীপার খুব জ্বর। আমার সময়টা যে কী যাচ্ছে, ঈশ্বরই জানেন।"

গীতামাসির বাড়ির ভাড়াটের মেয়ে দীপা। নিজের মেয়ে নেই বলে গীতামাসি খুব ভালবাসে দীপাকে। এগারো-বারো বছর বয়স। আগে লাভলি আমাদের বাড়িতে যেমন ছুটিছাটার দিনে আসত, এখন দীপাও তেমন গীতামাসির সঙ্গে আসে। ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ে। মেয়েটা অসুস্থ হয়েছে শুনে হালকাভাবেই বললাম, "কী ওষুধ কিনলে দেখি?"

গীতামাসি একটা প্রেসক্রিপশন এগিয়ে দিল, "নৃপেন ডাক্তার এই ওষুধটা লিখে দিলেন— নিমিকা। কাল গিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছেন।"

নিমিকা-র নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। এই দু'দিন আগেই ইন্ডিয়ান ড্রাগস ম্যাগাজিনটাতে পড়েছি, ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার অশ্বিনীকুমার নিমেসুলাইড গ্রুপের সব ওষুধ ব্যান করে দিয়েছেন। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, কোনও ডাক্তার যেন এই গ্রুপের ওষুধ লিখে না দেন। তা সত্ত্বেও, পাড়ার ডাক্তার নিমিকা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন? আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে গীতামাসিকে বললাম, "খবরদার তুমি এই ওষুধ দীপাকে

pathagar.net

খাওয়াবে না। তা হলে কিন্তু ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।"

"কী বলছ তুমি শুভ্র?"

"ঠিকই বলছি। তুমি যদি এই ওষুধটা খাওয়াও, কাল থেকে দীপার জ্বর হয়তো ছেড়ে যাবে। কিন্তু শুরু হবে বমি আর পায়খানা। আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে। নিয়ে যাও। দেখবে, কাল ঠিক হয়ে যাবে।"

"এই ওষুধটা খারাপ, তা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু দিলেন কেন?"

"জানে না। এরা এত ব্যস্ত, লেটেস্ট মেডিকেল জার্নাল পড়ার সময়ই পায় না। নিমিকা খাওয়ালে দীপার লিভারের বারোটা বেজে যাবে। ছি, ছি এই সব ডাক্তারদের গুলি করে মারা উচিত।"

শুনে গীতামাসি প্রচণ্ড রেগে গেল। তার পর বলল, "দাঁড়াও, কালই মনার বন্ধুদের আমি নৃপেন ডাক্তারের চেম্বারে পাঠাব। বাচ্চাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এ কী কথা! ভাগ্যিস, তুমি ওষুধটা দেখতে চাইলে? না হলে তো এখনই গিয়ে খাওয়াতাম। ওর বাবা-মায়ের কাছে কী জবাবদিহি করতাম সারা জীবন বলো তো?"

"দীপার কপাল ভাল। যাক গে, এখন খেতে দাও। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

গজগজ করতে করতে গীতামাসি কিচেনের দিকে চলে গেল।

...অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে একটা আমেরিকান মেডিকেল জার্নাল পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লাভলি। এত রাতে ও কোত্থেকে এল? অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, "লাভলি তুই?"

pathagar.net

আমার বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসার ফাঁকে হঠাৎই লাভলির মুখটা বদলে গেল। এ কী? চমকে উঠলাম! এ তো সেই শর্মিলা! কয়েকদিন আগে যাঁকে সোনারপুর নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে এলাম! পরনে ময়লা চিটচিটে একটা ম্যাক্সি। মাথার চুলে জট। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে আসছে।

শর্মিলা সোজা বিছানায় উঠে এসে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে এসে, জড়ানো গলায় বলল, "শুভ্রদা, আমায় আদর করবে না? সেই সেদিনকার মতো?"

ওর মুখে পচা পাঁকের দুর্গন্ধ। আমার গা গুলিয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু শর্মিলার ওই রুগণ শরীরে অসম্ভব শক্তি। এক ইঞ্চিও ওকে নড়াতে পারলাম না। আমাকে চুমু দেওয়ার জন্য শর্মিলা মুখটা আরও নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে না পেলে আমি সুস্থ হব না শুভ্রদা।"

বিছানায় বসে দু হাত দিয়ে ম্যাক্সিটা খুলে ফেলল শর্মিলা। এখন ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

ম্যাক্সিটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে ও আমার আরও কাছে সরে এল। বুকে শুকনো আমসত্ত্বের মতো দুটো স্তন। আমার চোখের সামনে ঝুলছে। হলদে দাঁত বের করেও হাসছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সত্যিই ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "ঊর্মি, আমায় বাঁচাও।"

...ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। লাইট জ্বালিয়ে দেখি, না কেউ নেই! তা হলে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? উফ, কী বীভৎস স্বপ্ন! সারা রাত্তির আর ঘুমোতেই পারলাম না। চোখ বুজলেই শর্মিলার শুকনো দু'টো স্তন আমার সামনে ঝুলতে লাগল।

pathagar.net

বাইশ

সকালবেলায় কঙ্কণার ফোন, "শুভ্রদা, আপনি কি কলকাতায় ছিলেন না? গত পরশু থেকে আপনাকে ফোন করে যাচ্ছি। পাচ্ছিই না।"

বললাম, "না গো। ছিলাম না। সাত দিন পর কাল রাতেই ফিরলাম।" সত্যিই ব্যবসার কাজে ভুবনেশ্বর আর গুয়াহাটি

গিয়েছিলাম। বেশ ভাল অর্ডার পেয়েছি। মনটা তাই খুব খুশি।

"খবরটা শুনেছেন?"

"কী খবর?"

"রিঙ্কি তো ফের বাড়ি থেকে উধাও। কোথায় গেছে, আপনি কিছু জানেন?"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ্যাঁ জানি। কয়েকদিন আগে ও আমার কাছে এসেছিল। তখন বলেছিল জাপানে যাবে। মনে হয়, সেখানেই গেছে।"

"জা-পা-ন গে-ছে?" কথাটা যেন বিশ্বাসই করল না কঙ্কণা, "আর এ দিকে তো ওর বাড়িতে হুলুস্থুলু লেগে গেছে।"

"কেন বলো তো? বাড়িতে কিছু জানে না?"

"বিন্দুমাত্র না। বাবার সঙ্গে ফের কি কারণে ঝামেলা হয়েছিল। পরদিন স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর বাবা রোজ রোজ আমাকে ফোন করছেন। আপনাকেও ফোন করেছিলেন। বোধহয় পাননি।"

কিন্তু আমি তো জানি, বাড়ির সবার মত আছে। এক বছরের কি একটা স্কলারশিপ। তার পরই ফিরে আসবে। সেদিন জিজ্ঞেস করল, আমার কোনও আপত্তি আছে কি না? আমি বললাম, আপত্তির কী আছে? ব্যস, এটুকুই জানি।"

"কী আশ্চর্য বলুন তো। ওর বাবা-মা মারাত্মক অ্যাংজাইটির মধ্যে আছেন। প্লিজ, আপনি একবার ফোন করে কথা বলুন।"

"এখনই বলছি।"

"রিঙ্কিকে আপনি যেতে দিলেন কেন শুভ্রদা?"

"কী করব বলো। যেতে না-দিলে তো সারা জীবন আমাকে কথা শুনতে হত। মেয়েদের তো জানি। হয়তো বলত, জাপানে গেলে জীবনে অনেক কিছু করতে পারতাম। এই তোমার জন্যই সম্ভব হল না।"

"মাঝে মাঝে রিঙ্কিকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ও যে কী চায়, ও নিজেও জানে না। একদিন আমাকে কী বলল,

জানেন?"

"কী গো?"

"শুভ্র ছেলেটা ভাল। কিন্তু ওকে বিয়ে করাটা ঠিক হবে কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না। বিয়ে হয়ে গেলেই দেখবি, আমায় আর সময় দেবে না।"

"শুনে তুমি কী বললে?"

"বললাম, তা হতেই পারে না। একটা ছেলের কাছ থেকে আমরা মেয়েরা যা চাই, শুভ্রদার মধ্যে তার সব কিছুই আছে। তুই কিন্তু মত বদলাস না। কিন্তু আমার কথা ও গ্রাহ্য করল কি না, কে জানে?"

শুনে আমার মারাত্মক হাসি পেল। রিঙ্কির মাথায় তা হলে সামান্য হলেও ঘিলু আছে। এটাই এতদিন টের পাইনি। কঙ্কণার সামনে তো সেটা প্রকাশ করা যায় না। তাই বললাম "কী জানি, আমার কপালে কী আছে? যাক গে, রিঙ্কিকে নিয়ে তুমি আর চিন্তা কোরো না। ওখানে সেটল করেই ও আমাকে ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেস পাঠাবে বলেছে। ওর বাবাকে সব আমি বলে দিচ্ছি।"

"বাঁচালেন। দু'টো রাত আমার ঘুম হয়নি, জানেন?"

"আজ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও। ছাড়ি তা হলে?"

"ঠিক আছে।"

ফোনটা ছেড়ে চুপ করে বসে রইলাম। কঙ্কণাকে একগাদা মিথ্যে কথা বললাম। আসলে রিঙ্কি আমাকে কিছুই বলে যায়নি। কিন্তু আমি জানি, ও জয়দেবের সঙ্গে গেছে। মাঝে একদিন ওদের দু'জনকে শ্রীরাম আর্কেডে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। বোধহয় রিঙ্কির কোনও আবদার মেটাতে জয়দেব ওখানে গেছিল। কত খসেছে ওর জানি না। শ্রীরাম আর্কেডে সেদিন আমি গেছিলাম ঊর্মির জন্য ভাল একটা কসমেটিক্স বক্স কিনতে। ওর জন্মদিনে দেওয়ার জন্য। না-বলে রিঙ্কির বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার খবর শুনে আমি

একটুও অবাক হইনি। এটা একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব।

রিঙ্কির কী হল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। জয়দেবের এখানকার বাড়িতে ফোন করলেই জেনে যাব, জয়দেবও হোক্কাইডোতে গেছে কি না। প্রায় পাঁচ মাস এখানে রয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মায়ের অসুখের জন্য। আমার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল, প্রায় মাস খানেক আগে। বরানগরের ফ্যাক্টরিতে হঠাৎ এসে হাজির। ফিল্টার পেপার ইউনিট ঠিকঠাক চলছে কি না দেখার জন্য। দিনে পঞ্চাশ হাজার প্রোডাকশন হচ্ছে দেখে জয়দেব খুব খুশি। প্রায় বিশ লাখ ইউনিট জমা হয়ে রয়েছে ফ্যাক্টরির গোডাউনে। সুবোধবাবুরা বুঝতেই পারছেন না, কেন আমি এই প্রোডাকশন করে যাচ্ছি।

আমার মাথায় এখন র‍্যানবেক্সি। আমাদের দেশের সব থেকে বড় ওষুধ কোম্পানির একটি। যারা অ্যানথ্রাক্সের প্রতিষেধক ট্যাবলেট আবিষ্কার করে ফেলেছে। পেটেন্ট অবশ্য একটা জার্মান কোম্পানির—বেয়ারের। আর ছ'মাস সেই পেটেন্টের মেয়াদ। সে কথা মাথায় রেখেই র‍্যানবেক্সি গত পাঁচ মাস ধরে নিজেদের ট্যাবলেট বানিয়েই যাচ্ছে। দিনে দু'লাখ করে ট্যাবলেট। পেটেন্টের মেয়াদ ফুরোলেই ওরা অনেক কম দামে ওই ট্যাবলেট আমেরিকায় বিক্রি করবে। জার্নালে পড়লাম, আমেরিকার দরজা খুলে গেলে দু'হাজার চার সালে র‍্যানবেক্সি লাভ করবে প্রায় ন'শো কোটি টাকার মতো। ভাবা যায়।

সুবোধবাবুরা জানেনই না এ সব কথা। তাই ঝুঁকি নিতে ভয় পান। আমিও হিসেব করে রেখেছি, যে প্ল্যানটা আমি করেছি, সেটা যদি খেটে যায়, তা হলে আমিও হাস রোগের ফিল্টার পেপার বিক্রি করে চলতি ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে তিন কোটি টাকা লাভ করব। স্যালাইন ইউনিট করতে গিয়ে দাদু ব্যাঙ্কের থেকে যে লোন-টা নিয়েছে, তাও শোধ হয়ে যাবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভুবনেশ্বর রওনা হওয়ার আগে হাত থেকে

pathagar.net

তির ছেড়ে দিয়েছি। আজই জানতে পারব, সেই তির লক্ষ্যভেদ করেছে কি না?

"শুভ্রদা, পটাদা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকব?"

মনার গলা। কখন ড্রয়িং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পাইনি। এমনই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। মনাদের পাড়ার এই লোকটার জন্যই এতক্ষণ আমি অপেক্ষা করছিলাম। সোফায় সোজা হয়ে বসে বললাম, "ডাক।"

মনা লোকটাকে ইশারায় ডেকে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। ও জানে এই সময়টায় ওর থাকা উচিত না। আর এই কারণেই ছেলেটাকে আমি এত পছন্দ করি। একদিন কথায় কথায় মনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রঙকলে মিনারেল ওয়াটারের যে নতুন ফ্যাক্টরিটা হয়েছে, সেখানে কাজ করে এমন কাউকে তুই চিনিস? ও তখন এই পটা চক্রবর্তীর কথা বলেছিল। আগে রঙকলে যারা চাকরি করত, তাদের অনেককেই কাজে নিতে বাধ্য হয়েছে জয়সওয়াল। না নিলে কারখানার পজেশন পেত না। পটাদা এখন জয়সওয়ালের ফ্যাক্টরিতে রোজকার কর্মী। দিনে ষাট টাকা করে পায়। চাকরিটা পাকা নয় বলে অখুশি। আমি সেই সুযোগটাই নিয়েছি। দু'একদিন লোকটাকে বাজিয়ে নিয়ে খুব সাবধানে একটা কথা পেড়েছিলাম। আমার কাজ করে দিলে আশা ফার্মাসিউটিক্যালে পাকা চাকরি দেব। ফিল্টার পেপার ইউনিটের জন্য এখন আমার একজনকে দরকারও। পাকা চাকরির কথা শুনে পটা টোপটা খেয়ে যায়। কুণ্ঠার সঙ্গে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, "কাজ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ স্যার। দিন পাঁচেক আগে। আপনি যেমন বলেছিলেন।"

"করলে কীভাবে?"

"আমাদের যে ওয়াটার রিজার্ভয়ার আছে, তাতে ঢেলে দিলাম।"

"একদিনে?"

"না স্যার, আমাকে অত বোকা ভাববেন না। তিন দিন লাগল

কাজটা করতে। টিউবগুলো মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। ভাল করিনি?"

"তোমাদের ফ্যাক্টরিতে দিনে কত বোতল প্রোডাকশন হয় পটা?"

"হাজার কুড়ি হবে। জাপানি মেশিন। আরও বাড়ানো যায়। পুজোর সিজন আসছে বলে জয়সওয়াল স্যার পার ডে প্রোডাকশন পঁচিশ হাজার করতে বলেছে।"

"পাঁচ দিনে তা হলে মিনিমাম এক লাখ বোতল বেরিয়ে গেছে। তাই না?"

"তার থেকেও বেশি হবে স্যার। মাল এখন গোডাউনে পড়ে থাকে না। আমাদের মিনারেল ওয়াটারের খুব ডিম্যান্ড। বিসলেরির থেকেও আজকাল বেশি বিক্রি হয়। আপনি যা করতে বলেছিলেন, করে দিয়েছি। পরে পুলিশের ঝামেলায় পড়ব না তো স্যার?"

"কেউ টের পাবে না। একটা বোতল তোমাকে আনতে বলেছিলাম। এনেছ?"

"হ্যাঁ স্যার। এই নিন। তিনদিন আগেকার। আমি সরিয়ে রেখেছিলাম।"

বোতলটা হাতে নিয়ে একবার ভাল করে দেখলাম। প্লাস্টিকের। মাঝে নীল অয়েল পেপারে কায়দা করে বড় বড় করে লেখা 'দুর্গা'। এই নামটাই জয়সওয়ালের সর্বনাশ করে দেবে। বোতলটা সেন্টার টেবলে রেখে পকেট থেকে শ'পাঁচেক টাকা বের করে লোকটাকে দিয়ে বললাম, "নাও রাখো। আগে দেখি, ফল হয় কি না। তার পর তোমায় আমি ডেকে নেব।"

টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পটাদা বলল, "তা হলে কবে খোঁজ নেব স্যার?"

"কাল রাতের দিকে একবার এসো। একটা কথা, এ ব্যাপারটা আর কেউ জানে?"

"না স্যার। একাই করেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

পটা চক্রবর্তী কারও সঙ্গে বেইমানি করে না।"

"ঠিক আছে। যাও তা হলে।"

পটাদা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি হিসেব করতে বসলাম। মিনারেল ওয়াটারের এক লাখ বোতল বাজারে বেরিয়ে গেছে। এর মধ্যেই তা হলে সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আইডিয়াটা আমাকে অজান্তেই দিয়ে ফেলেছিল পুজো কমিটির সাগ্নিক। যেদিন ও বলেছিল, "ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় আমরা প্রচুর ধরনের ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া হ্যান্ডল করি। ধরুন, টিউবে করে কোনও এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া লুকিয়ে আমি বের করে আনলাম। তার পর সেটা তুলে দিলাম আপনার হাতে। ব্যস, আপনি তখন যা ইচ্ছে করতে পারেন। ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে দিলেন। লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন হু হু করে আপনার ওষুধ বিক্রি হবে। মাল্টিন্যাশনাল অনেক কোম্পানি তো থার্ড ওয়ার্ল্ডে এই কাণ্ডটাই করে।"

পাগলামিটা তখনই আমার মাথায় ঢুকেছিল। লাভলি যেদিন আমাদের বাড়ি থেকে বেলঘরিয়া চলে গেছিল, সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই সাগ্নিককে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। জানতাম, ওর টাকার দরকার। আমেরিকায় যাওয়ার জন্য। দাদুর ব্রিফকেসে লাখ টাকা এতদিন আলমারিতে পড়েই ছিল। সেই ব্রিফকেস ওর সামনে খুলে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম, "আমার ইকোলাই ব্যাক্টেরিয়া চাই। একটা দু'টো নয়। অন্তত একশোটা টিউব। দিতে পারলে ব্রিফকেস নিয়ে যাও। আর না দিতে পারলে জীবনে কখনও মুখ দেখিও না।"

অবাক হয়ে সাগ্নিক সেদিন একটা কথা বলেছিল, "শুভ্রদা, আপনি এত রুথলেস হতে পারেন, আমি কোনওদিন ভাবতেও পারিনি। আপনি যা করতে যাচ্ছেন, জানেন তাতে কত লোক হাস রোগে মারা যাবে?"

"যাক, তাতে তোমার কী? তুমি তো তখন আমেরিকায়?"

সেদিন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়নি। কয়েকটা দিন ভাবার সময়

চেয়েছিল সাগ্নিক। তারপর একদিন অনেক রাতে এসে হাজির। ওর হাতে একটা কালো রঙের ব্যাগ। সেটা খুব সাবধানে টেবলের উপর রেখে আমায় বলেছিল, "চাকরিটা আজই ছেড়ে দিলাম শুভ্রদা। এই নিন, আপনার জিনিস। মোট একশো দশটা টিউব আছে। আমাদের ল্যাবরেটরিতে যা স্টক ছিল, সব গুছিয়ে এনেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা টিউব বের করে এনেছিলাম। ইঞ্চি চারেক লম্বা, চওড়ায় আধ ইঞ্চি। মুখ কর্কের ছিপি দিয়ে আঁটা। টিউবের তলার দিকটায় ঘন তরল পদার্থ। আমি বায়োটেকনোলজির ছাত্র। জানি, টিউবের তলার দিকে কী আছে। ব্যাক্টেরিয়ার খাবার—ডিটকো। এক-একটা টিউবে দশ মিলিয়ন করে ইকোলাই ব্যাক্টেরিয়া আছে। মানে, এক কোটির মতো। একশো দশটা টিউব মানে একশো দশ কোটি ব্যাক্টেরিয়া। এই ছোট্ট একটা ব্যাগ মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে, আমি জানি। টিউবটা ব্যাগের ভেতরে রেখে সাগ্নিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার আমেরিকা যাওয়ার কী হল?"

"ডাঃ পালচৌধুরী সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ভিসা পেয়ে যাব। বছর দশেক আর লেক গার্ডেন্স মাড়াচ্ছি না শুভ্রদা।"

সাগ্নিক রওনা হয়েছে কি না, এখনও জানি না। ও যত তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়ে ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি জানি, কলতাকায় হাস রোগ ছড়িয়ে পড়ার পরেই ট্রপিকালে ভাইরোলজিস্টদের টনক নড়ে যাবে। তখনই খোঁজ পড়বে, ইকোলাইয়ের স্টক কোথায় গেল? সুতো ধরে খোঁজ করতে করতে পুলিশ এসে হাজিরও হতে পারে আমার কাছে। কলকাতার পুলিশকে অত বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই।

সোফায় বসে সাগ্নিকের কথা মনে হতেই মোবাইলে ফোন করে ওকে ধরলাম, "কী ব্যাপার, এখনও তুমি যাওনি?"

"আজ বিকেলেই রওনা হচ্ছি।"

"এদিককার খবর কী?"

"ভাল। খোঁজ নিয়েছি। শ'তিনেক লোক হাসপাতালে। এর মধ্যে পি জি-তেই ভর্তি হয়েছে শ'খানেক। দু'একদিনের মধ্যেই রোগটা আরও ছড়িয়ে পড়বে। এখনও অবশ্য ডিটেক্টেড হয়নি। অলরেডি একুশ জন মারা গেছে। তার মধ্যে বাচ্চা উনিশটা।"

"গুড।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব শুভ্রদা? বাকি কাজটা আপনি কি করে করলেন?"

"সেটা না হয় গোপন থাক।"

"ও কে, তা হলে আর জানতে চাইব না। ছাড়ছি শুভ্রদা।"

মোবাইলের সুইচটা অফ করে আমি নিশ্চিন্তে স্নান করতে ঢুকলাম। গীতামাসি বাথটব ভর্তি করেই কিচেনে ঢুকেছে। ভাল করে জানে, স্নান না করে আমি লাঞ্চ করব না। জল দেখেই মনটা হালকা হয়ে গেল। পোশাক খুলে বাথটাবে ঢুকে পা-টা টানটান করে দিলাম। জলে মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ। সারা শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আজকাল বাথটবে আধশোয়া হয়ে কোম্পানির ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে কেমন যেন বিশ্বাস বাসা বেঁধে গেছে, ঊর্মি যতদিন আমার কোম্পানিতে থাকবে, ততদিন কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

আজকাল কোনও বড় ডিল করতে গেলে ঊর্মিকে সঙ্গে নিয়ে যাই। বাইরে কোথাও গেলে অফিস থেকে ওর মুখ দেখে বেরোই। অর্ডার আসছেও। মাঝে সুবোধবাবু একদিন বলছিলেন, গত চল্লিশ বছরে কোম্পানির ওষুধের এত চাহিদা উনি নাকি কখনও দেখেননি। ঊর্মি খুব পয়া, এই কথাটা যদি সুবোধবাবুকে বলি, হয়তো হাসবেন। আমি কিন্তু ঠিক করেই ফেলেছি, ওকে সারা জীবনের মতো বেঁধে রাখব। মনে হয়, ঊর্মিও আপত্তি করবে না।

একটা ব্যাপার ঊর্মি তো নয়ই, এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না।

pathagar.net

হাস রোগের যে ফিল্টার পেপার আমি বাজারে আনছি, তার নাম দিয়েছি ইমরু। ইংরাজি হরফে ঊর্মির ঠিক উল্টো। ইউ আর এম আই-এর উল্টো আই এম আর ইউ। আমি আরও ঠিক করে রেখেছি, যেদিন ওকে বিয়ে করে নিয়ে আসব, সেদিনই এই গোপন কথাটা ওর কাছে ফাঁস করে দেব। আর ওটাই হবে ঊর্মিকে দেওয়া আমার সেরা উপহার।

অফিস থেকে প্রায়দিনই আমরা এক সঙ্গে ফিরি। ওকে ভবানীপুরে নামিয়ে দিয়ে আমি গলফ গ্রিনে চলে আসি। কোনও কোনওদিন ওদের বাড়িতে বসে খানিকক্ষণ আড্ডাও মারি। ঊর্মির সান্নিধ্য আমার খুব ভাল লাগে। এই যেদিন ভুবনেশ্বরে গেলাম, সেদিন ও জেদ ধরেছিল আমাকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাবে। সারাটা রাস্তা ঊর্মি খুব গম্ভীর হয়ে রইল। এয়ারপোর্টে ঢোকার ঠিক আগে হঠাৎ আমায় বলল, "হোটেলে পৌঁছেই তুমি কিন্তু আমাকে একটা ফোন করবে। না করলে আমি কিন্তু খুব চিন্তায় থাকব।" ওর চোখটা তখন ছলছল করছিল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড় না করিয়ে সোজা নিয়ে গেছিলাম পার্কিং এরিয়ায়। তার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি আমার জন্য এত চিন্তায় থাকবে কেন?"

"জানি না গো, আজ সকাল থেকেই কেন বারবার আমার মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আর কোনওদিন আমার দেখা হবে না।"

কথাটা বলতে বলতেই ঝরঝর করে ও কেঁদে ফেলেছিল। জানলার কালো কাচগুলো সব তোলা। বাঁ হাত বাড়িয়ে ঊর্মিকে কাছে টেনে বলেছিলাম, "ধ্যাত্, মন থেকে ও সব দুর্ভাবনা মুছে ফ্যালো। বোকা কোথাকার।" তার পর ওর ঠোঁটে ছোট্ট একটা চুমু দিয়েছিলাম। ঊর্মি কিন্তু সেদিন বাধা দেয়নি।

হোটেলে পৌঁছেই ভুবনেশ্বর থেকে তাই ওকে ফোন

pathagar.net

করেছিলাম। ওড়িশা গভর্নমেন্টের সঙ্গে ডিল ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পর আবার ফোন করে ঊর্মিকে খবরটা দিয়েছিলাম। দু'দিন পর গুয়াহাটিতে গিয়ে রাতের দিকে একবার ওদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। রিং হয়েই গেল। অথচ কেউ ফোন তুলল না। পাঁচ দিন হয়ে গেল, ঊর্মির সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। ফিরে আসার পরই আজ আমার একটা ফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু পটা চক্রবর্তীর ব্যাপারটা নিয়ে এত টেনশনে ছিলাম, ঊর্মির কথা আর মনেই আসেনি।

লাঞ্চ করতে বসার আগে ঊর্মিকে ছাড়া, আরও দু'টো ফোন আমার করা দরকার। প্রথম ফোনটা কোনও একটা টিভি চ্যানেলে। হাস রোগের খবরটা টিভি মারফত আজ ছড়িয়ে দিতে হবে। না হলে হেলথ মিনিস্টার বা সংকর্ষণবাবুদের টনক নড়বে না। সাত তাড়াতাড়ি আমিও অর্ডার পাব না হেলথ সার্ভিস থেকে। টিভিতে খবরটা দেব কিন্তু আমার পরিচয় গোপন রেখে। দুটো তথ্য শুধু ওদের দিতে হবে।

এক, কলকাতায় নতুন রোগের... কাগজের ভাষায় কী যেন বলে... প্রাদুর্ভাব হয়েছে। দুই, সেটা ছড়িয়েছে একটা কোম্পানির মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে। অকাট্য প্রমাণ দেব। আজই পটাদার রেখে যাওয়া জয়সওয়ালের কোম্পানির বোতলটা মনার হাত দিয়ে আমি পাঠিয়ে দেব স্টেট ল্যাবরেটরিতে। ব্যাক্টেরিয়া আছে কী না তা পরীক্ষা করার জন্য। এটা যে-কেউ করাতে পারে। কাগজের লোকেরা পরে জল পরীক্ষার রিপোর্টও পেয়ে যাবে। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হবে। তার পর জয়সওয়ালের কি হাল হবে এখনই তা বুঝতে পারছি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পোশাক বদলে ফোনের সামনে বসলাম। রিসিভারটা তোলার আগেই বেজে উঠল। বোধহয় রিঙ্কির বাবা। রিসিভারটা তুলতেই ও প্রান্তে অপরিচিত গলা,

"স্যার, সান্টু বলছি। মেমসাহেব কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।"

মেমসাহেব মানে লাভলি। ভুবনেশ্বর যাওয়ার আগের দিনই ওকে কাশীপুরের বাড়িতে রেখে গেছিলাম। গত সাত দিনে ওর খোঁজ আর নেওয়া হয়নি। আজ ফোনটা ও নিজে করেনি। পাছে এ দিকে গীতামাসি তোলে। সান্টুকে তাড়াতাড়ি বললাম, "মেমসাহেব ভাল আছে রে?"

"হ্যাঁ স্যার। এই নিন।"

"তুমি কবে ফিরলে গো?" লাভলির গলাটা শুনে সারা শরীর চনমন করে উঠল।

"এই একটু আগে। তুমি কেমন আছ, আগে বলো।"

"পিসি কি এখন তোমাদের ওখানে? তা হলে বলো, ছেড়ে দিচ্ছি।"

"ছাড়ার দরকার নেই। গীতামাসি এখন কিচেনে।"

"জানো, আজ সকাল থেকে না... একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। তাই তোমাকে ফোন না করে থাকতে পারলাম না।"

"কী হয়েছে গো?"

"পেটের ভেতর দুষ্টুটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, লাথিটাথি মারছে। প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর থেকে এই প্রথম বুঝতে পারছি, পেটের ভেতর কিছু একটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।" লাভলির এখন প্রায় পাঁচ মাস। এই সময়টায় এমন হয় কি না, তা আমার জানা নেই। খবরটা শুনেই মনের ভেতরে একটা খুশির হাওয়া বয়ে গেল।

বললাম, "তাই নাকি? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।"

pathagar.net

তেইশ

টিভি-তে কাল রাত ন'টার খবরে শুনলাম, অদ্ভুত জ্বর নিয়ে কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। প্রথমে জ্বর, তার পর রক্ত-পায়খানা। তিনদিনের মধ্যেই রোগী মৃত্যুশয্যায়। রাত এগারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন চ্যানেলে খবর শুনেছি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতেই পারিনি। একটা জুয়া খেলে ফেলেছি। একটাই চিন্তা ঘুরেফিরে মনের মধ্যে আসছিল, সামলাতে পারব কি?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজগুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করেছি। প্রত্যেকটা কাগজই প্রথম পাতায় জ্বরের খবরটা ছেপেছে। লালগোলায় জ্বরে বাচ্চাদের মারা যাওয়ার খবর প্রথম দিন ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে বেরিয়েছিল। বেশ কয়েক দিন পর সেই খবরটা সামনের পাতায় আসে। আক্রান্তরা ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের। তাই খবরের কাগজ প্রথম দিকে তেমন পাত্তা দেয়নি। কিন্তু হাস রোগে আক্রান্তরা একে কলকাতার লোক, তার উপর মধ্যবিত্ত পরিবারের। সেই কারণেই হইচইটা আজ এত বেশি।

কোনও টিভি চ্যানেল বা কাগজ হদিশ দিতে পারেনি রোগটা আসলে কী? এত দ্রুত বলা অবশ্য সম্ভবও না। হাস রোগ আমাদের এখানে হয় না। ডাক্তাররা চিকিৎসা করবেন কী? কাগজে নানা ধরনের ইন্টারভিউ বেরিয়েছে। একজন ডাক্তারই দেখলাম, কাছাকাছি একটা মন্তব্য করেছেন, নতুন ধরনের কোনও ব্যাক্টেরিয়ার কাজ। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তাররা রোগীদের স্টুল আর ব্লাড নিয়ে গেছেন। পরীক্ষা করার জন্য। দু' একদিনের মধ্যেই জানা যাবে ব্যাক্টেরিয়াটা কী?

"তোমার কাছে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন। ড্রয়িংরুমে কি বসাব?"

মনটা ছিল খবরের কাগজের দিকে। তাকিয়ে দেখি

গীতামাসি। বললাম, "কারা? চেনো নাকি?"

"না, কোনওদিন দেখিনি।"

প্রায় আটটা বাজে। এত সকালে কে এল আবার? গায়ে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নীচে নেমে দেখি, ডাঃ নীহার সামন্ত আর ডাঃ মলয় সাহা। বেঙ্গল ডক্টর্স অর্গানাইজেশনের দুই কর্তা। এর আগে একটা হাসপাতাল তৈরি করার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্য এঁরা আমার কাছে এসেছিলেন। দু'জনকে দেখেই মাথায় প্ল্যানটা খেলে গেল। কায়দা করে দু'জনকেই আজ হাসরোগের কথা জানিয়ে দিতে হবে। যাতে এঁরা অর্গানাইজেশনের অন্য সব ডাক্তারকে রোগটার কথা বলে দিতে পারেন। এর থেকে ভাল সুযোগ আর আমি পাব না।

নমস্কার করতেই ডাঃ নীহার সামন্ত বললেন, "সরি, প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই চলে এলাম।"

"না, না। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি।"

"আপনি আমাদের হাসপাতালের ইমারজেন্সি ব্লকটা করে দেবেন বলেছিলেন। তারই ব্লু প্রিন্ট আজ দেখাতে এসেছি।"

ভদ্রলোক অ্যাটাচি কেস খুলে হাসপাতালের ব্লু প্রিন্টটা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে বললাম, "কত খরচ হবে?"

"সেদিন আপনাকে যা বলে গেছিলাম, তার থেকে একটু বেশিই। প্রায় সাত লাখের মতো।"

"ঠিক আছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই আপনাদের কেউ আমার অফিসে এসে চেকটা নিয়ে যাবেন। আমার ল'ইয়ার কাগজপত্র সব তৈরি করে রাখবেন। আমার মনে হয় সব কিছু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে রাখা উচিত।"

"আমাদের কোনও আপত্তি নেই।" বলেই ডাঃ সাহার দিকে ইঙ্গিত করে ডাঃ সামন্ত বললেন, "কালই আপনার কাছে ইনি যাবেন। চেকটা নিয়ে আসবেন। ভিতের কাজ শুরু হয়ে গেছে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে আপনি দেখেও আসতে পারেন।"

হেসে বললাম, "সে পরে একদিন যাওয়া যাবে। বাই দ্য বাই, আপনারা চা খাবেন, না অন্য কিছু?"

ডাঃ সামন্ত বললেন, "আজ থাক। আমাদের আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।"

"তা হয় নাকি? মিনিট কয়েক বসুন। এখুনি চা এসে যাবে। আপনাদের যখন পেলামই, তখন দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই। কাগজে যে রোগটার কথা পড়লাম, সে সম্পর্কে কি আপনাদের কোনও আইডিয়া আছে?"

ডাঃ মলয় সাহা বললেন, "আমার কাছে এ রকম কয়েকজন চাইল্ড পেশেন্ট এসেছে। কিন্তু দু'তিনদিনের বেশি তাদের হাতে রাখিনি। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। সত্যিই জ্বরটা অদ্ভুত। আজ কাগজে যা পড়লাম, তাতে ট্রপিক্যালের কাছ থেকে ফিড ব্যাক না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছি, কারও ট্রিটমেন্টই করব না।"

এই সুযোগ। বললাম, "আমেরিকায় এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা একটা ওষুধ তৈরি করছি ডাঃ সাহা। ওখানকার একটা কোম্পানি এই ওষুধটা আমাদের তৈরি করে দিতে বলেছে। যে রোগের জন্য, তার সঙ্গে এই জ্বর আর অন্য সিম্পটমের মিল আছে।

রোগটার নাম হেমোলিটিক ইউরেমিক সিনড্রোম। সংক্ষেপে হাস। ওয়াটার বোর্ন ব্যাক্টেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী।"

ডাঃ সাহা অবাক হয়ে বললেন, "ওষুধটা আপনার কাছে আছে?"

"অফ কোর্স আছে। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এক ধরনের ফিল্টার পেপার। ওরালি খাওয়াতে হয়। স্টমাকে গিয়েই ফিল্টার পুরো টক্সিনকে বাগে আনে। তার পর স্টুলের সঙ্গে বের করে দেয়।"

"আমরা তো জানতামই না।"

"ব্যবহার করে দেখতে পারেন। অন্য ডাক্তারদেরও যদি

pathagar.net

এটা কনভে করে দেন, তা হলে অনেকেই বেঁচে যাবে।"

"ওষুধটার নাম কী?"

"ইমরু।"

" মার্কেটে কি পাওয়া যাচ্ছে?"

"না, এখনও ছাড়িনি। তবে আমার ফ্যাক্টরিতে যদি কাউকে পাঠিয়ে দেন, তা হলে দিতে পারি।"

ডাঃ সামন্ত এ বার বললেন, "আমি আজই আমাদের সব মেম্বারকে ইমরু-র কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু একটা কথা, ড্রাগ কন্ট্রোলের অ্যাপ্রুভাল নিয়েছেন?"

"অফকোর্স। ওরা সব জানেন।"

"ঠিক আছে। তা হলে আমরা উঠি। ভালই হল আপনার কাছে এসে।" কথাটা বলে দুই ডাক্তার উঠে পড়লেন। ওঁদের দু'জনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্নান সেরে লাঞ্চ করতে বসার আগে অফিসে একবার ফোন করলাম। এই সময় ঊর্মিকে অফিসেই পাওয়া যেতে পারে। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "স্যার, ঊর্মি তো বেশ কয়েকদিন আসছেন না।"

"সুবোধবাবু আছেন?"

"না স্যার। ঊর্মি কাল কৃষ্ণনগর গেছেন। আপনি কি আজ অফিসে আসছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

লাঞ্চ সেরে বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়েই দেখি মারাত্মক বৃষ্টি। জুলাইয়ের মাঝামাঝি বৃষ্টি তো হবেই। প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো লেগে গেল বরানগরে পৌঁছতে। অফিসে ঢুকতেই মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "স্যার, হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর ডাঃ সঙ্কর্ষণ চাকলাদার এ নিয়ে আপনাকে বার তিনেক ফোন করলেন। বলছেন ভীষণ দরকার। অফিসে ঢুকেই যেন আপনি যোগাযোগ করেন।"

pathagar.net

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আমাকে মোবাইলেই ধরে নিলেন না কেন? তা হলে আর নর্থ ক্যালকাটায় আসতে হত না।"

"আজ আপনি বাড়িতে সেট ফেলে এসেছেন স্যার। বাড়িতেও ফোন করেছিলাম। এক ভদ্রমহিলা বললেন। লাইনটা কি রাইটার্সে দেব?"

"দিন।" বলে ঘাড় নেড়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ফোনটা আসবে আমি জানতাম। ইমরু-র কথাই সঙ্কর্ষণবাবু জানতে চাইবেন। আজই লাখ কয়েক ফাইল সরকারি ড্রাগ স্টোরে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি, আজ বিকেল থেকেই ফ্যাক্টরি গেটের সামনে এজেন্টদের লাইন পড়ে যাবে। হুহু করে খালি হয়ে যাবে গোডাউন।

এটাই তো আমি চাইছিলাম এতদিন। এই একটা ওষুধ, যা আমার ভাগ্যের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

চেয়ারে বসতে না বসতেই সংকর্ষণবাবুর ফোন, "শুভ্রবাবু, রাইটার্সে একবার আপনি আসতে পারবেন?"

"কখন?"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন। মিনিস্টার আপনার সঙ্গে পার্সোনালি কথা বলতে চান।"

"কী ব্যাপারে ডাঃ চাকলাদার? আমি তো নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।"

"আরে মশাই, নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। আপনি নাকি কী একটা রোগের কথা আজ বলেছেন ডাঃ নীহার সামন্তকে। উনি মিনিস্টারের খুব ক্লোজ। ফোন করে মিনিস্টারকে উনিই কথাটা বলেছেন। বোধহয় আপনার ওই ওষুধটা আমাদের কিনতে হবে। বাল্ক কোয়ান্টিটি। সাপ্লাই দিতে পারবেন তো?"

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। তবুও বললাম, "কিন্তুস্যার, ওই ওষুধটা তো আমি এক্সপোর্ট করার জন্য তৈরি করেছিলাম।"

"গুলি মারুন এক্সপোর্টের। আরে মশাই, এটা ইমারজেন্সি।

একটা কোটেশন-এর কাগজপত্র তৈরি করেই চলে আসুন। প্রাইস নো ফ্যাক্টর। কখন আসছেন, বলুন?"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দু'টো দশ। বললাম, "তিনটের মধ্যে।"

"ওকে, মিনিস্টারকে বলে রাখছি। আপনার জন্য ফাঁকা থাকবেন। বাট ইউ মাস্ট কাম বাই থ্রি। অ্যাসেমব্লিতে আজ অপোজিশন লিডাররা নাজেহাল করেছেন মিনিস্টারকে ওই আননোন ডিজিজ নিয়ে। মেজাজ খুব গরম।"

শুনে বললাম, "ঠিক আছে স্যার। এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।"

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোনোর মুখে ফের ফোনটা বেজে উঠল। উফ্, কে? প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে রিসিভারটা তুলেই বললাম, "কে বলছেন?"

"শুভ্র, আমি ঊর্মির মা।"

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরটা বদলে ফেলে বললাম, "কেমন আছেন?"

"ভাল নেই বাবা। ঊর্মি নার্সিং হোমে। আজ পাঁচটা দিন আমি নার্সিং হোমেই পড়ে আছি। ঊর্মিকে বোধহয় বাঁচাতে পারব না।" কান্নায় ভেঙে পড়লেন উনি।

"কী বলছেন আপনি?" ফোনেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।" কী হয়েছে ঊর্মির?"

"মারাত্মক জ্বর। ব্লাড ডিসেন্ট্রি। ডাক্তার ধরতেই পারছেন না। এই পাঁচ দিনেই মেয়েটা আমার বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি শিগগির এসো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

মাথার ভেতরটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। চোখে এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার। কী বলছেন ঊর্মির মা? নিজেকে সামলে কোনও রকমে বললাম, "কোন নার্সিং হোম থেকে বলছেন?"

"নাইটিঙ্গল। তুমি এক্ষুনি এসো বাবা। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার একটু আগে এসে বললেন, মারাত্মক

pathagar.net

রেনাল ফেলিওর। কিডনি দুটো নাকি আর কাজ করছে না...”

ঊর্মির মা আরও কী সব বলে যাচ্ছেন, কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না। আমি তো সব জানিই। হাস রোগে পরপর কী অবস্থা হয়। পাঁচটা দিন কেটে গেছে। ইকোলাই ব্যাক্টেরিয়া শেষ করে দিয়েছে ঊর্মির জীবনীশক্তি। এ আমি কী করলাম! আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎই শূন্য হয়ে গেল। শুধু বললাম, “আমি আসছি।”

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত ঊর্মি! উফ্, ভাবতেই পারছি না। কী করে সম্ভব? মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। তখনই মনে পড়ল, বেহালার নার্সিং হোম থেকে যেদিন ঊর্মি আর আমি বাড়ি ফিরছিলাম, সেদিন ও বলেছিল, বাইরে কোথাও জল তেষ্টা পেলে মিনারেল ওয়াটার কিনে খায়। আমার দুর্ভাগ্য, ও বোধহয় জয়সওয়ালের কোম্পানির বোতল কিনেছিল! একটু আগে তিন কোটি টাকা মুনাফার কথা ভেবে আমি আনন্দসাগরে ভাসছিলাম। ঊর্মির খবরটা শুনে আমার মন ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম না, আমি এখন কোথায় যাব? আগে রাইটার্স, না নাইটিঙ্গল নার্সিং হোম?

কতক্ষণ ওই ভাবে বসেছিলাম, জানি না। ঘোর কাটল মিসেস ব্যানার্জির উদ্বেগভরা গলায়, “স্যার, কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ?”

বললাম, “না। কিছু হয়নি, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলুন। আমি রাইটার্সে যাব।”

pathagar.net